কুলি

অনুবাদ

নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

র‍্যাডিক্যাল বুক ক্লাব
৬ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট কলিকাতা-৭৩

প্রথম বাংলা সংস্করণ ১৯৪৬

প্রকাশক ঃ প্রসূন বসু, ৬ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩
মুদ্রক ঃ আশিসকুমার কোঙার, শ্রীগুরু প্রিন্টার্স, ৯এ রায়বাগান স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০ ০০৬

॥ এক ॥

পার্বত্য উপত্যকায় ছোট্ট একটি গ্রাম।

সেই গ্রাম থেকে অনুমান একশো গজ দূরে, পাহাড়ের গা ঘেঁষে একটি মাটির ঘর···ঘরের ছাউনি···হুমড়ি খেয়ে যেন মাটির দিকে পড়ছে।

তার রোয়াকে দাঁড়িয়ে তারস্বরে চিৎকার ক'রে গুজরী ডেকে ওঠে:

'মুন্নু···ও মনুয়া···মুনুভু রে···'

ক্যাংড়ার নির্মেঘ আকাশে তখন মধ্যাদিনের নিষ্করুণ সূর্য বুনে চলেছে আলোর ঝালর···

সাড়া না-পেয়ে গুজরী চারদিকে চোখ ঘুরিয়ে চায়···পাহাড়ী গাঁয়ের ছোট্ট বাড়ির চৌকস ছাদের উপর দিয়ে, বুনো ঝোপের কোল ঘেঁষে, আঁকা-বাঁকা সরু পথ পেরিয়ে, তার শ্যেনদৃষ্টি চলে যায়, যেখানে দূরে কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠতে থাকে সোনালী ধুলো···

কিন্তু কোথায় মুন্নু ?

চিলের মতোন ঝাঁজালো গলায় সে আবার চিৎকার ক'রে ওঠে:

'মুন্নু, ওরে মুন্নু রে কোথায় মরতে গিয়েছিস রে ? ওরে পোড়া-কপালে হাড়-হাবাতে, চাচা যে তোর এখুনি চলে যাবে রে···শহরে যেতে হবে না না তোকে ? ওরে···'

রোয়াক থেকে একটু এগিয়ে এসে সে মুখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে চারদিকে দেখে··· আম বাগান পেরিয়ে দূরে চলে যায় তার দৃষ্টি যেখানে মধ্যাদিনের সূর্যের আলোকে রুপোলী পাতের মতো ঝিকমিক করতে থাকে বিয়াস নদ···ঘুরে বেড়ায় তার তীরে তীরে সবুজ সব বুনো ঝোপের আশেপাশে···

কিন্তু কোথায় মুন্নু ?

এবার রাগে অতিষ্ঠ হয়ে, যত উঁচু পর্দায় গলা তোলা সম্ভব, সে চিৎকার ক'রে ওঠে আকাশ-ফাটা গলায়: 'কোথায় পড়ে আছিস্, ও রে মড়া···হাড়-হাবাতে মা-বাপ-খেকো···বিদেয় হবি আয় রে···'

এবার সেই শব্দ-বাণ সারা উপত্যকায় ঝঙ্কার তুলে বিষের জ্বালায় মুন্নুর কানে গিয়ে বি'ধল।

শুনল কিন্তু সাড়া দিল না মুন্নু। যে-গাছের তলায় গা ঢাকা দিয়ে চুপটি ক'রে বসেছিল, সেখান থেকে নড়ে আর-এক জায়গায় গিয়ে বসল। গাছের ফাঁক দিয়ে একবার শুধু দেখতে পেল, গুজরীর লাল আঁচলের খানিকটা হাওয়ায় উড়ে ঘরের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

সেই সকালে সে গরুর পাল নিয়ে বেরিয়েছিল। বিয়াস নদীর ধারে গরুগুলো তখন আপন-মনে হাঁটু-জলে নেমে মনের আনন্দে জাবর কাটছিল··· সেই অবসরে সে নিজের খেলা নিয়ে সঙ্গীদের সঙ্গে মেতে ওঠে।

হঠাৎ তাকে নিস্পৃহ দেখে তার খেলার সঙ্গী জয় সিং তাকে কনুইয়ের ধাক্কায় একবার সজাগ ক'রে দিল। জয় সিং-এর পোশাক-পরিচ্ছদ থেকে সহজেই বোঝা যায় যে সে মুন্নুর খেলার সাথী হলেও, সে তার সম-শ্রেণীর নয়। গাঁয়ের তালুকদারের ছেলে সে।

মুন্নুর ব্যবহার দেখে সে বিরক্ত হয়ে উঠল ঃ 'কেমন ছেলে রে তুই ? ভারি অসভ্য তো। তোর চাচী চেঁচিয়ে গলা ফাটিয়ে ফেলল, আর তুই হতভাগা একটা সাড়াও দিচ্ছিস না ?'

জয় সিং-এর এই আক্রমণের একটা বিশেষ হেতু ছিল। গাঁয়ের তালুকদারের ছেলে সে, কিন্তু বিষাণ, বিশ্বম্ভর, গাঁয়ের সব ছেলেরাই মুন্নুকেই তাদের দলের সর্দার বলে মানে। মুন্নু থাকতে সে-সম্মান সে কিছুতেই পেতে পারে না। তাই আজ সকালে সে যখন শুনল যে মুন্নু গাঁ ছেড়ে শহরে চলে যাচ্ছে, তখন থেকে তার একমাত্র চিন্তা কতক্ষণে মুন্নু গাঁ থেকে চলে যাবে···

মুন্নুর হয়ে উত্তর দিল বিষাণ ঃ

'তুই যাসনে-মুন্নু, তোর চাচী নিশ্চয়ই তোকে কোনো কাজে পাঠাবার জন্যে ডাকছে।' তারপর জয় সিং-এর দিকে ফিরে বলে ঃ 'চাচীর ডাকে সাড়া না-দেওয়ার জন্যে তুই তো ওকে খুব নিলি একহাত! কিন্তু তোর নিজের বেলায় কি ? তোর মা যখন তোকে দুপুরের রোদে বাড়ি থেকে বেরুতে বারণ করে, তুই তো মা'র মুখের ওপর গালাগাল দিস্—তোর বাবা জলখাবারের জন্যে তোর পকেটে রোজ দু-আনা ক'রে দেন, তবুও তুই স্কুল পালিয়ে বেড়াস

…আমরা তো তবু রোজ স্কুলে যাই, ছুটির দিন গরু চরাই…আস্তামারা ছাড়া তুই করিস কি? দুটো আম চুরি করবি, সে-সাহস পর্যন্ত তোর নেই, ভাগ্যিস্ মুন্নু যোগাড় করেছে তাই—তা ও যে যোগাড় করল, ওকে দুটো খেয়ে যেতে দে…

জয় সিং গম্ভীর হয়ে বলে: 'আম খাবার দরকার হলে আমি তোদের মতো চুরি করি না, পয়সা দিয়ে কিনি! আর ওকে যে সাড়া দিতে বলেছিলাম, তা ওর জন্য নয়—ওর চাচীর যা মুখ, ও না গেলে, অযথা আমাদের গালাগাল দেবে —যেন আমরাই ওকে আটকে রেখেছি, আর, তা ছাড়া ওর চাচার সঙ্গে আজ ওকে শহরে যেতে হবে—'

বিশ্বম্ভর সে-কথায় সোজা দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করে: 'হাঁ রে মুন্নু, সত্যি তুই শহরে যাচ্ছিস?'

মুন্নু বিষন্নমুখে বলে: 'হ্যাঁ ভাই!'

'তোর তো মাত্র চোদ্দ বছর বয়েস…মাত্র ফিফ্‌থ ক্লাশে পড়ছিস, এর মধ্যে শহরে গিয়ে কি করবি?'

দীর্ঘশ্বাস ফেলে মুন্নু বলে: 'আমার চাচী চায় না যে আমি আর স্কুলে পড়ি। চাচাকে ব'লে তিনি ঠিক করেছেন যে, শহরে গিয়ে আমাকে রোজগার করতে হবে এখন থেকে। তাই শ্যামনগরে চাচা যেখানে কাজ করে সেখানে কে এক বাবু আছে—ব্যাংকে কাজ করে—তারই বাড়িতে নাকি আমার কাজ ঠিক ক'রে দেবে…'

জয় সিং বলে ওঠে: 'শহরে থাকবি…কি মজা!'

মুন্নু বোঝে জয় সিং-এর এত আনন্দ কেন। কিন্তু মুখ ফুটে কোন কথা সে বলে না। শুধু একটু হাসে। সে হাসির অর্থ, আজ যদি আমাকে না চলে যেতে হতো, তাহলে একটা ঘুষিতে তোমাকে জানিয়ে দিতাম, সর্দারী করার লোভের কি ফল!

জয় সিং-এর প্রতি তার এই আক্রোশের পেছনে, মুন্নুর মনের কোণে কেমন একটা অস্পষ্ট ধারণা ছিল যে, আজ তার এই গাঁ ছেড়ে চলে যাওয়ার মধ্যে জয় সিং-এর বাবার চক্রান্ত আছে।

সে শুনেছিল একদিন কিভাবে জয় সিং-এর বাবা তাদের সব জমি-জমা

ঋণের দায়ে দখল ক'রে নিয়েছিল—অজন্মার দিন তার বাবা এই তালুকদার-মহাজনের সুদ ঠিকমতো দিতে পারেন নি, তার ফলে তালুকদার সমস্ত জমি ডিক্রি করে দখল ক'রে নেয়। সে দেখেছিল, তারপর থেকে তার বাবা কিভাবে দিন দিন একটু একটু ক'রে শুকিয়ে মরে গিয়েছিলেন···তখন সে সবেমাত্র জন্মেছে আর তার চাচা নাবালক···বিধবা মা এক হাতে চোখের জল মুছেছেন আর একহাতে জাঁতা ঘুরিয়েছেন···সারাদিন, সারারাত···আজও যেন চোখ বুজলে সে দেখতে পায়, তার মার সেই শীর্ণ হাতে জাঁতার ডান্ডা ধরে অনবরত ঘুরিয়ে চলেছে···দেখতে পায়, যেদিন তার মা মারা গেলেন···মাটিতে শুয়ে···সে কি ভয়ঙ্কর ম্লান বিবর্ণ মুখ···তার অন্তরের অন্তরতম স্থলে, অবচেতনার গভীর গহ্বরে মা'র সেই ম্লান মুখ অসহায় বেদনার সকরুণ গ্লানিমায় চিরকালের মতো মুদ্রিত হয়ে আছে।

নিজের অন্তরকে আশ্বস্ত করবার জন্যই যেন জয় সিং আবেগভরে জিজ্ঞেস করে : 'তাহ'লে আর ফিরে আসছিস না বল ?'

মুমু দূরের দিকে চেয়ে স্থিরকণ্ঠে বলে : 'না···আর কখনও না···কখনও না—'

কিন্তু নিজের অন্তরে সে জানত, সে যা বলল, তা সম্পূর্ণ মিথ্যা। কিন্তু জয় সিং-এর কথার উত্তর দিতে গিয়ে, ইচ্ছা ক'রেই সে মিথ্যা বলল। যদিও তখন মনের আর-একদিকে তার নিদারুণ বাসনা হচ্ছিল, সত্যি কথাটা বলে জয় সিংকে ক্ষেপিয়ে তুলতে। যতই কেন তার চাচী তাকে গালাগাল দিক, যতই কেন সে দজ্জাল মাগী তাকে কাজে-অকাজে খাটিয়ে মারুক, লোকে গরু-ছাগলকে যেভাবে মারে, যতই কেন তার চাচী সেভাবে দু'বেলা তাকে করুক প্রহার···তবু তার মন কোনদিন চায় নি এ গাঁ ছেড়ে চলে যেতে···

অন্তত এখন তো চায় নি, পরে কোনোদিন চাইবে কি না কে জানে ?

শহর ঘুরে এসে গাঁয়ের লোকেরা যখন শহরের সব গল্প বলত—সেখানকার আশ্চর্য সব ব্যাপার—বড় বড় সব সাহেব, বড় বড় সব বাবু···আগাগোড়া রেশম আর পশমে মোড়া লালাদের সব অদ্ভুত অদ্ভুত কান্ড, কত তাদের আসবাব···আর কি তাদের খাওয়া-দাওয়া···অবাক হয়ে সে শুনত···মনে মনে কত না স্বপ্ন গড়ে উঠত। বিশেষ ক'রে তার মনকে দোলা দিত, শহরের সব কলকব্জা

যন্ত্রপাতির কথা···তার বিজ্ঞান-প্রাইমারে কিছু কিছু সে-সব যন্ত্রের কথা সে পড়েছে। তাই সে মনে মনে ঠিক ক'রে রেখেছিল, এখানকার স্কুলের সব পড়া শেষ ক'রে, একদিন সে শহরে যাবে, নিজের হাতে শিখবে কি ক'রে সেসব যন্ত্র চালানো যায়, কি ক'রেই বা সেসব যন্ত্র তৈরি করা যায়।

ইতিমধ্যে, এই গাঁয়ের আদুল বাতাসে, তার কলাবাগানের ছায়ায় ছায়ায়, মেঠো ফুলের গন্ধে-ভরা খোলা মাঠে, সমবয়সীদের সঙ্গে একজোটে গরু চরানোর অবকাশে যদি এ-বাগান সে-বাগান থেকে ফল জুটিয়ে জড় ক'রে, সকলে মিলে একসঙ্গে হই-হই ক'রে খেয়ে-দেয়ে, গাছে গাছে লুকোচুরি খেলে দিন কাটিয়ে দেওয়া যায়, মন্দ কি! সারাদিনের খাটুনির পর সন্ধ্যা এসে যখন অঙ্গ দেয় জুড়িয়ে···শাল-সেগুন-দেওদারের অঙ্গে জাগিয়ে শিহরণ যখন আসে দূর পাহাড়ের চূড়া থেকে বরফ-ছোঁয়া বাউরী বাতাস···এই মুহূর্তে এখনও যা নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে সে করছে অনুভব···বুনো ঝোপ থেকে ওঠে বুনো ফুলের ঝাপশা গন্ধ ···কাছে-ভিতে কোথা থেকে ডেকে ওঠে ব্যাঙের দল···পাখীরা উড়ে যায় মাথার ওপর দিয়ে গান গেয়ে···প্রজাপতি ঘুরে মরে বন্দি হয়ে রুপোলী রোদে···ভ্রমর আসে গুনগুনিয়ে সর্ব-অঙ্গে মেখে ফুলের পরাগ···তখন কেমন ক'রে সে ভাবতে পারে, এ-সব ছেড়ে চিরকালের মতো চলে যেতে হবে তাকে!

তার নিজের অজ্ঞাতে, তার রক্তের সঙ্গে মিশে গিয়েছে ক্যাংড়ার সেই বুনো রূপ···জগতের সব বিচিত্র যন্ত্র যদি এখানে এসে তার সামনে দিয়ে সারবেঁধে একে একে চলে যায় তবে তাকে ডেকে, তবুও সে পারবে না, এই শান্ত-স্রোত বিয়াস নদের বালুচর থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে সরিয়ে নিতে। কিন্তু—

'মুন্নু রে···ও রে মুন্নু···ও কালামুখো···'

চিলের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে জেগে ওঠে আবার তার চাচীর সুমধুর আহ্বান।

এবার সে উঠে দাঁড়াল। সঙ্গে সঙ্গে তার সঙ্গীরাও সব উঠে দাঁড়াল। এমন কি জয় সিংও···

মুন্নু গরুগুলোকে হাঁক দিল···সঙ্গীরাও যে-যার গরু মোষ ডাকতে শুরু করল।

দেখতে দেখতে সেই আহ্বানে বিয়াসের বিশ্রাম-সলিল থেকে দলে দলে কর্দমাক্ত শৃঙ্গীর দল বিরাট সব দেহ মন্দগতিতে আন্দোলিত ক'রে উঠতে

লাগল। পথের দু'ধারে কাদাজলের ছিটে ছড়াতে ছড়াতে, প্রহার এবং গালাগাল দুই-ই সমান উপেক্ষা ক'রে অভ্যাস-নির্দিষ্ট পথে নতমস্তকে তারা অগ্রসর হয়ে চলল…

॥ দুই ॥

'আরে পা চালিয়ে চল…শুয়োরের বাচ্ছা—' পেছন ফিরে মুন্নুর দিকে চেয়ে গর্জন ক'রে ওঠে তার চাচা দয়ারাম।

দয়ারামের অঙ্গে ঝলমল করছে লাল কোর্তার ওপর ঝকমকে সোনালী তকমা। মাথায় অতি সযত্নে বাঁধা সাদা কাপড়ের পাগড়ী। মিলিটারী কায়দায় কদম ফেলে সে চলেছে,—আংরেজ সরকারের তৈরি পাহাড়ী সড়ক দিয়ে, খোদ ইমপীরিয়াল ব্যাঙ্কের চাপরাশী সে, দেখলে মনে হয়, আংরেজ সরকারের বিরাট দায়িত্বের বোঝা যেন তারই মাথায়…

মুন্নু পথের ধারে বসে পড়েছিল। দশ মাইল একাদিক্রমে হেঁটে আসার ফলে তার খালি পা কেটে গিয়ে রক্ত পড়ছিল, সে আর চলতে পারছিল না। তার চাচার পরিত্যক্ত একটা ছেঁড়া গরম-কোর্তা তার গায়ে কোনরকমে জড়ানো ছিল—যেন একটা বস্তা।

মাথার ওপর নির্মেঘ আকাশে খর সূর্য, গায়ে সেই গরম বস্তা…ঘামে, গরমে সর্ব অঙ্গ তার অবশ হয়ে আসছিল…মনে হচ্ছিল যেন গায়ের সব রক্ত ঘেমে জল হয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে।

ভ্রাতুষ্পুত্রের সেই শোচনীয় অবস্থার দিকে ভ্রূক্ষেপ না ক'রেই দয়ারাম আবার চেঁচিয়ে বলে উঠল: 'আরে আপিসের যে দেরি হয়ে যাবে…কি সর্বনাশ…'

আপিসের দেরি হবার বা আগে যাবার কোন প্রশ্নই ওঠে না, কারণ, দয়ারাম জানত, সেদিন ছুটি, আপিস বন্ধ। তবুও সে বার বার তারস্বরে সে-কথা মুন্নুকে জানাতে হচ্ছিল, মুন্নুকে তাগাদা দেবার জন্যে নয়, তার আসল উদ্দেশ্য ছিল, পথচারী অন্য পথিকদের এবং তার গেঁয়ো ভাইপোটির কাছে জাহির করা, সে যে-সে লোক নয়…খোদ আংরেজ সরকারের তকমাধারী চাপরাশী!

পথের ধারে বসে মুন্নু তখন অসহায়ভাবে নিজের আহত পায়ের দিকে চেয়েছিল। তার দু'চোখ ভরে এসেছে জল।

চাচার কথার উত্তরে রুদ্ধ-কণ্ঠে সে জানায়ঃ 'পায়ে লাগছে বড়!'

দয়ারাম বোঝে, কড়া হলে চলবে না এখন। যথাসম্ভব নিজেকে নরম ক'রে নিয়ে বলেঃ 'চলে আয়, চলে আয়···তোর পায়ের একটা জুতোর ব্যবস্থা আমি ক'রে দেবো'খন, তোর সামনের মাসের মাইনে থেকে···'

এমন সময় একটা গরুর গাড়ি পেছন থেকে এসে তাদের সামনে ক্যাচ ক'রে দাঁড়িয়ে পড়ল। হতাশভাবে সেই দিকে চেয়ে মুন্নু বলেঃ 'হাঁটতে আর পারছি না চাচা, তুমি বরঞ্চ গাড়োয়ানকে বল না একবার আমাকে যদি তুলে নেয়···'

গাড়োয়ান যাতে শুনতে পায় এমন গলায় দয়ারাম বলে ওঠেঃ 'গাড়িতে তোকে নিতে হলে গাড়োয়ানটা এখুনি পয়সা চেয়ে বসবে—বুঝলি?' ভাবটা গাড়োয়ান যদি যেচে তাকে ডেকে নেয়, তাতে তার আপত্তি নেই। নতুবা সে দয়ারাম···খোদ আংরেজ সরকারের চাপরাশী, নিজে ছোট হয়ে একজন গাড়োয়ানের কাছে তার ভাইপোর জন্যে স্থান-ভিক্ষে করতে পারবে না।

দয়ারামের ভাবভঙ্গী দেখে গাড়োয়ানের সে-কথা বুঝতে একটুও দেরী হলো না। নিতান্ত সোজাভাবে সে বলে উঠলঃ 'বলি ও কত্তা, কাজ করো তো চাপরাশীর—অত দেমাক কেন? ছোঁড়াটাকে পেছনে চড়িয়ে দাও। আর সেই সঙ্গে নিজেও উঠে পড়ো। এই ভরদুপুরে গায়ে ঐ সব চড়িয়ে তোমারও যে খুব সুখ হচ্ছে, তাতো মনে হয় না···'

দয়ারাম,, ইম্পীরিয়াল ব্যাঙ্কের তক্মাধারী চাপরাশী দয়ারাম! সামান্য সেই ছোটলোক গাড়োয়ানের মুরুব্বীয়ানায় জ্বলে উঠল।

'চিল্লাও মত্···আমি তোর সঙ্গে কথা বলছি যে তুই আমার কথার জবাব দিচ্ছিস্? আস্পর্ধা! সিধে যেখানে যাচ্ছিস যা, নইলে এখুনি ধরে জেলে পুরে দেবো···জানিস, আমি সরকারী লোক!'

আর কথা না বাড়িয়ে গাড়োয়ান গরু দুটোর লেজ মোচড় দিয়ে গাড়ি চালিয়ে দিল। যাবার সময় শুধু বলে গেলঃ 'আচ্ছা বাবা, আনন্দ কর! আরে ছোঃ—ঐ কচি বাচ্চাটাকে এমন কষ্ট দেয়! মানুষ, না কি?'

দয়ারামের সমস্ত রাগটা গিয়ে পড়ল মুন্নুর ওপর। তার হাত ধরে হ্যাঁচকা দিয়ে গর্জে উঠল: 'ওঠ, বেটা বেল্লম্মা—ব্যাটার জন্যে আমার কি না কথা শুনতে হলো একটা গাড়োয়ানের? ওঠ্, নইলে মেরে গুঁড়িয়ে ফেলব!'

দাঁতন-করা সাদা দাঁত কটা সব বেরিয়ে পড়ল।

মুন্নু উঠে দাঁড়াল। পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে সে বেশ ভালো রকমই জানত যে তার চাচা শুধু অকারণ ভয় দেখায় না…সেখানে তার কাজ আর কথা এক। হাতের উলটো দিক্ দিয়ে চোখের জল মুছে মনে মনে গালাগাল দিতে দিতে সে সেই দ্বিপ্রহরের রোদে অনুসরণ ক'রে চলল তার অভিভাবককে।

খানিকটা ভয়ে, খানিকটা রাগে, চলতে চলতে পথের কথা, পায়ের ব্যথা সে ভুলে গেল। মন তখন তার ভরপুর, ঐ সামনের লোকটার ওপর বিদ্বেষে…

হঠাৎ খাদ থেকে নেমে পথের বাঁকে তার চোখের সামনে জেগে উঠল, অপরাহ্ণের রক্তিম আলোকচ্ছটায় সুস্পষ্ট সুন্দর, প্রান্তরমেখলা নগরী…মন থেকে যেন তার মুছে গেল উঁচু-নিচু সেই পাহাড়ে-দেশের স্মৃতি। অদেখা সেই সমতলভূমি…বিচিত্র অভিনব তার পরিবেশ…এক অনাস্বাদিত মধুর অভিজ্ঞতার সম্ভাবনায় তার মনকে নিমেষে ক'রে তুলল উদ্বেল।

যতই সে এগিয়ে চলে, ততই বিস্ময়ে তার চোখ বড় হয়ে উঠতে থাকে… আপনা থেকে দুটো ঠোঁট ফাঁক হয়ে যায়। এত রকমের গাড়ি যে আছে, তা তার সুদূর কল্পনাতেও ছিল না: কোনোটার দুটো চাকা, কোনোটার চারটে চাকা, কোনোটার আবার কাঠের চাকার বদলে রবারের চাকা…ফিটন…ল্যাণ্ডো ফটফটি…টাঙ্গা…

অবাক হয়ে সে তাকিয়ে থাকে।

এমন সময় হঠাৎ বিপুল বিস্ময়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। কিছু দূরে সে দেখল একটা কালো বিচিত্র-গড়ন জিনিস…পিঠের দিকে উটের কুঁজের মতো দুটো কালো কালো কি উঁচু হয়ে আছে…আর একটা লম্বা চোঙার ভেতর থেকে হুহু ক'রে কালো, মিস কালো ধোঁয়ার কুণ্ডলী বেরুচ্ছে…কি জোরে ছুটে চলেছে…আর তার সঙ্গে কাঁচের জানালা-বসানো মেটে রঙের সব ছোট ছোট বাড়ি…তারাও ছুটে চলেছে…আর কি জোরে বাঁশীর মতো শব্দ ক'রে চলেছে…সে শব্দে তার মনে হলো তার বুকের ধুকপুকুনি যেন গলার কাছে এসে আটকে পড়েছে।

বুকের সেই অসহ্য ধুকপুকুনি আর সহ্য করতে না পেরে সে ছুটে গিয়ে তার চাচাকে জড়িয়ে ধরে জিজ্ঞেস করে : 'চাচা, ওটা কি জানোয়ার ?'

দয়ারাম এবার শান্তকণ্ঠে উত্তর দেয় : 'আরে বোকা, জানোয়ার কেন ? রেলগাড়ির এন্‌জিন্‌ ।'

হঠাৎ দয়ারামের এই কণ্ঠস্বরের পরিবর্তনের একটা কারণ ছিল। দয়ারাম এখন শহরে ঢুকতে চলেছে। পাড়াগাঁয়ের পথে যে-দাপট দেখানো সম্ভব, এখানে তা সম্ভব নয়। তাই ক্রমশ তার চেহারা এবং কণ্ঠস্বরের মধ্যে ইমপীরিয়াল ব্যাংকের সামান্য একজন চাকরের আসল রূপ ফুটে উঠেছিল।

মুন্নুর নজর অবশ্য সেদিকে ছিল না। সে দেখছিল, সেই কালো জানোয়ারটা হঠাৎ একটা বিকট শব্দ ক'রে একটা ছোট্ট বাড়ির সামনে থেমে গেল আর সেই সঙ্গে অসংখ্য লোক সেই সব কাঁচের জানালাওয়ালা ঘর থেকে নেমে পড়ছে : কত রকমের লোক···কি বিচিত্র তাদের পোশাক···এমন পোশাকের বাহার ক্যাংড়ার গ্রামে সে তো দেখেনি কখনো। আপনা থেকে সে বলে ওঠে : 'আশ্চর্য ! কি আশ্চর্য !'

দয়ারামের কাছ ঘেঁষে সে জিজ্ঞেস করে : 'আচ্ছা চাচা, এত যে লোক, এদের গরু-ছাগল চরাবার মাঠ সব কোথায় ? এদের ক্ষেতই বা কোথায় ?'

ঘাড়টা সোজা ক'রে নিয়ে দয়ারাম বলে : 'শহরের লোকের গরু-ছাগল নেই, ক্ষেত-খামারও নেই। যারা গেঁইয়া, তারাই শুধু গরু চরায় আর মাঠ চষে ।'

মুন্নু অবাক হয়ে যায় : 'তাহলে তারা খায় কি ক'রে ?'

'খায় কি ক'রে ? আরে মুখ্যু, তাদের আছে টাকা—লাখ লাখ টাকা, আমার ব্যাঙ্কে সব জমা রাখে। চাষা যে গম চষে, ওরা তাই কিনে আটা তৈরি ক'রে বেচে···তাতে মোটা লাভ করে। ওদের মধ্যে কেউ কেউ আবার আছে বাবু, তারা আপিসে কাজ করে, তাই তো টাকা কামায়। তোকে যেখানে নিয়ে যাচ্ছি, সে-ও অমনি বাবু···মস্ত বাবু—'

তাই নাকি !'

দয়ারামের পিছু পিছু সে শহরে প্রবেশ করে। পথের ধারে খাবারের দোকানে বৃহৎ কড়াতে তখন খাবারওয়ালা মেঠাই তৈরি করছে···তার তপ্ত

সুবাস মুন্নুর নাকে এসে লাগে, দেখে বিচিত্র সব মেঠাই, থাকের-পর-থাক, কিরকম কায়দায় সাজানো···পাশ দিয়ে ফেরিওয়ালা চলে যায়, হাতে তার সুতো দিয়ে বাঁধা নানান রঙীন বেলুন···রাস্তার ধারে বিচিত্র সব খেলনা···কত রঙ-চঙে সব জিনিস···ঠাণ্ডা কুলপী···মুন্নু দেখে, একটা ছোট্ট টিনের চোঙা থেকে নেড়ে বরফওয়ালা শালপাতায় বরফ ঢেলে দিচ্ছে···কাঠের চৌকিতে বসে পথিক পরিতৃপ্তভাবে জিহবা বার ক'রে আস্বাদন করছে।

মুন্নুর শুষ্ক তৃষিত জিহবা সজল হয়ে আসে···দুর্বার বাসনা হয়, ঐ অপরূপ জিনিসের স্বাদ গ্রহণ করতে, কিন্তু সাহস ক'রে বলতে পারে না চাচাকে। কিন্তু সে-কথাও বেশীক্ষণ থাকে না মনে। হঠাৎ আর-একটা অদ্ভুত জিনিস তার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। দেখে, একটা বাক্সের ওপর একটা কালো চাকা ঘুরছে। সেই কাঠের বাক্সের ভেতর থেকে কেমন মিহি গানের আওয়াজ আসছে। সাহস ক'রে সে সেই দিকে এগিয়ে যায়, কিন্তু হঠাৎ আওয়াজটা কিরকম গম্ভীর হয়ে আসে, সে ভয়ে পিছিয়ে পড়ে।

দয়ারাম পেছন ফিরে দেখে তার অনুবর্তীটি তখন বহু পিছনে পড়ে রয়েছে। হাঁক দিয়ে ওঠেঃ 'আরে পা চালিয়ে আয়···নইলে ভিড়ে কোথায় যাবি হারিয়ে।'

সে কথায় কর্ণপাত না ক'রে মুন্নু জিজ্ঞেস করেঃ 'আচ্ছা চাচা, লোকটা ঐ বাক্সর ভেতর থেকে গান গাইছে কি ক'রে?'

কথাটা পাশের দোকানদারের কানে যেতেই সে হেসে উঠল এবং মুন্নুর দিকে চেয়ে তার বুঝতে একটুও দেরি হলো না যে, ছেলেটি কোথা থেকে আমদানি হয়েছে।

দয়ারাম বিরক্ত হয়ে বলে উঠলঃ 'আরে গরু, ওটা হলো ফনোগ্রাম···মানুষ কোথায়? মেশিন কথা বলছে।'

কথাটা মুন্নুর কাছে সমানই দুর্বোধ্য লাগল। মেশিন আবার মানুষের মতো কথা বলে কি ক'রে? কিন্তু আর বেশী প্রশ্ন করা নিরাপদ হবে না মনে ক'রে সে পা চালিয়ে দিল। কিন্তু সেই অদ্ভুত যন্ত্রটি যেন পেছন দিক থেকে তাকে অকর্ষণ করতে লাগল।

ক্রমশ শহরের ভেতর তারা এসে পড়ে। পাশ দিয়ে চলে যায় বিচিত্র সব

পোশাকে নর-নারীর দল···মেয়েদের এমন চলন-চালন এত পোশাকের বাহার সে কল্পনা করতে পারে নি। যতই সে এগিয়ে চলে, ততই তার মনে হয়, সে যেন স্বপ্নে এগিয়ে চলেছে···তার আশেপাশে যে-সব বিচিত্র জিনিস সে দেখছে, যে-সব সুন্দর-বেশ নর-নারী আসছে যাচ্ছে, তারা যেন সব স্বপ্নলোকের বাসিন্দা··· তাদের সেই পাহাড়ের ছোট্ট জগতের সঙ্গে তাদের যেন কোন সম্পর্ক নেই।

কিন্তু শহরের ভেতর যখন খানিকটা এসে পড়েছে, তখন দেখে, কি আশ্চর্য, এই তো তাদের দেশের লোকও তো রয়েছে, তারই মতোন পোশাক-পরিচ্ছদ, তারই মতোন দেখতে, তবে তাদের কারুর মাথায় ঝাঁকা, কারুর মাথায় বস্তা।

মুন্নুর যেন সব গোলমাল লেগে যায়। বুঝতে পারে না, এটা কিরকম দেশ। কাদের দেশ।

এমন সময় এক মস্ত বড় পাথরের বাড়ির সামনে দয়ারাম দাঁড়িয়ে পড়ে। মুন্নুকে বলে: 'একটু দাঁড়া এখানে!'

মুন্নুর বুকের ভেতরটা তোলপাড় করতে থাকে।

ইম্‌পীরিয়াল ব্যাঙ্কের বাড়ির সামনে কয়েক বার উপরে উঠে দয়ারাম সেলাম ক'রে দাঁড়ায়: 'সেলাম পীর্‌ দীন্‌—

মুন্নু অবাক হয়ে দেখে, যে লোকটিকে চাচা সেলাম জানাল, তারও গায়ে টকটকে লাল কোর্তা, মেহেদি পাতার রঙে লোকটার দাড়ি সব লাল হয়ে গিয়েছে। হাঁপানি রুগীর মতো কাশতে কাশতে দয়ারামের অভিবাদনের উত্তরে সে জানায়: 'এই যে সেলাম সেলাম, আরে···এত দেরি ক'রে? বাবু সাহেব তো রেগে আগুন, কেউ নেই যে তার দুপুরের নাস্তা নিয়ে আসে!'

'বাবু সাহেব তা হলে আপিসেই আছেন?'

'হ্যাঁ—'

দয়ারাম আশ্বস্ত হয়। যখন খানা আনবার কোন লোক নেই, এই উপযুক্ত সময়, এই সুযোগ মতো সে নিশ্চয়ই মুন্নুর একটা ব্যবস্থা করিয়ে নিতে পারবে। মুন্নুকে কাছে ডেকে নিয়ে সে আপিসের ভিতর ঢুকে পড়ে।

মুন্নু নিঃশব্দে তার চাচার অনুসরণ ক'রে চলে। কোনোখানে দেখে, রাশীকৃত টাকা গোনা হচ্ছে···কোথাও বা তাড়া তাড়া নোট খসখস ক'রে গোনা হচ্ছে। হঠাৎ সামনের একটা ঘরে দরজা ঠেলে দয়ারাম ঢুকে পড়ে।

একটা মস্ত বড় টেবিলের সামনে চেয়ারে একটি ছোট্ট মানুষ ব'সে···ফোলা মুখ, মুখের মধ্যে বৈশিষ্ট্য বলতে একটা চ্যাপটা নাক···

পা দুটো দরজার কাছে ঝেড়ে নিয়ে দয়ারাম হাত জোড় ক'রে বলে ওঠে ঃ

'নমস্কার বাবুজী!'

বাবুজী তখন ঘাড় নিচু ক'রে লিখছিলেন। একবার ঘাড় তুলে দেখে নিলেন মাত্র। কোন উত্তর দেওয়া প্রয়োজন বোধ করলেন না।

মুন্নুর কানে দয়ারাম বলে ঃ 'আরে নমস্কার দে, বাবুর নামে দেওতার কাছে দোয়া মাঙ্—'

চারদিকে সেই টাকার ঝনঝনানি, নোটের খসখস আওয়াজ, ঝকঝকে সব পেতলের রেলিঙ, টেবিল, চেয়ার, পায়ের তলায় নরম কার্পেট, মাথার ওপর বোঁ বোঁ ক'রে ঘুরছে ইলেকট্রিক পাখা···মুন্নুর মন সে বিচিত্র জগতে যেন পথ হারিয়ে ফেলে। চাচার নির্দেশ অনুযায়ী কলের পুতুলের মতো আপনার মনে সে বিড়বিড় ক'রে কি যেন বলল···মাটি থেকে মাথা তুলে সে কিন্তু চাইতে পারল না সামনে।

ক্ষণকালের জন্য ঘরে এক বিচিত্র নিস্তব্ধতা···তার মধ্যে বাবুজী আবার ঘাড় তুলে হিসেব-ক'রে একটু হাসলেন···দেখতে দেখতে সে-হাসি ঠোঁটের কোণে অকথিত তাচ্ছিল্যে বেঁকে মিলিয়ে গেল।

মুন্নু সেই সময় একবার চোখ তুলতেই দেখতে পায় সে-ভঙ্গী···ভয়ে আর ভাবনায় তার হাত-পা যেন কাঠ হয়ে আসে।

সিংহাসন-উপবিষ্ট রাজাধিরাজের দিকে একান্ত দীনভাবে চেয়ে দয়ারাম বলে ঃ মহারাজ আপনার সেবার জন্যে ভাইপোটাকে নিয়ে এলাম—'

মুন্নুর দিকে আঙুল তুলে মহারাজ জিজ্ঞেস করেন ঃ 'অঃ—ওটা বুঝি ?'

'জী জনাব! আরে গেঁইয়া হাত জোড় ক'রে দোয়া মাঙ্ বাবুজীর জন্যে—'

মুন্নু তখন একদৃষ্টিতে বাবুজীর পায়ের পালিশ-করা চকচকে বুট জোড়ার দিকে চেয়ে ছিল, চাচার কথায় কলের পুতুলের মতোন সে শুধু ঘাড় আর পিঠ বেঁকিয়ে দিল···কোনদিন কি ঐ রকম একজোড়া জুতো সে পরতে পারবে না ? হঠাৎ চাচার দিকে চোখ পড়তেই, সে বুঝতে পারল, তার নির্দেশের

অর্ধেক সে পালন করেছে, বাকি অর্ধেক যা মুখের কথায় ব্যক্ত করতে হবে, তা তার করা হয়নি।

তাই হঠাৎ সে হাত জোর ক'রে বলে উঠল : 'ভগবান ভালো করুন—'

বাবুজীর অবশ্য সেদিকে দৃষ্টি ছিল না। তাঁর টেবিলের পাশে একটা কালো যন্ত্র তখন ক্রিং ক্রিং ক'রে অনবরত শব্দ করছে···মুন্নু দেখল বাবুজী একটা ছোট্ট চোঙার মতো জিনিস কানের কাছে তুলে নিয়ে কথা বলতে আরম্ভ ক'রে দিয়েছেন···কথাগুলো কিন্তু কোন্ ভাষায় তা সে ঠিক বুঝতে পারছিল না। তার কানে এসে লাগছিল : 'হ্যস্···স্যার—ইয়ে···ফটনট···ইঁ য়্যাপ···'

ভবিষ্যৎ মনিবের মুখে সেই ভাষা শুনতে শুনতে তার মনে হচ্ছিল, তার স্কুলের কথা। তার মাস্টার তাদের বার বার বলতেন : 'বাবু হতে হলে আংরেজী শিখতে হবে—' স্কুলে কিছু কিছু আংরেজী সে শিখেও ছিল—কিন্তু তার সঙ্গে মেলাতে গিয়ে সে যেন বিব্রত হয়ে পড়ল। কিছুক্ষণ ধরে শোনার পর, সে ঠিক ক'রে নিল এই হলো আসল আংরেজী ভাষা।

'আচ্ছা, বাড়িতে নিয়ে গিয়ে বিবিজীর কাছে দিগে যা—'

দয়ারাম জোড়হাতে মাথা নত ক'রে কৃতজ্ঞতা জানায়। তারপর মুন্নুর হাত ধরে টানতে টানতে তাকে ঘর থেকে বার ক'রে নিয়ে আসে সোজা রাস্তায়।

এ-পথ সে-পথ ঘুরতে ঘুরতে তারা যে মহল্লায় এল, মুন্নু দেখে পাশাপাশি ঘেঁষাঘেঁষি সব বাড়ি, যেন একটার গা থেকে আর-একটা বেরিয়েছে : কোনো বাড়ির কোনো শ্রী-ছাঁদ নেই, এলোমেলো ভাঙাচোরা : কোথাও খানিকটা ফেলে-দেওয়া এঁটো শাকসবজি পচছে, কোথাও হয়তো পড়ে আছে ভাঙা কাঁচের সব শিশি বোতল, পুরানো ভাঙা টিনের কেনেস্তারা, ছেঁড়া কাগজ, ময়লা ন্যাকড়ার জঞ্জাল, কোথাও বা ভাঙা পাঁচিলের নোনা-ধরা ইঁটের স্তূপে শেওলা আর বুনো গাছ জন্মে আছে : লোকজনের আসা-যাওয়া থেকে মুন্নু নিজের মনে একটা সিদ্ধান্ত ক'রে নিল, শহরের আশেপাশে যে-সব বাবুরা থাকেন, এই বোধ হয় তাঁদের মহল্লা।

এই মহল্লার একান্তে বাবুজীর বাড়ি : একতলা, চৌকো মতোন ছোট্ট বাড়ি। রাস্তা থেকে কয়েক ধাপ উঠে একটা বারাণ্ডা। বারাণ্ডার ওপর একটা কালো কাঠের টুকরোতে স্পষ্ট সাদা ইংরেজী অক্ষর আশেপাশের দেশী লোকদের সগর্বে

জানিয়ে দিচ্ছে যে, এই বাড়িতে বাস করেন, 'বাবু নাথুমল, সাব-এ্যাকাউন্‌টেন্ট; ইমপীরিয়্যাল ব্যাঙ্ক, শ্যামনগর।'

সেখানে থেকে দাঁড়িয়ে মুন্নু দেখে পাশ দিয়ে যে উঁচু-নিচু পাহাড়ী রাস্তা চলে গিয়েছে, তার খানিকটা ওপরেই, বড় বড় গাছের স্নিগ্ধ ছায়ায় চমৎকার সব ছোট ছোট বাড়ি রয়েছে···ছবির মতোন দেখতে সমান-ক'রে-ছাটা বাহারী গাছের বেড়ায় ঘেরা, সবুজ মখমলের মতো ঘাসের বিছানা পাতা তার আশে-পাশে কত না রঙের কত না ফুলের বাহার···দূর রহস্যলোকের মতো সেই দৃশ্য তার মনকে টানে বিস্ময়ে; ভাবে, ওখানে কারা থাকে?

এমন সময় সেই স্বর্গলোক থেকে হঠাৎ তার দৃষ্টি আবদ্ধ হয়ে গেল এক বিচিত্র মূর্ত্তির ওপর···লাল টকটকে ইয়া বড় মুখ,···মাথার ওপর ছোট্ট চুবড়ীর মতোন কি একটা বসানো···গায়ের জামাটা, মুন্নুর মনে হলো, যেন কোমরের তলা থেকে হঠাৎ হারিয়ে গিয়েছে···নিম্ন অঙ্গে এমন আঁট ক'রে কি একটা পরেছে যাতে মুন্নুর নিজেরই লজ্জা করতে লাগল···সমস্ত বিপুল নিতম্ব দেশটি যেন আরও প্রকট হয়ে উঠেছে···তার ওপর বাদামী রঙের এমন একটা জুতো পরেছে যে তা হাঁটু পর্যন্ত চলে গিয়েছে···এমন কিম্ভূতকিমাকার পোশাক-পরা মানুষ সে আগে আর কখনও দেখে নি···মনে মনে সে ঠিক ক'রে নিল, তা হলে এই হলো আংরেজ!

হঠাৎ দেখল তার চাচা, ডান পা-টা সজোরে বাঁ পায়ের সঙ্গে ঠুকে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বলে উঠল: 'সালাম হুজুর!'

অভিবাদনের উত্তর সেই কিম্ভূতকিমাকার ভয়াবহ মূর্তি কি করল তা দেখবার সাহস মুন্নুর কুলাল না, সে শুধু দেখল তার হাতের বেতটা হাওয়ায় একবার দুলে উঠল···জোর ক'রে মুন্নু নিচে শহরের ভাঙা বাড়িগুলোর দিকে চেয়ে রইল।

মুন্নু যখন বুঝল যে মূর্তিটি তাদের শ্রবণ-সীমার বাইরে চলে গিয়েছে, তখন সে জিজ্ঞাসু নেত্রে চাচার দিকে দু'চোখ বড় বড় ক'রে চাইল। তার উত্তরে দয়ারাম বলে উঠল: 'ব্যাংকের বড় সাহেব!' এই তিনটি কথা উচ্চারণ করতে দয়ারামের কণ্ঠ ভয়, ভক্তি এবং সম্ভ্রমে ভেঙে পড়ল!

তারপর আরও কিছুক্ষণ হাঁটবার পর তারা এসে দাঁড়াল একটা বাড়ির

সামনে। দয়ারাম কয়েক ধাপ উঠে দরজায় ধাক্কা দিল, কিন্তু কোন সাড়া-শব্দ এল না। কড়া ধরে নাড়া দিল। তাতেও যখন কোন সাড়া পাওয়া গেল না, তখন হাঁক দিল: 'বিবিজী! দরজাটা খুলুন একবার!'

পাশের একটা দরজা থেকে চিক তুলে এক নারীর মুখ দেখা দিল।

দয়ারাম হাতজোড় ক'রে বলে উঠল: 'বিবিজী আপনার সেবার জন্যে আমার ভাইপোকে নিয়ে এসেছি, এই যে আমার সঙ্গে—'

তারপর ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে মুন্নুর দিকে চেয়ে বলে উঠল: শুয়োর, হাত জোড়-ক'রে বিবিজীকে বল, আপনার চরণে পেন্নাম হই বিবিজী!'

মুন্নু যন্ত্রচালিতের মতো হাত জোড়ক'রে কোনরকমে উচ্চারণ করে: 'আপনার চরণে—'

এমন সময় বাড়ির ভেতর থেকে শিশুকণ্ঠে আর্তনাদ জেগে উঠল এবং সেই সঙ্গে নারী মূর্তিটিও বাড়ির ভেতর অদৃশ্য হয়ে গেল।

মুন্নু শুনতে পেল, বাড়ির ভেতর থেকে তীব্র উচ্চকণ্ঠে আওয়াজ আসছে:

'মর্, মর্! আমাকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খেল, দু-দণ্ড লোকজনের সঙ্গে যে একটু কথা বলব তারও উপায় নেই? মরবি কবে—হাড় জুড়োবে আমার··· অলপ্পেয়ে ড্যাগরা—'

ছেলের জন্যে আরও অনেক ভালো ভালো বিশেষণ বিবিজী প্রয়োগ ক'রে চলতেন, কিন্তু হঠাৎ দয়ারামের উচ্চ প্রশ্নে তা বাধা পড়ে গেল।

'তাহলে বিবিজী, কথাবার্তা সবই ঠিক রইল, আমি এখন একে রেখে যাই—'

কি উত্তর আসে তার জন্যে মুন্নু কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। ভাবগতিক দেখে ইতিমধ্যেই তার বুক শুকিয়ে গিয়েছিল।

বিবিজী কয়েক পা এগিয়ে আসতেই, আবার শুরু হলো সেই কান্না!

শুধু বিশেষণে কাজ হলো না দেখে বিবিজী তখন ঘরের ভেতরে গিয়ে ছেলেটির গালে একটি বিশেষ চড় বসিয়ে হনহন ক'রে ফিরে এসে বসলেন:

'না, যেও না, দাঁড়াও! বাবুজীকে বলেছো সব?'

'সে আর বলতে হবে না বিবিজী। আপিসে তাঁকে আগে জানিয়ে, তাঁর কথামতো আপনার কাছে হাজির হয়েছি।'

'বেশ ! তাহলে ও এক কাজ করুক—বাড়িতে কোনো তরি-তরকারি নেই। আপিসে যাক, ফেরবার সময় বাজার থেকে···দাঁড়া মুখপোড়া, যাচ্ছি···'

কথা অসমাপ্ত রেখে বিবিজীকে আবার ঘরের ভেতরে ছুটতে হলো, কারণ শান্ত ছেলেটি তখন কান্নায় মা'র দৃষ্টি আকর্ষণ করতে অপারগ হয়ে চিৎকার আরম্ভ ক'রে দিয়েছে।

মুন্নু কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে শোনে, গুনেশুনে গালে চড় পড়ছে···

'হঠাৎ মন্নুর মনে পড়ে গেল তার চাচীর কথা। মনে হলো, তার চাচী অন্তত এর তুলনায় দয়ালু। সেই চিন্তার সঙ্গে-সঙ্গে তার কিশোর চিত্তে, ছিন্ন সুরের মতো এক বিষণ্ণ আর্তনাদ জেগে উঠল, কেমন ক'রে এখানে সে বাস করবে ?

হঠাৎ তার চমক ভেঙে যায়, কানে আসে বিবিজীর কণ্ঠস্বর : 'তুমি বরঞ্চ বাবুজীকে গিয়ে বলো, এর হাত দিয়ে যেন বাজার পাঠিয়ে দেন।'

এত দূর পাহাড়ে-পথ হেঁটে এসে মুন্নু, একেবারে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল, খিদেয় তার সারা অঙ্গ জ্বলছে। এতক্ষণ পর্যন্ত তার মনে-মনে আশা ছিল, যাদের বাড়িতে গিয়ে উঠবে, তারা নিশ্চয়ই হাতমুখ ধুতে বলবে, খেতে দেবে, কারণ তাঁদের গাঁয়ে যে-সে তা-ই দেখে এসেছে : যখনি কোনো নতুন লোক আসে, তা সে যখনি আসুক-না-কেন, আর যে-ই হোক-না-কেন, আগে তাকে খেতে দেওয়া হয়···তারপর কাজকর্ম, অন্য কথা। কিন্তু এখানে একি ব্যাপার ! এসে দাঁড়াতে-না-দাঁড়াতে, ধুলো-পায়েই আবার তাকে কাজে পাঠাচ্ছে ! সে ভাবে হয়তো শহরের এই রীতি-নীতি ! এক সর্বগ্রাসী অবসাদের ভারে যেন সে ভেঙে পড়ে।

দয়ারাম উত্তরে জানায় : 'বেশ তাই হবে বিবিজী !'

আবার সেই রাস্তা ! মুন্নু হাঁটতে আরম্ভ করে। দয়ারাম তাকে আশ্বাস দিয়ে বলে : 'পা চালিয়ে আয়, পা চালিয়ে আয় ! তোর আর ভাবনা কি, বিবিজীর কাছে সুখে থাকবি, খাবি-দাবি—তার ওপর মাসে-মাসে তিনটাকা ক'রে মাইনে পাবি। আমার ডেরা তোকে দেখিয়ে দেবো···ছুটি পেলে চলে আসবি। হাঁ, মন দিয়ে কাজ করবি, আর সব সময় মনে রাখবি তুই ওদের চাকর···তবে ওরা লোক ভালো !'

চাচার সেই অমূল্য উপদেশবাণী শুনতে-শুনতে মুন্নুর দু'চোখ ফেটে জল

ঝরে পড়ে…সেই অশ্রুজলের মধ্যে দিয়ে সে যেন ঝাপশা দেখতে পায় পেছনে ফেলে-আসা তার গাঁয়ের সব পাহাড় সারিসারি দাঁড়িয়ে আছে দ্বিপ্রহরের নীল আকাশের গায়ে হেলান দিয়ে…দেখতে পায় ঝিকিমিকি বিয়াসের রৌপ্যরেখা, তীরে তেমনি চরছে গরুর পাল সবুজ তৃণে মুখ ডুবিয়ে…মাথার ওপর তেমনি রয়েছে উদাস-উদার আকাশ, মাইলের-পর-মাইল জুড়ে…

বাবু নাথুমলের বাড়ির রান্নাঘরের এককোণে কোনরকম জড়সড় হয়ে মুন্নু সে-রাত্রির মতো শয্যাগ্রহণ করে। কিন্তু সারা রাত্রির মধ্যে সে ভালো ক'রে ঘুমুতে পারে না। বিষণ্ণচিত্তে নিদ্রাও চায় না প্রবেশ করতে। গায়ে দেবার জন্যে একটা শতচ্ছিন্ন ময়লা লেপ সে পেয়েছিল বটে, কিন্তু মশার কামড়ে তাকে সারাক্ষণ প্রায় অর্ধ-সজাগ ক'রে রাখে। তার ওপর একদল রাতকানা মাছি তাদের রাত্রিবাসের উপযুক্ত স্থান হিসেবে তার মুখটিকে নির্বাচিত ক'রে নিয়েছিল। নিরুপায় হয়ে চোখদুটি বন্ধ ক'রে সে পড়ে রইল।

ভোরবেলা সে আর শুয়ে থাকতে পারল না। কোথায় এসেছে, রাত্রির অন্ধকারে তা সে ভালো ক'রে দেখতেই পায় নি। তাই ঘুম থেকে উঠে, রান্নাঘর থেকে পা টিপে টিপে বেরিয়ে সে উঁকি মেরে এদিক-ওদিক দেখতে লাগল।

একটা তীব্র নাক-ডাকার আওয়াজ আসছে। বাবু নাথুমল ঘুমুচ্ছেন। তার পাশেই আর-একটা ঘর। জানালা দিয়ে উঁকিমেরে মুন্নু দেখে তার মনিবের চেয়ে ফরশা আর-একজন লোক ঘরে বিছানার ওপর ঘুমুচ্ছে। কাল রাত্তিরে সে কথাবার্তার মধ্যে শুনেছে, তার মনিবের একজন ছোট ভাই আছে। নিশ্চয়ই এই সেই ছোটবাবু।

এমন সময় হঠাৎ মুন্নু চমকে উঠল!

বিবিজীর গলার আওয়াজ: 'এ মুন্নু, উঠেছিস?'

মুন্নুর বুকের ভেতরটা যেন খুব জোরে ধাক্কা দিতে লাগল। তার ভয় হলো, হয় তো তার পায়ের শব্দে বিবিজীর ঘুম ভেঙে গিয়েছে।

ভীতকণ্ঠে সে জবাব দেয়: 'উঠেছি বিবিজী!'

ঘরের ভেতরে থেকে নিদ্রা-অলসকণ্ঠে আদেশ আসে;

'তাহলে বসে না থেকে উনুনের ছাইগুলো ফেল…রাত্রিরের এঁটো বাসন-

গুলো মাজ···বলি, বাসনগুলো মেজে শুতে পারো নি ? অত সকাল-সকালে শোবার ঘটা কেন ?···হাঁ, তারপর উনুনে ধরিয়ে কেটলিতে ক'রে জল চড়িয়ে দিবি —বাবুজীর চা হবে···একটু পরে আমি উঠছি।'

রান্নাঘরের দিকে অগ্রসর হতে-না-হতে হঠাৎ মুন্নুর শরীরটা যেন কেমন ক'রে উঠল। প্রতিদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে ঘটি হাতে সে মাঠে চলে যেত। মাঠ থেকে কাজ সেরে, একেবারে পাতকুয়োর জলে স্নান সেরে সে বাড়ি ফিরত।

এতক্ষণ সে-কথা মনেই ছিল না, কিন্তু প্রকৃতি যথাকালে তা স্মরণ করিয়ে দেবেই। কিন্তু বিপদ হলো সে যায় কোথায় ? চারদিকেই ঘর-বাড়ি। তখন লোক চলাচল শুরু হয়ে গিয়েছে।

ক্রমশ ব্যাপারটা অসহ্য হয়ে এল। সে আর নিজেকে চেপে থাকতে পারছে না। কি বিপদ ! কোথায় যায়, কি ভয়ঙ্কর জায়গা রে বাবা শহর !

বাড়ির গায়ে পাঁচিলের ধারেই নিরুপায় হয়ে সে বসে পড়ল।

এমন সময় বিবিজী হেঁকে উঠলেন : 'আরে মুন্নু, কোথায় গেলি রে মড়া ?'

মুন্নু মহাবিপদে পড়ল কিন্তু প্রকৃতির চরম আহ্বানে সাড়া না-দিয়ে উপায় কি ?

কোন উত্তর না পেয়ে বিবিজী বাড়ির ভেতর এদিক-ওদিক খুঁজে দেখতে না পেয়ে সদর দরজা খুলে যেই বাইরে চেয়েছেন, অমনি দেখেন···ও মা!···

তাড়াতাড়ি দরজা বন্ধ ক'রে দিয়ে চিৎকার ক'রে উঠলেন :

'ওমা ছি, ছি, কি সব্বোনাশ ! কি লজ্জা, কি ঘেন্না, কোথাকার একটা নির্লজ্জ বেহায়া চাষা মরতে এল রে ! শোর কুকুরেরও অধম !'

দম-দেওয়া কলের মতো অনর্গল চলতে থাকে :

'বলি আমার বরাতে কোথা থেকে এসে জুটল এ পাপ···মরেও না এরা গো, কি ঘেন্না, কি ঘেন্না···বলি, কোথায় মরবি আমাকে জিজ্ঞেস করতে কি হয়েছিল রে মড়া ! কোথা থেকে একটা জানোয়ার মরতে এল রে আমার ঘাড়ে···মর্··· দুবেলা বড় সাহেব এই পথ দিয়ে যায়, যদি দেখে, কি বলবে মাগো বাবুজীর মান-মর্যাদা থাকবে কোথায় ? কি সব্বোনাশ···আমারই দরজার গোড়ায় কি বিতিকিচ্ছিরি কাণ্ড গো ! ওমা, কি হবে !'

দীর্ঘ বক্তৃতা, কিন্তু একটানা সুর নয়। তার মধ্যে কণ্ঠস্বরের উত্থান-পতন

আছে। প্রথমটা খাদে, আকস্মিকতার প্রথম ধাক্কা, তারপর রাগের চাপা ফোঁসফোঁসানি, ক্রমশ সেটা আপনার থেকে শক্তি অর্জন ক'রে অভিশাপ-বর্ষণের গর্জনে পরিণত হয়ে শেষকালে ফেটে পড়ে, অসহায় হতাশায়।

মুন্নুর মনে হতে লাগল, দেহের সমস্ত রক্ত ছুটে মাথার দিকে চলেছে··· চোখের সামনে সেই প্রভাতকালে যেন সব আবছা হয়ে আসছে—কোনরকমে সে যেমন আছে তেমনিভাবে যদি হঠাৎ পৃথিবী থেকে অদৃশ্য হয়ে যেতে পারতো! নিত্য প্রভাতে সে যে-কাজ বিনা-চিন্তায় সমাপন ক'রে এসেছে, তার জন্যে যে জীবনে এত লাঞ্ছনা আর লজ্জা পেতে হবে, সুদূরতম কল্পনাতেও সে তা ভেবে উঠতে পারে নি।

ইতিমধ্যে সমস্ত বাড়ি সজাগ হয়ে উঠেছে।

প্রথম এলেন বাড়ির কর্তা স্বয়ং বাবু নাথুমল···বক্র পদ, চতুষ্কোণ গ্রীবা, তাঁর ধারণা যে বাড়িতে নিশ্চই চোর ঢুকেছে কিংবা ডাকাত পড়েছে···তারপর এলেন ছোটবাবু প্রেমচাঁদ···সুদর্শন সুগঠিত দেহ···স্বচ্ছন্দ-গতি এবং সহজ··· প্রশ্ন করলেন : 'কি ব্যাপার ? বলি হলো কি ?'

তারপর এল বাবুজীর জ্যেষ্ঠা কন্যা শীলা···দশমবর্ষীয়া ক্ষীণাঙ্গী বালিকা···মাথায় একরাশ সোনালী চুল···দুধের মতো গায়ের রঙ···ব্যাপারটা বুঝতে পেরেই তার দুষ্টু চোখ দু'টো আপনা থেকে হেসে উঠল···

'হলো আমার মাথা আর মুণ্ডু! দেখো না, লক্ষ্মীছাড়া গেঁয়ো ভুত আমার রান্নাঘরের সামনে ওর বাপের পিণ্ডি নামিয়েছে! রক্ত-খেগো, মর্ মর্···'

এতক্ষণ পরে বাবু নাথুমল পরিস্থিতির গুরুত্ব উপলব্ধি ক'রে শীর্ণ হাতখানি তুলে গর্জন ক'রে উঠলেন : 'হারামজাদা, এ কি করেছিস! এখানে কেন?'

বিবিজীকে আর একটু উত্তেজিত ক'রে তোলবার জন্য ছোট বাবু রসান দিয়ে উত্তর দিলেন : 'ওখানে না করলে, কাপড়ে করতে হতো···তখন হয়তো বিবিজীকেই পরিষ্কার করতে হতো···এতে অন্তত মেথর এসে সাফ ক'রে যাবে···'

শীলা ছোটকাকার পা জড়িয়ে খিলখিল ক'রে হেসে উঠল।

বহুকষ্টে রাগ দমন ক'রে নাথুমল শীলার দিকে চেয়ে বললেন : 'তুই এখানে কি করছিস, যা এখান থেকে। চল্···চল্···'

ঘরের ভেতর এসে স্ত্রীর দিকে চেয়ে বললেন ঃ 'পায়খানাটা কোথায় তা তোমার দেখিয়ে দেওয়া উচিত ছিল।'

বিবিজী গর্জন ক'রে উঠলেন ঃ 'তাই বটে আর কি! ঐ চাষাকে দিচ্ছি কি না আমাদের পায়খানা ব্যবহার করতে! এখন যাও শিগগির একটা মেথর ডেকে আনো।'

ব্যাপারটা যাতে সেইখানেই শেষ হয়ে যায়, সেইজন্য ছোটবাবু শীলার মারফৎ বিবিজীকে জানালেন ঃ 'বলি, ও শীলা, তা বলে আমরা কি দোষ করলুম? আমরা কি আজ চা পাবো না?'

উত্তর শীলাকে দিতে হলো না। বিবিজীই দিলেন ঃ 'থাম প্রেম···একটু আর সবুর সইছে না? আগে এটার একটা ব্যবস্থা করি, তারপর···'

হনহন ক'রে ঘরের বাইরে যেতেই দেখেন, রান্নাঘরের সামনে মুন্নু দাঁড়িয়ে আছে।

চেঁচিয়ে উঠলেন ঃ 'বলি হারামজাদা, মরতে গিয়েছিলি কোথায়?'

যন্ত্রচালিতের মতো মুন্নু বলে ঃ 'হাত মুখ ধুতে।'

'হাত মুখ ধুতে? যা, বাইরের কল থেকে নেয়ে আয়। তবে আমার বাসন-পত্র ছুঁবি। দাঁড়িয়ে রইলি যে, বেরো আমার সামনে থেকে রক্ত-খেগোর ঝাড়···'

মুন্নু যেতে-যেতে শুনতে লাগল বিবিজী তখনও গর্জন করছেন।

'ভাবলুম যাক, একটা চাকর এল, এবার বুঝি একটু ঝাড়া-হাত-পা হবো, ওমা, উলটো দেখছি এ এক নতুন বিপত্তি ঘাড়ে চাপল। পাড়াগেঁয়ে ভুত, কত আর ভালো হবে!'

ছোটবাবু হেসে বলে ওঠেন ঃ 'সাবধান ভাবী, পাড়াগাঁয়ের লোকদের অমন ক'রে নিন্দা করো না···তুমিও পাড়াগাঁ থেকে এসেছো···'

বিবিজী ঘাড় বেঁকিয়ে বলে ওঠেন ঃ 'তুমি রসো ঠাকুর পো, আর জ্বালিয়ো না তো বাপু! চাকর-বাকরের সামনে ও-রকম করলে মান-মর্যাদা থাকে!'

যাতে বিবিজীর শ্রুতিগোচর হয় এমন উচ্চকণ্ঠে শীলাকে ডেকে ছোটবাবু বলেন ঃ 'শীলা তোর মনে আছে রেলের স্টেশনে চা-কোম্পানীর সেই বিজ্ঞাপনে কি কবিতা লেখা ছিল?'

কাকাবাবুর অভিপ্রায় বুঝতে না-পেরে শীলা সহজভাবেই উত্তর দেয় : 'ও সেই কবিতাটা, না ? গ্রীষ্মকালে চা খাও শরীর ঠাণ্ডা হবে, শীতকালে…'

'হাঁ, হাঁ, তোর মনে আছে তো দেখছি ! যা তো মা-জননী, বিবি উত্তম কাউরের কানের কাছে গিয়ে জোরে-জোরে আবৃত্তি কর্…'

শীলা ছুটে গিয়ে শুরু করে : 'গ্রীষ্মকালে চা খাও শরীর ঠাণ্ডা…'

রুক্ষকণ্ঠে বিবিজী চিৎকার ক'রে ওঠেন : 'থাম থাম পাজী। তোরা সবাই-মিলে আমার মাথাটা চিবিয়ে খা। বলি তোর চাচা না হয় ডাক্তারী কলেজে পড়তে গিয়ে সাহেব হয়ে গিয়েছে, তুইও দেখছি মেম-সাহেব হতে চলেছিস ?'

মুন্নু তখন ভিজে স্যাঁৎসেঁ'তে অন্ধকার কলতলায় বসে বাসন মাজছিল… কোথা থেকে একটা ভ্যাপশা দুর্গন্ধ এসে হঠাৎ তার নাকে লাগতেই, সে এদিক ওদিক চেয়ে দেখল সামনে একটা ভাঙা কাঠের দরজা ঈষৎ খোলা রয়েছে… দুর্গন্ধটা সেখান থেকেই আসছে। এবং গন্ধের ইঙ্গিতে মুন্নু বুঝল, ঐটেই নিশ্চয়ই পায়খানা ! কি আশ্চর্য !

হঠাৎ শীলা বলে উঠল : 'মা দু'একখানা বাসন মেজে দেব আমি ?'

'দূর হয়ে যা এখান থেকে। ভালোয় নেই মন্দোয় আছে। শুয়োর পেটে খাবে, কাজ করবে না ? তোমাকে আর হাত নোংরা করতে হবে না।'

এমন সময় হঠাৎ বাইরের ঘরে গ্রামোফোন বেজে উঠল। মুন্নু বাসন রেখে দিয়ে উঠে দাঁড়ায়। বাইরের কলে ধোবার অছিলায় বাসনগুলো নিয়ে সে বাইরের ঘরের পাশ দিয়ে উঁকি মেরে যায়…ঠিক ঐ রকমই তো যন্ত্র আসবার সময় সে দেখেছিল !

তাড়াতাড়ি কোনরকমে বাসনগুলো ধুয়ে বারাণ্ডা দিয়ে না-গিয়ে, মুন্নু সোজা বাইরের ঘরের ভেতর ঢুকে পড়ল। সেই অদ্ভুত যন্ত্রটি স্বচক্ষে দেখবার জন্যে তার চিত্ত উদ্বেগ হয়ে উঠেছে তখন। তাকে দেখেই ছোটবাবু বলে উঠলেন : 'এই হুতুম প্যাঁচার বাচ্চা, ভিজে পায়ে ঘরে ঢুকলি যে ?'

ঘরের কার্পেটের ওপর তখন ভিজে বাসন থেকে ফোঁটা ফোঁটা জল পড়ছে।

ব্যঙ্গের সুরে ছোটবাবু বলে উঠলেন : 'হুজুর, সামনে ঐ চট রয়েছে… ঘরে ঢুকতে হলে ঐ চটে পা মুছে ঢুকতে হয়…বুঝেছেন হুজুর ?'

মুন্নুর মন খুশীই হলো তাতে। ছোটবাবু তো আমাকে ঘরে ঢুকতে বারণ করলেন না!

সাহস ক'রে সে মেশিনটার দিকে এগিয়ে গেল। ইচ্ছা হলো একবার সে নিজে হাত দিয়ে যন্ত্রটা ছুঁয়ে দেখবে···দেখবে কেমন ক'রে কোথা থেকে গান আসছে। উল্লাসে সব ভুলে গেল···কয়েক মুহূর্ত আগে যে লাঞ্ছনা তাকে ভোগ করতে হয়েছে। তখন শুধু তার এই ভেবেই মন আনন্দে ভরে উঠেছে, এমন আশ্চর্য জিনিস যে বাড়িতে আছে, তার পরম সৌভাগ্য যে, সে সেই বাড়িতেই এসে পড়েছে!

তাড়াতাড়ি বাসনগুলো রান্নাঘরের দাওয়ায় রেখে দিয়ে, ছাই ফেলবার অছিলায় সে আবার ছুটল বাইরের দিকে। বাইরে তাড়াতাড়ি ছাইগুলো ফেলে আসবে, এমন সময় হঠাৎ গান থেমে গেল।

'এই তোর নাম কি রে?'

মুন্নু ফিরে দেখে একটা ছেলে কলসীতে জল ভরছে আর দু'জন বসে আছে। যে জল ভরছে, সেই ছেলেটিই প্রশ্ন-কর্তা।

'ছাই ফেলতে হয় তো এই গাদায় ফেলবি।'

নির্দেশ মতো মুন্নু সেই গাদায় ছাই ফেলে সহজভাবে জিজ্ঞেস করে:

'তুমিও বুঝি এখানকার চাকর, না?'

ছেলেটি উত্তর দেয়: 'বাবু গোপাল দাসের বাড়িতে আমি কাজ করি। তোর বাবুর চেয়ে ঢের বড় বাবু। আর এরা দু'জন কোর্টের বাবুদের বাড়িতে কাজ করে। আমরা তিনজনেই হোসিয়ারপুরের ছেলে।'

উৎসাহিত হয়ে মুন্নু বলতে আরম্ভ করে: 'আমি আসছি ক্যাংড়া থেকে··· সেখানে চাচা আর চাচীর বাড়ি আছে···সেখানে কত সব লোকজন ক্ষেতখামার···' অযাচিতভাবে অনর্গল সে বলে চলে তার জীবনের অতি প্রয়োজনীয় সব সংবাদ · একবার যখন সে খুব ছোট ছিল, সেও তার বাবার সঙ্গে হোসিয়ারপুরে গিয়েছিল···

প্রত্যুত্তরে তারাও জানায় তাদের জীবনের সব ঘটনা।

এইভাবে কয়েক মুহূর্তের মধ্যে তাদের সব অন্তরঙ্গ সংবাদ আদান-প্রদানের মধ্য দিয়ে তারা নিজেদের নিঃশেষিত ক'রে ফেলে।

এমন সময় আবার গান বেজে ওঠে। মুন্নু ছুটে চলে আসে সোজা বাইরের ঘরে।

'এই বাঁদর। নাচ দেখি…বাঁদর-নাচ…' হঠাৎ ছোটবাবু রসিকতা ক'রে ওঠেন।

ছোট মনিবের মনের ভাব মুন্নু বুঝতে পারে। সে তৎক্ষণাৎ কার্পেটের ওপর পড়ে হামাগুড়ি দিতে আরম্ভ করে। গাঁয়ে পেশাদার বাঁদর-নাচিয়েদের কাছে সে যেমনটি দেখেছিল, মনিবের মনোরঞ্জনের জন্যে ঠিক তেমনিভাবে বানরের মতোন হেলে-দুলে নাচতে আরম্ভ করে।

শীলা হাসিতে ফেটে পড়ে: চাচা, চাচা, দেখো কি সুন্দর বাঁদর!'

ছোটবাবু পেশাদার নাচিয়েদের মত হাত নেড়ে উৎসাহ দিয়ে বলে ওঠেন: 'সাবাস বাঁদর…সাবাস!'

বাবু নাথুমলের ছোট মেয়ে লীলাও সে-খেলায় যোগদান করে। ছোট দুটি হাতে সে হাততালি দিতে আরম্ভ করে।

উল্লাসে শীলা প্রস্তাব করে: চাচা আমি ভালুক হবো?'

মুন্নু সব ভুলে গিয়ে মনের আনন্দে হেলে-দুলে নাচে, মুখ ভ্যাংচায়, চোখ ঘোরায়, বাঁদরের মতো চেঁচিয়ে ওঠে।

হঠাৎ সুর ছিঁড়ে যায়।

বিবিজী গর্জন করতে করতে ঘরে ঢোকেন: 'বলি কিসের এত হইচই গোলমাল? ওমা একি কাণ্ড? এ হারামজাদাকে কে ঘরে ঢুকতে দিলে?'

হঠাৎ ঘরের মধ্যে সব স্থির হয়ে যায়। নিস্পন্দ, নীরব। কি সর্বনাশ! মনিবদের সামনে সমানে হাসছে! আস্পর্ধা!

মুন্নু ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে রান্নাঘরের সামনে গিয়ে হাজির হয়। আজ বহুদিন পরে যেন সে আবার সেই তার পল্লী-জীবনের সহজ আত্মপ্রকাশের সুযোগ পেয়েছে…তার দেহ-মন খুশীতে ভরে উঠেছে। তখনও তার মুখে সে-খুশীর হাসি লেগেছিল।

বিবিজী তখন টোস্ট তৈরি করার ব্যাপারে নিতান্ত আটকে পড়েছিলেন বলে গালাগালের বন্যাটা সেইখানেই থেমে গিয়েছিল।

কিন্তু কয়েক মিনিট পরেই তিনি রান্নাঘরে ফিরে এলেন এবং কয়েক মিনিট ধরে ভৃত্যের কর্তব্য সম্বন্ধে অনর্গল উপদেশ বর্ষণ ক'রে চললেন :

'তোর জায়গা হলো রান্নাঘর···ছোটবাবু বা ছেলেদের হুল্লোড়ে যদি মিশিস তাহলে তোরই একদিন কি আমারই একদিন ! কাজ সব চটপট করবি, এক মিনিট ফাঁকি দিতে পারবি না। দশটার সময় বাবুজী আপিসে যান···শীলাও সেই সময় স্কুলে যায়, সেই জন্য তোকে রাখা হয়েছে, যাতে তার মধ্যে সব কাজ তাড়াতাড়ি শেষ হয়···আর অমনি তো নয়···রীতিমতো মোটা মাইনে দিয়ে তোকে পোষা হচ্ছে ···এক গাদা টাকা···যে টাকা তুই জীবনে দেখিস নি, তোর বাপ-দাদাও দেখে নি···আর ভালো কথা···মেথর এলে, তাকে বলে দেখে নিবি বাইরে পাহাড়ের তলায় চাকরদের পায়খানা কোথায় আছে···দরকার হলে সেখানে যাবি···আর স্নান না ক'রে বাড়ি ঢুকবি না···ময়লা হাতে কোন জিনিস-পত্তর যদি ছুঁয়েছিস তাহলে···হাত পরিষ্কার আছে তো ?'

মুন্নু সঙ্কুচিত হয়ে বলে : 'হাঁ।'

'যা, চা'টা ছোটবাবুকে দিয়ে আয় !'

মুন্নুকে দেওয়া হলো একটা ট্রে-র ওপর চায়ের কাপ, আর-একটা ডিসে টোস্ট ···আর-একটা বাটিতে দুধ···সেই মহা-ভাবনায় পড়ল। কি ক'রে নিয়ে যাবে ? এক একটা ক'রে নিয়ে যাবে, না সবগুলোই একসঙ্গে নিয়ে যাবে ? শেষকালে কি করতে কি ক'রে বসবে, এই ভয়ে সে বিবিজীকে জিজ্ঞেস করাই যুক্তিযুক্ত মনে করল।

'এগুলো নিয়ে যাবো কি ক'রে ?

'নিয়ে যাবো কি ক'রে ! ওমা ! কি বিপদেই পড়লাম। সারাদিন ধরে তোমাকে এক-একটা ক'রে কাজ এমনি ক'রে বলে বলে করাতে হবে নাকি··· পোড়া কপাল আমার···কোথা থেকে একটা উজবুক ধরে এনে গছিয়ে দিয়ে গেল দয়ারাম···!'

মুন্নু ততক্ষণ একদৃষ্টিতে সেই কাপ-ডিসগুলি দেখছিল···এ ধরনের বাসন তাদের গাঁয়ে সে দেখে নি···খড়ির মতো সাদা···অথচ কাঁচের মতো চকচক করছে··· সে ভেবে কিছুতেই ঠিক করতে পারে না, এগুলো কিসের তৈরি। বিবিজীকে জিজ্ঞেস করবে ?

ভাবতে ভাবতে সে হঠাৎ জিজ্ঞেস ক'রে ফেলে : 'এগুলো কিসের তৈরি বিবিজী ?'

বিবিজী তখনও তাঁর বক্তব্য শেষ করেননি। হঠাৎ তার মধ্যে এমন অবান্তর প্রশ্ন শুনে তিনি আরও ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন :

'আস্পর্ধা ! আমার কথার মধ্যে কথা বলা ! কিসের তৈরি ? ন্যাকা···যা, যা বলেছি, তাই কর গে যা···ওধারে চা ঠাণ্ডা হয়ে গেল···ওমা, কি কাণ্ড ! চীনে মাটির তৈরি, তা-ও জানো না···সাবধান···হাত থেকে যেন পড়ে না···তা হলে তোমার হাড়ও আস্ত রাখবো না !'

বিবিজী বকে যেতে লাগলেন···মুন্নু সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না ক'রে ট্রে-টা তুলে নিয়ে বাইরের ঘরের দিকে চলল।

বাবু প্রেমচাঁদ হাততালি দিয়ে বলে উঠলেন : 'স্বাগতম্···শীলা···এতক্ষণ পরে তবু চা এল···'

উল্লাসে শীলা চিৎকার ক'রে উঠল : 'চা চা··!'

একধারে বসে ছোট্ট লীলা আপনার মনে ঘাড়ে নেড়ে নেড়ে গান শুনছিল··· চায়ের গন্ধ পেয়ে সে-ও বলে উঠল : 'এ্যা···উঁ'···আমিও চা খাবো···'

মুন্নুকে দেখে ইংরেজী হিন্দুস্থানীতে কৃত্রিম কোপে প্রেমচাঁদ বলে উঠল : 'ইধারমে রাখ্‌হো···ইয়ে কালা অড্‌মি !' এটি প্রেমচাঁদের বিলাস। কোন বিলিতি জিনিস দেখলে, বা সাহেবী পোশাক পরলে, সাহেবরা যে-ভাবে ট্যারা হিন্দুস্থানীতে তাদেরই 'বয়ে'র সঙ্গে কথা বলে, সে-ও তেমনি বলে।

টেবিলের উপর ট্রে-টি রেখে দিয়ে মুন্নু দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল, ছোটবাবু কেমন ক'রে একটা শুঁড়ওয়ালা বাটি থেকে চা ঢালল, কেমন ক'রে আলাদা আলাদা বাটি থেকে দুধ আর চিনি মেশাল···কেমন ক'রে চামচে দিয়ে নাড়তে লাগল···

আপনা থেকে তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ল : 'কি আশ্চর্য !'

সবই তার কাছে অদ্ভুত লাগছে। এক বাটি থেকে চা, আর-এক বাটি থেকে দুধ ঢালবার মানে কি ? তাদের বাড়িতে সে দেখেছে, তার চাচী একটা কড়ায় চা, চিনি, দুধ সব একসঙ্গে দিয়ে গরম ক'রে, তারপর এক-এক গেলাস

জেলে দেয়। একটু আগে সে দেখলে, বিবিজী একটা কি-রকম ধরনের গোল রুটি ছুরি দিয়ে কেটে আগুনে এক-একখানা টুকরো পোড়াল! এ আবার কি রকম রুটি? পাঁউরুটি এর আগে সে দেখে নি।

মুন্নুকে দরজার গোড়ায় দাঁড়িতে থাকতে দেখে হঠাৎ শীলা বলে উঠল: 'চাচা, ওকে একটু চা দেবে না?'

কথাটা বিবিজীর কানে যেতেই তিনি মুন্নুকে ধমক দিয়ে উঠলেন: 'ওখানে হাঁ ক'রে দাঁড়িয়ে কেন রে মড়া? কাজ নেই? বলি রান্নাঘর থেকে এখানে চায়ের ট্রে-টা এনেই বুঝি ভাবছ মাইনের যোগাড় হয়ে গেল!'

চা খেতে-পাক আর নাই-পাক, শীলার কথাতে মুন্নুর মন ভিজে গিয়েছিল। ইচ্ছা ছিল একটু দাঁড়িয়ে দেখে, কিন্তু বিবিজীর মুখের দিকে চেয়ে সাহসে কুললো না। সোজা রান্নাঘরের দরজায় গিয়ে হাজির হলো।

পেছনে পেছনে বিবিজীও এসে হাসির। 'যাও, বাসনগুলো নিয়ে ফের বেশ ক'রে ছাই দিয়ে রগড়ে-রগড়ে মেজে নিয়ে এসো···একটুও দাগ বা তেল যেন লেগে না থাকে।'

মুন্নু নীরবে বাসনগুলো নিয়ে বসে। বিবিজী দাঁড়িয়ে দেখেন···মনঃপুত হয় না···গর্জন ক'রে ওঠেন: 'খুব হয়েছে···আর মাজতে হবে না···সব কাজ সেই আমাকেই করতে হবে···কাউকে কি একটা কাজের ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত হবার জো আছে···বলি, ও কানা তোর মাজা ঐ বাসনগুলো দেখ···আর তাকের ঐ বাসনগুলো দেখ···ঠিক অমনি ঝকঝকে করতে হবে রে মড়া···'

মুন্নুর বরাত ভালো, ঠিক সেই সময় বাইরের ঘর থেকে বিবিজীর ডাক পড়ল।

'বলি অ-শীলার মা শুনছো গো···।' বাবু নাথুমলের গলা।

বাবু রামলাল এসেছেন···আর-এক কাপ চা চাই···ঐ সঙ্গে আমার জন্যে এক কাপ গরম জল···দাড়ি কামাবো···শীলার স্নানের জলও···রামলাল বাবুর মেয়েদের হ'য়ে গিয়েছে···শীলা তো ঐ সঙ্গেই স্কুলে যাবে···'

কিছুক্ষণ পরে বিবিজী শীলা আর লীলাকে স্নান করিয়ে দেবার জন্যে নিয়ে এলেন।

মুন্নু বাসন মাজে আর দেখে আর ভাবে, মেয়েমানুষ, না রাক্ষুসী!

তার মন কিন্তু পড়ে থাকে বাইরের ঘরে···সেখানে ছোটবাবু চা খাচ্ছে···

লোকটা অত্যন্ত আমুদে···বড়বাবু বিচিত্র দেহ নিয়ে শুয়ে গড়াগড়ি দিচ্ছেন··· আবার কে একজন নতুন বাবু এসেছেন।

এক ফাঁকে সে উঠে গিয়ে বাইরের ঘরের দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে দেখে··· ছোটবাবু ওকি কাণ্ড করছেন! একটা সাবান দিয়ে সারা মুখ ঘষছেন··· তারপর একটা দাঁতওয়ালা ছোট যন্ত্র নিয়ে মুখটা যেন চষে ফেলছেন···

বুঝল, ছোটবাবু দাড়ি কামাচ্ছেন। মনে পড়ল, তাদের গাঁয়ের নাপিত ভায়ার কথা। কিন্তু তার হাতে তো থাকে একটা লম্বা ক্ষুর আর কত সন্তর্পণে সেই ক্ষুর সে চালায়। ছোটবাবু কিন্তু চোখ বুজে যন্ত্রটা চালাচ্ছেন···এদিক-ওদিক···ওপর নিচে···একটুও কাটছে না···কি মজা!

হঠাৎ মুমুর সেই বিস্মিত মুখের ওপর দৃষ্টি পড়াতে ছোটবাবু তাঁর স্বাভাবিক রসিকতার ভঙ্গীতে বলে উঠলেন: 'চোখ বার ক'রে কি দেখছিস রে পেঁচা?'

মুনু একটু বিব্রত হয়ে পড়ে। সামলে নিয়ে হেসে বলে: 'যন্ত্রটার বুঝি অনেক দাম, ছোটবাবু?'

'কেন? মাথার চুল কামাবি নাকি? হঠাৎ তোর মা-বাপ কবে ম'লো?'

'আমার মা-বাপ তো নেই বাবুজী!'

'ও নেই! তা এ শখ হলো কেন? বয়সে তো আমার কড়ে আঙুলেরও যুগ্যি নও, এর মধ্যে ক্ষুর দিয়ে করবে কি চাঁদ! আচ্ছা, চট ক'রে একটা কাজ কর দেখি···ও ঘর থেকে আমার তোয়ালেটা এনে দে···আমি তোকে একটা জিনিস দেবো···তবে ক্ষুর নয়, একটা ব্লেড···ইচ্ছে হলে নিজের গলাটা দিব্যি কেটে ফেলতে পারবি!'

আহ্লাদে মুন্নুর মন ডগমগ হয়ে উঠল···ছোটবাবু তাকে দেবে বলেছেন··· মুহূর্তের মধ্যে ছোটবাবুর সঙ্গে একটা অন্তরের আত্মীয়তা সে তৈরি ক'রে নিল··· নাচতে-নাচতে তোয়ালে নিয়ে হাজির হলো।

কিন্তু তখুনি পিছনে কামান ফেটে পড়ে।

'বলি ও ন্যাদা-পেটা, এখানে দাঁড়িয়ে মজা দেখছিস? আর ওধারে আমি খেটে-খেটে মরছি! দাঁড়িয়ে আছিস কি? কাজ নেই আর?'

'কি কাজ করবো বলুন?'

'ওমা, তুমি কাজ দেখতে পাচ্ছ না? বলি ও কানা, চায়ের বাসনগুলো ধোবে কে? তরকারিগুলো কুটবে কে?"

মুন্নু বিনা বাক্যব্যয়ে চায়ের বাসনগুলো ধুতে আরম্ভ করে।

মনে পড়ে চাচীর কথা। চাচী তাকে গালাগাল দিত বটে কিন্তু এ রকম ক'রে তো তাকে খাটিয়ে মারত না। ঘরের সব কাজ চাচীই করতো, সে নিজেই গায়েপড়ে এটা-ওটা ক'রে দিত। তবে চাচীর ছেলেপুলে হয় নি বলে, গাঁয়ের লোকেরা তাকে কথা শোনাত। সে উলটে সেই রাগ মুন্নুর ওপর ঝাড়ত। নইলে মুন্নুর মনে পড়ে, কতদিন চাচী তাকে আদর ক'রে বুকে টেনে নিয়েছে, চুমু খেয়েছে, কতদিন রাত্তির বেলায় চাচীর কোলের কাছে শুয়ে চাচীকে জড়িয়ে ধরে ঘুমিয়ে পড়েছে। এ মাগী অকারণে তাকে গালাগাল দেয়, অকারণে তাকে উত্ত্যক্ত ক'রে মারে।

চায়ের বাসনগুলো ধুতে-ধুতে সে ভাবে, নিজেকেই নিজে আশ্বাস দেয়, হয়তো একদিন বিবিজী আর তাকে এ রকম উত্তক্ত্য করবে না, বুঝবে মুন্নু কত ভালো ছেলে, সে-ও তখন বাড়ির ছেলের মতোন হয়ে যাবে। আপাতত ছোটবাবু তো মন্দ লোক নন, ভারী মজার কথাবার্তা বলেন, ছেলেমেয়েরাও তার বাঁদরনাচ দেখে খুশী হয়েছে। বড়বাবু তেমন কিছু বলেন না কিন্তু ঐ বিবিজী···

ভাবতে-ভাবতে সে শিউরে ওঠে। বিবিজী সম্বন্ধে মনে-মনে সে যে কল্পনা করছে, যদি তা কোনরকমে বিবিজী জানতে পারে! কাজ নেই বিবিজীর কথা ভেবে। সে ইচ্ছে ক'রে অন্য জিনিস ভাবতে চেষ্টা করে। ছোটবাবুর ঘরে সে রেশমের কি সুন্দর সব পোশাক দেখেছে···একমমাত্র সেই সাহেবকেই সে-রকম সুন্দর পোশাক পরতে রাস্তায় সে দেখেছে···

কাজ সেরে উঠতেই দেখে সামনে ছোটবাবু···

'এই যে, মহামহিমান্বিত মুন্নু বাবু···আপনার কলতলার কাজ সারা হয়েছে বোধ হয়···এবার তাহলে আমি নাইতে যেতে পারি···'

'নিশ্চয় বাবুজী! আমাকে আপনি···'

মুন্নু কথা শেষ করতে পারে না। বিবিজী এসে পড়েন:

'বলি হলো? যাও ওগুলো রেখে দিয়ে এসো···উধাও হয়ো না যেন···

তরকারি কুটতে হবে···আর ফের বলছি শুনে রাখো, না ডাকলে যদি অন্য ঘরে ঢুকবে···তা হলে ··' বকতে বকতে বিবিজী অন্তর্ধান হন।

মাথায় জল ঢালতে-ঢালতে ছোটবাবু বলে ওঠেন : 'এই রে, বন্যা শুরু হয়েছে আবার···বেটা, সাবধান, ডুবে মরবি···'

বহুকণ্টে মুন্নু হাসি থামিয়ে রাখে।

এমন সময় বাইরে থেকে কে ডেকে ওঠে : 'শীলা! ও শীলা!'

মুন্নু দেখে একটি ছোট্ট মেয়ে।

মুন্নুকে দেখে মেয়েটি যেন চমকে ওঠে। বিবিজী বলেন : 'কৌশল্যা, ওকে দেখে ভয় পেলি নাকি? ভয় নেই, ভয় নেই, ও কিছু করবে না, শীলার হয়ে গিয়েছে···ওকে সাবধানে নিয়ে যাবি কেমন!'

কৌশল্যা বলে : 'আমি শুনেছি, ও নাকি খুব ভালো বাঁদর নাচতে পারে!'

বিবিজী পরিচয়টা আরও গাঢ় করিয়ে দেবার জন্যে বলেন : 'অনেক কিছুই পারে···আজ সকালে কি করেছে জানিস না বুঝি?'

সবিস্তারে সকালের প্রাতঃকৃত্য-পর্বের বর্ণনা করেন।

লজ্জায়, দুঃখে, মুন্নুর মনে হয়, যেন সে মাটির সঙ্গে মিশে যায়। সব লোককে বিবিজী যদি এই রকম ক'রে সেই কথা শুনিয়ে বেড়ান, তাহলে সে মুখ দেখাবে কি ক'রে? সে বুঝতে পারে এতক্ষণ পরে, চাকর হওয়া মানে কি, অষ্টপ্রহর তাকে মুখবুজে এটা-ওটা-সেটা করতে হবে, নিত্য শুনতে হবে গালাগাল এবং যদিও এখনও তার ভাগ্যে ঘটে নি, তবুও সে বুঝতে পারে, প্রহারও খেতে হবে সময়-অ-সময়। সমস্ত মনটা তার ম্লান হয়ে পড়ে। হঠাৎ কেন জানি মনে হয়, সে একলা, বড় একলা।

এমন সময় দেখে, সাহেবী-পোশাকে সুসজ্জিত হয়ে ছোটবাবু হাজির।

হেসে মুন্নুকে জিজ্ঞেস করেন : 'বলি ওহে ল্যাজহীন বাঁদর, বিবিজী কোথায় রে?'

বাইরের দরজা থেকে ভেতরে আসতে আসতে বিবিজী স্বয়ং জবাব দেন : 'কেন, কি দরকার?'

'দরকার এমন বিশেষ-কিছু নয়—খোদ আংরেজ সরকারের ইমৃপিরীয়াল ব্যাংক হইতে আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা প্রতি মাসে যে একশত পঞ্চাশটি গোল গোল

রূপার চাকতি লইয়া আসেন, তাহা হইতে পাঁচটি চাকতি এখন আমার চাই।
…একটা রুগীকে দেখতে যাচ্ছি, সুতরাং পকেটে পাঁচটা টাকা থাকা দরকার। এক হাত দিয়ে রুগী দেখব আর এক হাত দিয়ে পকেটে টাকাগুলো বাজাব। লোকে জানবে ডাক্তারের পকেট টাকায় ভর্তি…দেখবে তখন লোকে আমার কাছেই রোগ দেখাতে ছুটবে…টাকায় টাকা আনে, বুঝলে?'

টাকাটা এনে দেবার জন্যে বিবিজী ঘরের দিকে পা বাড়ালেন, কিন্তু পেছন ফিরে বক্র দৃষ্টি দিয়ে মুন্নুকে দেখতে লাগলেন, সে-বক্র দৃষ্টির অর্থ, যেখানে আছ, সেখানে দাঁড়িয়ে থাক—কোন্ বাক্স থেকে বের করছি, তা যেন উঁকি মেরে দেখতে এসো না!

কিন্তু ঘরে ঢুকেই দেখেন মুন্নু উঁকি মারছে।

বাক্সটা আড়াল করে দাঁড়িয়ে টাকাটা নিয়ে বাইরে এসেই তিনি ঝঙ্কার দিয়ে উঠলেন: 'এই চোর উঁকি মারছিস যে? কাজ করগে যা।'

মুন্নুর নিদারুণ রাগ হয়, এ কি ব্যাপার! অকারণে তাকে চোর বলল কেন? আপনার মনে রাগে গরগর করতে করতে সে কুটনো কুটতে বসে।

কিছুক্ষণ পরেই বিবিজী হুকুম করেন: 'যা এইবারে ঘরগুলো ঝাঁট দে, বিছানাগুলো পরিষ্কার ক'রে রাখ।'

ঘরে ঢুকতে পারবে এই আনন্দে মুন্নু যেন ছুটে চলে আসে। রূপকথার রাজ্যের মতোন ঘরের সব জিনিসপত্র তার অদ্ভুত লাগে। ঝাঁট দিতে দিতে সে থেমে যায়, অবাক হয়ে ঘরের প্রত্যেকটা জিনিস যেন দৃষ্টি দিয়ে গিলে খেতে চায়। সব জিনিসপত্র তার অদ্ভুত লাগে। ঝাঁট দিতে-দিতে সে থেমে যায়, অবাক হয়ে ঘরের প্রত্যেকটা জিনিস যেন দৃষ্টি দিয়ে গিলে খেতে চায়। সব চেয়ে বেশী আকর্ষণ করে, বড় বড় ফোটোগ্রাফগুলো। এদিক্-ওদিক্ সে ফোটোগ্রাফগুলোর কাছে গিয়ে ভালো ক'রে দেখে। দেখে যেন তার আর তৃপ্তি হয় না। প্রত্যেকটি জিনিসের রঙ আর রেখা তার মনে বিচিত্র সব প্রশ্ন জাগিয়ে তোলে। ঐ বইগুলো ভেতর কি লেখা আছে? ঘড়ির কাঁটাটা ও-রকম ক'রে চলছে কি ক'রে? গ্রামোফোন মেসিনের ভেতরে গানগুলো এখন কি করছে? তারা কি ক'রে হঠাৎ শব্দ ক'রে ওঠে?

দুপুরবেলা তার চাচা এল, বাবুজী আর শীলার খাবার নিয়ে যাবার জন্যে।

হেসে জিজ্ঞেস করে : 'কেমন লাগছে এখানে ?'

বিবিজী সামনেই দাঁড়িয়ে।

মুখ তুলে মৃদুস্বরে সে উত্তর দেয় : 'ভালো লাগছে।'

নিজের কাজের ভার কমাবার জন্যে দয়ারাম বিবিজীর কাছে অনুরোধ জানায় : 'মুন্নুকে যদি এখন একটু ছেড়ে দেন··· তাহলে ওকে দেখিয়ে দিই··· শীলার খাবারটা রোজ দুপুরে ও নিয়ে যাবে' খন !'

বিবিজী সম্মত হন।

রাস্তায় এসে মুন্নু কেঁদে ফেলে। একে-একে তার লাঞ্ছনার কথা সব জানায়। এ জীবন অসহ্য। বিশেষ ক'রে বিবিজীর মুখে এক মুহূর্ত গালাগালের কামাই নেই।

উত্তরে দয়ারাম বলে : 'ওরে আমার যাদু রে! মনিব কি বলল-না-বলল, চাকর বুঝি তাই মনে রাখে ? তুই এখন ওদের চাকর···বড় হয়েছিস, কাজ করতে হবে না ? দেশে তো দিব্যি মজায় দিন কাটিয়েছিস, এখানে তো ভালো লাগবেই না! তোর মা তো তোর মাথা খেয়েছিলই, চাচীও আদর দিয়ে নাড়ু গোপালটি করেছে!'

মুন্নু বহুকষ্টে মুখবুজে সহ্য করে। ঘরের বাইরে মুক্ত প্রকৃতির সংস্পর্শে তার মধ্যে তখন জেগে উঠেছে গাঁয়ের সেই বুনো ছেলে, একবার ইচ্ছে হলো, কথার উত্তর না দিয়ে, সোজে এক ঘুষি দিয়ে সে জবাব দেয়।

বাড়ি ফিরে এলে, বিবিজী তার হাতে দুখানা চাপাটি আর-একটু গুড় দিলেন। হাতে ক'রেই খেতে হবে, পাত্রে খাবার মতোন লোক নাকি তারা নয়, বিবিজী জানিয়ে দেন। অপমানে তার মনে হতে লাগল গলা দিয়ে যেন নামছে না। কিন্তু সে বুঝেছে, এ নিয়ে মন খারাপ ক'রে কোন লাভ নেই।

দুপুরের কাজ সেরে বিকেলের দিকে সে ক্লান্ত হয়ে শুয়ে পড়ল।

হঠাৎ গোলমালে উঠে পড়ে দেখে, সকাল বেলার সেই কৌশল্যা মেয়েটি, আর দু'টি মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে শীলার সঙ্গে খেলতে এসেছে। বাইরের ঘরে তারা নাচতে আরম্ভ ক'রে দিয়েছে।

তাদের সঙ্গে খেলায় যোগদান করবার জন্য মুন্নু চঞ্চল হয়ে উঠল। কিন্তু না ডাকলে কি ক'রে খেলা যায় ? তাই তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার জন্যে সে

বাইরে ঘরের দরজায় বাঁদর-নাচ নাচতে শুরু ক'রে দিল। কিছুক্ষণ পরেই মুন্নু দেখে কখন সে অতর্কিতে তাদের সঙ্গে খেলায় মিশে গিয়েছে। হঠাৎ তার মধ্যে একজন মুন্নুকে হাত দিয়ে ঠেলে দেয়ঃ 'বারে, তুমি তো চাকর, তুমি কেন আমাদের সঙ্গে খেলবে?'

এমন সময় ছোটবাবু ফিরে এলেন, সঙ্গে আরও দু'তিনটি বাবু। ঘরে ঢুকেই ছোটবাবু চায়ের হুকুম করলেন। বিবিজীর কাছে সে-সংবাদ চলে গেল।

ছোটবাবুর আগমনে মুন্নুর ভেঙে-পড়া-মন আবার জেগে উঠল। ছোটবাবু বাইরের থেকে বড় বড় রসগোল্লা, গোলাপ জাম, আরও কত কি বিলিতি খাবার নিয়ে এসেছিলেন। মুন্নুর জিভে জল এসে গেলে। ছোটবাবু খাওয়া হয়ে গেলে, সেই প্লেটে যা পড়েছিল, মুন্নুকে খেতে দিলেন। মুন্নু নীরবে ছোটবাবুকে তার অন্তর সমর্পণ ক'রে দিল। ছোটবাবুর মুখ থেকে কথা বেরুতে-না-বেরুতে মুন্নু খরগোসের মতো ছুটে তা পালন করে। মনে পড়ে, গাঁয়ে তার দলের ছোটছেলেরা তার জন্যে এমনি ক'রেই হুকুম তামিল করত।

হায়, ছোটবাবু বেড়াতে বেরিয়ে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে শুরু হলো, বিবিজীর আদেশ ও আক্রমণ। যা-কিছু করতে যায়, তাতেই বিবিজী একটা-না-একটা খুঁত বার করেন। আর অমনি দমকা হাওয়ার মতো শুরু হয় গোলমাল। সব কাজ সেরে সন্ধ্যাবেলা এককোণে একটু বিশ্রামের জন্যে বসতেই ক্লান্তিতে দু'টি চোখ বুজে এল। অমনি মাথার ওপর, এবার আর দমকা হাওয়া নয়, রীতিমতো ঝড় ভেঙে পড়ল। কিন্তু নিদ্রাদেবী তখন তাকে যে অতল গভীর গহ্বরে টেনে নিয়ে গিয়েছিলেম, সেখানে বাইরের কোন ঝড়েরই আওয়াজ পেঁছিল না।

বাবু নাথুমলের বাড়িতে মুন্নুর জীবন কলে-বাঁধা চাকার মতো একঘেয়ে চলতে থাকে, একঘেয়ে ক্রীতদাসের জীবন···

তাকে স্বীকার ক'রে নিতে মুন্নুকে নিজের সঙ্গে রীতিমতো লড়াই করতে হয়। বুনো পাখী কি সহজে খাঁচায় থাকছে চায়? একদিন ভোরবেলায় কাঁথা মুড়ি দিয়ে শুয়ে থাকতে-থাকতে সে নিজেকে প্রশ্ন করেঃ 'আমি কে, বল তো মুন্নু?'

মনে মনে জবাব দেয়ঃ 'তুমি মুন্নু, বাবু নাথুমলের বাড়ির চাকর!' ফের প্রশ্ন করেঃ 'কেন আমি এখানে, এই বাড়িতে?'

উত্তর আসে : 'কেন জানো না ? তোমার চাচা তোমায় দু'বেলায় দু'মুঠোর জন্যে তোমাকে এখানে এনেছে।'

'কিন্তু এখানে না-এনে তো, অন্য জায়গায় নিয়ে যেতে পারত, অন্য কোন কাজে···তার মতো কোন আফিসে চাপরাশী ক'রে ?'

তার উত্তর সে খুঁজে পায় না।

সে যে কি, এবং তার যে কি উত্তর হতে পারে, তা সে সহজেই গ্রহণ করেছিল। নাথুমলের চাকর হওয়া ছাড়া, সে কি আর-কিছু হতে পারে না ? সে-প্রশ্ন করার মতো শক্তি তার মনে ছিল না। কেন সে চাকর ? আর কেনই বা বাবু নাথু মল তার মনিব ?—এ জিজ্ঞাসা আসে না তার মনে। সে যা হয়েছে, সে তাই, এটা সে স্বতঃসিদ্ধ সিদ্ধান্তের মতোনই মেনে নিয়েছিল। তার সঙ্গে বাবু নাথুমলের যা সম্পর্ক, বাবু নাথুমল, পায়ে যার চক্‌চকে কালো বুট, আর সে, বলতে গেলে, যার খালিপায়ে লাগে পথের ধুলো, তাদের দু'জনের সম্পর্ক সূর্যোদয় আর সূর্যাস্তের মতো স্থির সুনির্দিষ্ট অপরিবর্তনীয়···

ভাবতে-ভাবতে হঠাৎ মনে পড়ে ছোটবাবুর কথা···রোজ বিকেলে বাড়ি ফেরার সময় রসগোল্লা, আর গোলাপ জাম, আর কত কি বিলিতি খাবার নিয়ে আসেন···বিবিজীর আড়ালে একটু-আধটু ছোটবাবু তাকে নিয়মিত দেন···তবে রসগোল্লা আর গোলাপ জামের চেয়ে বিলিতি খাবারগুলো ঢের ভালো···কিন্তু বাবু বা সাহেব না হলে তো সে-সব খাওয়া যায় না! সে-সব খেতে হলে, ছোটবাবুর মতো সিল্কের পোশাক পরতে হবে, মাথায় শোলার টুবড়ি রাখতে হবে আর পায়ে দিতে হবে বুট! মনে পড়ে ছোটবাবুর বাক্স···সে দেখেছে তার ভেতরে সুন্দর সুন্দর কত যে পোশাক আছে, কত রঙ-বে-রঙের রুমাল···তুলোর মতো নরম সব গরম জামা···কি অদ্ভুত সব দেখতে! অদ্ভুত সুন্দর! যখন সে বড় হবে, সেই ধরনের পোশাক পরবার মতো তার বয়স হবে, ছোটবাবুর কাছে সে নিজে চেয়ে নেবে ঐ রকম একটা শার্ট আর কোট···ছোটবাবু নিশ্চয় না করবেন না···দয়ার শরীর তাঁর···এই তো সেদিন তাকে একটা ব্লেড দিয়ে দিয়েছেন একেবারে···

ছোটবাবু তার মনকে দখল ক'রে বসেছেন···শুধু কি দয়ার শরীর ? কিরকম বুদ্ধি! একটা রবারের নল দিয়ে তিনি সব বলে দিতে পারেন, রুগীর শরীরের

ভেতরের সব শুনতে পান।···সে নিজের চোখে দেখেছে ছোটবাবুর সেই সব কীর্তি···তা ছাড়া ছোটবাবুর একটা ভেলভেটের বাক্স আছে··· তার ভেতর কতরকম যন্ত্রপাতি···উঃ···মুন্নু যদি পারত সেই সব যন্ত্রপাতি নাড়াচাড়া করতে ···ছোটবাবুর মতোন ডাক্তার হতে! অন্তত যদি সে বড়বাবুর মতোনও হতো··· তাতেও তার আপত্তি নেই···রাস্তায় বেরুলে কত লোক বড়বাবুকে যেচে নমস্কার জানায়। কিন্তু···

সে যে-সমাজে জন্মগ্রহণ করেছে, তার ভিত্তি গড়ে উঠেছে জাতিভেদ আর শ্রেণীভেদের ওপর, সেখানে হাতে-গোনা যায় একদল মুষ্টিমেয় সৌভাগ্যবান লোক, যারা পৃথিবীর যা-কিছু রূপ-রস-গন্ধ ভোগ ক'রে চলেছে। তারাই হলো সে-জগতের আদর্শ। এবং সে-জগতের একমাত্র নীতি হলো, নিজের জন্যে সব কিছু···। সেই আবহাওয়ায় তারও মন তৈরি হয়েছে, তাই স্বভাবতঃই সে আকাঙ্ক্ষা করে, চায় সব-কিছু ভোগ করতে···

সে স্কুলে তার দেশের লোকদের যে সব গল্প শুনেছে বা পড়েছে, গাঁয়ের যে-সব কাহিনী শুনেছে, সব তাতেই আছে সেই এক কথা—শক্তি দাও, সম্পত্তি দাও, অর্থ দাও···সকলের ওপর আমি—সে-সব আমিই করব ভোগ···

এই ঐশ্বর্যের আকাঙ্ক্ষা, ভোগের দুর্নিবার স্পৃহা, প্রত্যেক শিশুর মনে··· শিশু কেন, বয়ঃপ্রাপ্তদের মনে, আলো-জল-হাওয়ার মতো মিশে যায়···চোখের সামনে একটা পুরু পর্দা ফেলে দেয়; যার ফলে তারা দেখতে পায় না, এই সর্বস্ব চাওয়ার আড়ালে আছে সর্বস্ব-ক্ষয়-করা এমন এক মারাত্মক জীবন-নীতি, যার জন্যে জীবন অধিকাংশের কাছে হয়ে থাকে—অর্থহীন, বর্ণহীন, মূল্যহীন···

শহরে এসে মুন্নুর চোখেও তাই ধাঁধা লেগে গিয়েছিল সেখানকার ঐশ্বর্যের আলোক ছটায়! মনে মনে সে ভাবত, শহরের লোকেরা তাদের গাঁয়ের লোকদের চেয়ে ঢের বড়। কিন্তু কেন বড়? কিসে তারা বড়? সে-প্রশ্নের কোন উত্তর সে দিতে পারত না। তারা সবাই ভালো-ভালো পোশাক পরে, ভালো বাড়িতে থাকে, ভালো-ভালো জিনিস ব্যবহার করে···তাই থেকেই সে অনুমান ক'রে নেয়, এরা নিশ্চয়ই আলাদা ধরনের আশ্চর্য সব মানুষ। তাদের এই চাকচিক্য, এই নিরুদ্বেগ মসৃণতা, এই আড়ম্বরের আনন্দোচ্ছ্বাস, এর মূলে টাকা-আনা-পাই যে কতখানি রয়েছে, তা সে বুঝতে পারে না।

সব ভেবে-চিন্তে একটা কথা সে স্থির সত্য বলে মেনে নেয়, সে যে চাকর, সে যে ছোট, সেইটেই একমাত্র সত্য। অতএব চাকর তাকে হয়ে থাকতেই হবে···মনে-মনে প্রতিজ্ঞা করে, যাতে সে ভালো চাকর হতে পারে···লোকে বলবে, হাঁ, চাকরের মতো চাকর বটে মুন্নু!

কিন্তু আমি ভালো হবো বললেই কি ভালো হওয়া যায়? আদর্শে পেঁছুতে গেলে যে পথ দিয়ে যেতে হয়, তার মোড়ে মোড়ে গর্ত···গোপন গহ্বর···

অচিরকালের মধ্যেই মুন্নু সেই রকম একটি গর্তে পড়ে গেল···এবং যে-টুকু বিবিজীর মন ভিজেছিল, দেখতে দেখতে তা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল।

ঘটনাটা শুরু হলো, যেদিন বিকেলবেলা মিঃ ডবলু. পি. ইংলণ্ড বাবু নাথুমলের বাড়িতে চায়ের নিমন্ত্রণে আহূত হয়ে আসেন।

মিঃ ইংলণ্ড শ্যামনগরের ইম্‌পীরিয়াল ব্যাঙ্কের প্রধান ক্যাশিয়ার, বাবু নাথুমল তাঁর অধীনে সাব-এ্যাকাউণ্টেট। দীর্ঘকায়, যখন চলেন মনে হয়, পা দু'খানা যেন কাঠের, সর্বদাই প'য়তাল্লিশ ডিগ্রি কোণ রেখে মেপে চলেন··· ছোট্ট মুখ···কিন্তু তাতে কোন ভাবের অভিব্যক্তি নেই···কুঞ্চনহীন সমতল··· চশমার মোটা ফ্রেমটা তাই মুখের মধ্যে সব চেয়ে বেশী দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কিন্তু একটি জিনিস···ঠোঁটের আগায় একটুখানি পাতলা হাসি, সব বৈচিত্র্য-হীনতার উপরেও চোখে পড়ে এবং এই পাতলা হাসিটুকুর ভরসাতেই বাবু নাথুমল তাঁকে তাঁর বাড়িতে চায়ের নিমন্ত্রণে ডাকতে সাহসী হয়েছিলেন।

প্রতিদিন সকালবেলা অফিস-ঘরে ঢোকবার আগে বাবু নাথুমল সাহেবকে অভিবাদন জানায় এবং তার প্রত্যুত্তরে প্রতিদিন ছোট্ট একটি গুডমর্নিং-এর সঙ্গে এই পাতলা হাসিটুকু তিনি উপহার-স্বরূপ পান। এবং এই হাসিটুকু যে মিঃ ইংলণ্ডের অন্তরের উদারতার বাহিঃপ্রকাশ সে-বিষয়ে তাঁর বিশেষ কোন সন্দেহই থাকে না। তবে এ-হাসির আর-কোন গভীর সার্থকতা আছে কি না, তা তিনি ঠিক বুঝতে পারেন না। বুঝতে পারেন না এটা সত্যি হাসি, না মুখোশের হাসি। অবশ্য বাবু নাথুমল এই হাসির তাৎপর্য এত ক'রে বুঝতে চেষ্টাই করতেন না, যদি না তিনি জানতেন যে, মিঃ ইংলণ্ডের সুপারিশের উপরেই তাঁর পদোন্নতি নির্ভর করছে। এ্যাকাউণ্টেণ্টের পদের জন্যে তিনি অনেকদিন থেকেই আশা ক'রে আছেন। কিন্তু আফজল উল হক্‌ আজ দীর্ঘ

কুড়ি বছর কাল ধরে ঐ পদে এমন অচলভাবে অধিষ্ঠান ক'রে আছেন যে, সেখান থেকে তাঁকে সরিয়ে নিজের আসন ক'রে নিতে হলে মিঃ ইংলণ্ডের ঐ পাতলা হাসিটুকুর সদ্ব্যবহার একান্ত প্রয়োজনীয়।

মিঃ ইংলণ্ড নতুন অফিসর। এখনও ক্লাবের সাহেবদের সঙ্গে খানাপিনার ফলে তিনি ভারতীয় মাত্রকেই ঘৃণা করতে শেখেন নি, এখনও তাঁর ঠোঁটের সেই পাতলা হাসি শুকিয়ে তাচ্ছিল্যে পরিণত হয় নি, কিংবা এই গ্রীষ্ম প্রধান দেশের জল হাওয়ার দোষে তা ঠোঁট থেকে দাঁতে এসে লাগে নি। তাই বাবু নাথুমল যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সুপারিশটা এই অবসরে করিয়ে নেবার জন্যে উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়েন। তাই পরস্পর পরস্পরকে ভালো ক'রে জানবার আগেই তিনি নিমন্ত্রণ ক'রে ফেললেন এবং মিঃ ইংলণ্ডও তা গ্রহণ করলেন।

তবে নিমন্ত্রণ করব বললেই নিমন্ত্রণ করার মতো সাহস বাবু নাথুমলের ছিল না। তার জন্যে দিনের-পর-দিন রীতিমতো কসরত করতে হয়েছিল তাঁকে। রোজ সকালবেলা ঠিক ক'রে আসেন, গুডমর্নিং বলার সঙ্গে-সঙ্গেই কথাটা পাড়বেন কিন্তু গুডমর্নিং-এর পর আর কিছুই গলা দিয়ে বেরুতে চায় না। কি নিয়ে কথাটা পাড়া যায়? হাতে একটা ফাইল বা একখানা চিঠি থাকলেও হতো, কিন্তু সবেমাত্র আপিসে ঢুকছেন, ফাইল কোথায় পাবেন? আর চিঠিপত্র তখন খোলাই হয় না। তার পরে যখন অবকাশ হয়, তখন হাতে এত ফাইল বা চিঠি থাকে যে অবান্তর কোন কথাই উত্থাপন করা চলে না। তাই বাবু নাথুমল শুধু দূর থেকেই দেখেন মিঃ ইংলণ্ডের ঠোঁটে সেই পাতলা হাসি···সে-হাসির অর্থ যে কি, তা কিছুতেই ভেবে ঠিক করতে পারেন না। তিনি বেশ ভালো করেই জানতেন যে এই সব সাহেবদের মতিগতির কোন স্থিরতা নেই···তাই তারা ইচ্ছা করেই মুখ বুজে থাকে···তারা শুধু মুখ হাঁ ক'রে কথা বলে না। নিজেরাও কথা বলবে না, তোমাকেও কথা বলতে দেবে না।

হঠাৎ একদিন বাবু নাথুমলের এক বিলাত-প্রত্যাগত ব্যারিস্টার বন্ধু তাঁকে তাঁর নিজের অভিজ্ঞতা থেকে একটি সদুপদেশ দিলেন :

'দেখো, সাহেবদের সঙ্গে যদি কোন কথা পাড়তে চাও তাহলে আবহাওয়ার ব্যাপার থেকে শুরু করতে পার।'

তবুও প্রতিদিন সকাল বেলা ছোট্ট একটুখানি গুডমর্নিং ছাড়া আর কোন কথা তাঁর মুখ থেকে বেরোয় না। বন্ধুর উপদেশও বুঝি ব্যর্থ হয়ে যায়।

মিঃ ইংলণ্ড প্রত্যুত্তরে মিষ্টি ক'রে বলেন: 'গুডমর্নিং...' আর ভাবে, লোকটা বয়সে তার চেয়ে অন্তত কুড়ি বছরের বড় এত মাথা হেঁট করার তার দরকার কি? আর তাছাড়া মিঃ ইংলণ্ড জানে লোকটা ধনী, এলাহাবাদ ব্যাংকে তার চল্লিশ হাজার টাকার শেয়ার আছে, সুতরাই নিশ্চয়ই গভর্নমেণ্টের খুব প্রিয়পাত্র। হয়তো ব্যাঙ্কের সাহেব ডিরেক্টরও তাকে খাতির করে, কিন্তু তবু কেন লোকটা এমনভাবে থাকে? তার মর্যাদা অনুযায়ী চলে না কেন? মনে পড়ে বড় সাহেব হর্নের কথা...হর্ন ঠিকই বলে, ভারতবর্ষের লোকেরা মাথা নিচু ক'রে, হাতজোড় ক'রে থাকতেই ভালোবাসে।

একদিন সাহসে ভর ক'রে নাথুমল সাহেবের পিছু-পিছু হাত কচলাতে কচলাতে চলল...সাহেব মনে-মনে অস্বিস্তি বোধ করে।

হঠাৎ পেছন থেকেই নাথুমল বলে ওঠেন: 'আজকের দিনটা চমৎকার স্যার! চমৎকার দিন!'

মিঃ ইংলণ্ড পা ঘষে ঘুরে দাঁড়াল, মনে হলো যেন তার পিঠের ওপর বাজ ভেঙে পড়ল। অব্যক্ত চাঞ্চল্যে তার মুখ পাংশু হয়ে এল, কিন্তু বহুকষ্টে নিজেকে সংবরণ ক'রে নিয়ে দেঁতো হাসি হেসে বলে:

'সত্যি,—চমৎকার দিন। চমৎকার!'

নাথুমল বুঝতে পারেন না, কন্ঠস্বরের মধ্যে ওতপ্রোত তীব্র ব্যঙ্গ। এতদিনের চেষ্টায় তিনি যে মৌনতা ভাঙতে পেরেছেন, এই খুশীতেই তিনি পারেন তো নিজের পিঠ চাপড়ান। চায়ের নিমন্ত্রণের কথা আর বলা হয় নি।

ঘরে বসে নাথুমল কাজ করেন, আর ভাবেন, কখন কথাটা বলা যায়! মিঃ ইংলণ্ড কতকটা আন্দাজ ক'রে, সেদিনই ঠিক করল, ব্যাপারটা কি, জানতে হবে। নিজেই নাথুমলের টেবিলের সামনে এসে হেসে বলে: 'কি নাথুমল? কেমন আছ?'

হঠাৎ লেজার থেকে মুখ তুলে, কানের পাশে কলমটা গুঁজে নাথুমল বলে ওঠেন: 'চমৎকার দিন স্যার!'

হেসে ইংলণ্ড উত্তর দেয়: 'কিন্তু আমার পক্ষে একটু কম চমৎকার হলে ভালো হতো!'

কি উত্তর দেবেন ঠিক করতে না পেরে নাথুমল বলেন : 'হাঁ স্যার! ঠিক তাই স্যা—!'

তারপর আবার চুপচাপ। মিঃ ইংলণ্ড নাথুমলের দিকে চেয়ে, নাথুমল ইংলণ্ডের মুখের দিকে চেয়ে।

ইংলণ্ডই আগে কথা বলে : 'আমি লানচ খেতে যাচ্ছি এখন···উঃ, এ গরমে কি কিছু খাওয়া যায় ?'

নাথুমল, এই অবকাশ! নাথুমলের মুখে যেন কথা এ-ওর ঘাড়ে পড়ে যায় :

'সত্যি স্যার···আপনার উচিত স্যার, দিশি খানা খাওয়া···খেতে চমৎকার স্যার!'

ইংলণ্ড উত্তরে জানায় : 'ক্লাবের খানসামা মাঝে-মাঝে তোমাদের মতো ঝোল তৈরি করে বটে কিন্তু বড় ঝাল···'

'আমার স্ত্রী স্যার, চমৎকার ঝোল রাঁধে···কত রকমের রান্না স্যার···একদিন আপনাকে আসতেই হবে···'

'না, ঝোল আমার ভালো লাগে না···তবুও তোমার আহ্বানের জন্য ধন্যবাদ!'

হঠাৎ ইংলণ্ডের মনে পড়ে যায়, যেন বড্ড বেশী ঘনিষ্ঠতা ক'রে ফেলা হচ্ছে। ক্লাবে অন্যান্য ইউরোপীয়রা বার বার ক'রে বারণ ক'রে দিয়েছে, নেটিভদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করা উচিত নয়। যাবার জন্যে ইংলণ্ড ঘুরে দাঁড়ায়।

নাথুমল কম্পিত-হৃদয়ে বলে ফেলে : 'তা হোক্ স্যার!···একদিন আমাদের বাড়ি আপনাকে আসতেই হবে স্যার! আপনি যদি পায়ের ধুলো দেন, আমার স্ত্রী ধন্য হয়ে যাবে স্যার! অন্তত চা খাবার জন্যে আসতে হবে স্যার! আমার ভাই স্যার···'

ইংলণ্ড ঘাড় নেড়ে জানায় : 'না···'

'সে হবে না স্যার···আমি শুনব না···আজই যেতে হবে স্যার!'

'না···আজ নয়···অন্য আর-একদিন দেখা যাবে···'

তারপর থেকে নাথুমল, সকালে-দুপুরে,-বিকেলে—যখনই ইংলণ্ডের সঙ্গে দেখা হয়, তখনই সেই চায়ের কথা মনে পড়ে : 'একবার পায়ের ধুলো স্যার···'

অবশেষে একদিন ইংলণ্ডকে রাজী হতেই হয়। এক সপ্তাহ পরে···

এক সপ্তাহ ধরে নাথুমলের বাড়িতে সেই চা পার্টির আয়োজন চলতে লাগল। সবাই উদ্‌গ্রীব চঞ্চল। সে-উৎসাহের ছোঁয়া মুন্নুকেও লাগে। মেঝের কার্পেট তুলে, ধুলো ঝেড়ে, তাকে উল্‌টিয়ে পাতা হলো। ঘরের এক কোণে শিশি, বোতল, বই, ছবি, ঘড়া, ঘটি—সব একত্র ক'রে তার উপরে আচ্ছাদনস্বরূপ একটা সাদা চাদর দিয়ে ঢেকে দেওয়া হলো···দেশী ঘরের এলোমেলো ভাবকে যতখানি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ক'রে তোলা যায়।

বাবু নাথুমলের বাড়িতে যে একজন সাহেব আসছেন, সে-সংবাদ পাড়ার আশেপাশের বাড়িতে ইতিমধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে এবং পড়ো বাড়ির ভাঙা জানালার মুক্ত পথ দিয়ে সাহেবের দৃষ্টি যাতে জেনানা-মহলের আব্রু নষ্ট না-করে তার জন্যে প্রত্যেকে ছেঁড়া কাপড়, ময়লা চট ইত্যাদি হাতের কাছে যে-যা-পেল তাই দিয়ে ছিদ্র পথগুলো আগে থাকতেই বন্ধ ক'রে দিতে লাগল।

একদিন মিঃ ইংলণ্ড, একপাশে বাবু নাথুমল, আর-একপাশে তাঁর ডাক্তার ভ্রাতা প্রেমচাঁদ, পেছনে লাল-তকমা-আঁটা দয়ারাম চাপরাশী···রাজসমারোহে পাড়ায় এসে প্রবেশ করলেন। মিঃ ইংলণ্ড কিছুক্ষণ পরেই বুঝতে পারলেন, বৈকালীন পার্টির মর্যাদা অনুযায়ী গরম নেভী ব্লু-সুট প'রে এসে কি বোকামিই না তিনি করেছেন! গরমে তাঁর প্রাণ অতিষ্ঠ হয়ে উঠল।

পথে আসতে বাবু নাথুমলের মুখে অনর্গল চাটুবাদ আর শূন্য স্তোকবাক্য শুনতে শুনতে মিঃ ইংলণ্ড আরও যেন অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে। মনে মনে ভাবতে আরম্ভ ক'রে, বাবু নাথুমলের বাড়িটা কি রকমই বা হবে? হোম ছেড়ে আসবার সময়, তার বাবা শহর থেকে দূরে ব্রিক্‌স্‌টন অঞ্চলে হেমিল এস্টেটে যে ছোট্ট বাড়িটা কিনেছেন, হয়তো সেই রকম হবে···কিংবা হোলিউডের "ভারতীয় সন্ন্যাসীর অভিশাপ" ছায়াচিত্রে, সেই গল্পের হিন্দু-নায়ক বাবু আবদুল করিমের বাড়ির যে-ছবি দেখেছিল···বাড়ির ভেতর হল-ঘরের মধ্যে ফোয়ারা থেকে জল উপচে পড়ছে; তার চারিদিকে নানান রঙীন পোশাকে আর ঝলমল সব গহনায় সুসজ্জিত হয়ে বাবুর ডজন খানেক স্ত্রী নেচে-নেচে বেড়াচ্ছেন সেই রকম কোন দৃশ্য হবে নাকি?

পাড়ার মধ্যে খানিকটা অগ্রসর হয়ে মিঃ ইংলণ্ডের চোখে পড়ে, ভাঙাচোরা

ইঁটের সব গহ্বর ঘেষাঘেঁষি কোনরকমে দাঁড়িয়ে রয়েছে, এইগুলিই কি তবে···? ইংলণ্ডের মনের ভেতরটা কেমন যেন ক'রে উঠতে থাকে···

হঠাৎ চারদিক্‌ থেকে চাপা রব উঠল : 'সাহেব ! সাহেব !' সঙ্গে সঙ্গে ময়লা চটের আশেপাশে কৌতূহলী সব মুখ দেখা দিয়ে সরে যেতে লাগল ।

বাবু নাত্থুমল সাহেবের অবগতির জন্যে নিবেদন করেন : 'মুসলমানেরা স্যার ভয়ানক পর্দা মানে কিনা ! তাই, ওই যে সব দেখছেন, ওরা হলো বাবু আফজল উল হকের বাড়ির মেয়েরা, আপনাকে দেখে লুকিয়ে পড়ছে স্যার !'

মনে মনে নাত্থুমল খুব খুশী হয় । প্রতিদ্বন্দ্বীর বিরুদ্ধে একটা খোঁচা যে বসাতে পেরেছে, সেটা সৌভাগ্যের লক্ষণ বলতে হবে বই কি !

মিঃ ইংলণ্ড কোন কথা না বলে অতিকষ্টে একটু হেসে পাশ ফিরে তাকান ।

হঠাৎ প্রেমচাঁদ চিৎকার ক'রে ওঠে : 'আপনার মাথা স্যার ! আপনার মাথা···একটু সাবধান···'

বাবু নাত্থুমলের বাড়ির দরজা পেরিয়ে মিঃ ইংলণ্ড মাথা তুলে ভেতরের ঘরে যেমন ঢুকতে যাচ্ছিলেন, অমনি প্রেমচাঁদ সাহেবের উন্নত-শিরের দুর্দশা আশংকা ক'রে চিৎকার ক'রে ওঠে । ছোট দরজা, মাথা হেঁট না-ক'রে ঢুকলে, মাথায় লাগবে । সাহেবের গোলাপী মুখ টকটকে লাল হয়ে উঠল ।

ঘরের ভেতরে ঢুকে সাহেব দেখে, ঘরের ছাদটা যেন মাটির দিকে ঝুঁকে আসছে সেই ছোট্ট দশ-ফিট দীর্ঘ আর ছ' ফিট প্রস্থের গহ্বরের মধ্যে এতগুলি লোক কোথায় বসবে বা নড়বে, তা' ভেবে ঠিক করতে পারে না । দয়ারাম তাড়াতাড়ি একখানি চেয়ার টেনে সাহেবের সামনে ধরে ।

ঘরের ভেতর দাঁড়িয়ে আশেপাশে জিনিসগুলোর দিকে চেয়ে, ইংলণ্ডের মনে হচ্ছিল, সব কেমন ছোট-ছোট, খর্বাকৃতি···তার মধ্যে তাকে দেখাচ্ছিল, ভিড়ের মধ্যে যেমন দেখায় নেলসন্‌ স্তম্ভকে ।

অবশ্য চোখ চেয়েও সাহেব যে বিশেষ-কিছু দেখতে পাচ্ছিল, এমন নয়, চেয়ারে বসতেই মনে হলো যেন কাঁটা ফুটছে । সামনে দেখে, একটা কুলুঙ্গীর ভেতরে হস্তী-দেবতা গণেশের মাটির মূর্তি···গলায় ফুলের মালা । ছেলেবেলায় তার মার সঙ্গে গির্জায় যাবার পথে, তার মা যে-সব পৌত্তলিক দেব-দেবীর

মূর্তিকে ঘৃণা করতে তাকে শিখিয়েছিল, এতদিন পরে সেই ধরনের কদাকার মূর্তি এই সে প্রথম চাক্ষুষ দেখল।

বাবু নাথুমল পায়রার মতো গলা ফুলিয়ে ইংরেজীতে সাহেবকে জানান: 'বিদ্যা, বুদ্ধি আর ঐশ্বর্যের দেবতা স্যার!'

নাথুমল জানেন, পর্দার আড়ালে তাঁর স্ত্রী দাঁড়িয়ে শুনছেন, শুনছেন তাঁর স্বামী ইংরেজীতে ইংরেজের সঙ্গে সমানে কথা বলছেন···গর্বে বাবু নাথুমলের বুক ফুলে ওঠে।

মিঃ ইংলণ্ড কোনরকমে ঠোঁট ফাঁক ক'রে বলেন: 'বাঃ! চমৎকার!'

প্রেমচাঁদ সহজভাবেই সাহেবের সঙ্গে কথাবার্তা সূচনা করে। কারণ, সে জানে, সে স্বাধীনভাবে জীবিকা-অর্জন করে, সাহেবের অফিসের কেরানী সে নয়।

'ইচ্ছে আছে, মিঃ ইংলণ্ড, ভালো ক'রে ডাক্তারী শেখবার জন্যে আপনাদের দেশে যাব।'

'হোমে'র কথা শুনে মিঃ ইংলণ্ড একটু সপ্রতিভ হয়ে ওঠেন, বলেন: 'বটে! বেশ!'

প্রেমচাঁদ বলে: 'নিশ্চয়ই সেখানে আপনি যে বাড়িতে থাকেন, তা নিশ্চয়ই খুবই বড়···হ্যাঁ ভাবছি, আপনার কাছ থেকে জেনে নেবো কোন্ কোর্স কিভাবে নিলে সুবিধে হয়···এ সম্বন্ধে নিশ্চয়ই আপনি আমাকে সাহায্য করতে পারেন?'

উত্তরে মিঃ ইংলণ্ড ছোট্ট ক'রে শুধু বলে: 'নিশ্চয়ই!' সঙ্গে-সঙ্গে এক গোপন লজ্জায় বিব্রত হয়ে পড়ে। যদিও এখানকার নেটিভদের কাছে সর্বদাই মাথা উঁচু ক'রে থাকতে হয় তবুও সে নিজের মনে জানে 'হোমে' বাড়ি বলতে তার নিজস্ব কিছুই নেই···যে ছোট্ট বাড়িটা তার বাবা কিস্তিবন্দীতে কিনেছেন, তার সব কিস্তি এখনো শোধ দেওয়া হয় নি···আর তা ছাড়া পড়ার কোর্স সম্বন্ধে সে কি উপদেশই বা দিতে পারে? সে নিজে অন্তত জানে, কোন বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ছায়া সে কোনদিন মাড়ায় নি···তার পড়াশোনার দৌড় হচ্ছে, পিটম্যানের সর্টহ্যাণ্ড আর টাইপরাইটিং স্কুলে মাত্র একটা বছর···তার পরই সে মিডল্যাণ্ড ব্যাঙ্কে চাকরিতে ঢোকে। মাঝে-মাঝে তার মনে হতো, এ সম্পর্কে যা সত্য, তাই সে জানিয়ে দেবে, সে যা নয়, তাই সেজে সম্মান নিতে

তার স্বাভাবিক সততায় বাধত। কিন্তু তার ক্লাবের সহযাত্রীরা তাকে বার-বার সাবধান ক'রে দিয়েছে, এখানে মাথা তুলে সর্বদাই থাকতে হবে, তার জন্যে যদি দরকার হয়, নিজেকে স্বয়ং রাজা জর্জের পুত্র বলে পরিচয় দিতে, তাতেও সে যেন কোনদিন কুণ্ঠিত না হয়। তার ফলে, বর্তমান ক্ষেত্রের বাইরের যে কষ্ট তাকে সহ্য করতেই হচ্ছিল, তার সঙ্গে জ্ঞানপাপীর আভ্যন্তরিক গোপন অস্বস্তি মিশে, তাকে যেন আরও বিব্রত ক'রে তুলল।

দেয়াল থেকে মস্ত বড় একটা ছবি নামিয়ে সাহেবের সামনে তুলে ধরে বাবু নাথুমল সগর্বে বলেন : 'আমাদের ফ্যামিলি ফোটো স্যার ? আমার বিয়ের সময় তোলা হয়েছিল।'

সাহেব বিস্ফারিত চোখে দেখেন।

মুন্নু এতক্ষণ দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ছিল। তার গেঁয়ো বুদ্ধিতে ছোট বড় স্তর-ভেদের কোন সূক্ষ্ম ধারণা ছিল না। তাই স্বাভাবিক কৌতূহলবশতঃ ছবিটি দেখবার জন্যে সাহেবের গা ঘেঁষে সেও এগিয়ে আসে।

বাবু নাথুমল চাপা গলায় চিৎকার করে ওঠেন : 'দূরে হ এখান থেকে পাজী !' সঙ্গে সঙ্গে কনুই-এর ধাক্কা দিয়ে তাকে সরিয়ে দেন।

মিঃ ইংলণ্ডের মন বহুচেষ্টার ফলে থিতিয়ে আসছিল। হঠাৎ এই ব্যাপারে আবার তা চঞ্চল হয়ে উঠল। মুন্নু কে তা সে জানে না···মনে মনে ভাবে, হয়ত বা বাবুর ছেলেই হবে ! যেই হোক তার সামনে এমনিভাবে একটা ছোট ছেলেকে তাড়িয়ে দেওয়া, সাহেবের ভদ্রতায় রীতিমতো আঘাত করল। কিন্তু আর-একদিক্ থেকে মনে মনে সন্তুষ্টই হলো, ছেলেটার কাপড়-চোপড় যে রকম নোংরা আর ময়লা, কে জানে কত রোগের বীজাণু তাতে মিশে আছে ! মনে পড়ল বড় সাহেব হর্নের কথা, এই সব নেটিভ ছেলেদের গা নাকি মারাত্মক সব বীজাণুতে ভর্তি থাকে। হর্নের কথা যে মিথ্যে নয়, তার প্রমাণ সে রাস্তার ধারে কুষ্ঠরুগী ভিখারীদের দেখেই বুঝেছে।

পাছে তাঁর ব্যবহারে সাহেব কিছু ভুল বোঝেন, সেইজন্যে বাবু নাথুমল জনান্তিকে তাকে জানিয়ে দেন : ওটা চাকর—'

অর্থাৎ তাকে তাড়িয়ে দিয়ে তিনি কোন অন্যায় করেন নি।

সাহেব ঠোঁট বেঁকিয়ে চোখ ঘুরিয়ে বাবুকে জানিয়ে দেয়, তা সে বুঝতে পেরেছে।

'ইনি হলেন আমার স্ত্রী, স্যার !'

ফোটোর মধ্যস্থলে কাপড় আর গহনায় ঢাকা এক মনুষ্য-মূর্তি ! পা ঝুলিয়ে চেয়ারে বসে আছে, মুখটি সম্পূর্ণভাবে অবগুণ্ঠনে ঢাকা।

সাহেবের চোখের দোষ ছিল, কাছের জিনিস ভালো ক'রে দেখতে পেতো না ! তাই চেষ্টা ক'রে চোখ বার ক'রে সে দেখে, মূর্তিটির মুখের কোন রেখা দেখা যায় কি না। কিন্তু কিছুই যখন দেখতে পেল না, তখন ঈষৎ হেসে তারিফ ক'রে বলে উঠল : 'বাঃ চমৎকার দেখতে !'

হঠাৎ নিজের হাতের আঙুলের দিকে দৃষ্টি পড়তেই, সাহেব দেখে ছবিটি ধরবার সময় ধুলোতে হাত ভরে গিয়েছে···এমন কি প্যাণ্টেও ধুলো লেগে গিয়েছে···সাহেবের ভ্রূ আপনা থেকে কুঁচকে আসে।

হাত কচলাতে কচলাতে বাবু বলে ওঠেন : 'আমার স্ত্রী স্যার, উনি পর্দা মানেন না···তবে কি জানেন স্যার, বড় লাজুক ! আর আমাদের দেশে মেয়েদের পর-পুরুষদের সামনে বেরুনোর রেওয়াজ নেই কি না !'

সেই সঙ্গেই ছবিটির দিকে আঙুল দেখিয়ে বলেন :

'আর, এই যে দেখছেন এই হলুম আমি···বরের পোশাকে স্যার !'

এমন সময় পাশের ঘর থেকে গ্রামোফোনে রেকর্ড বেজে উঠল···সাহেবের মনে হলো কে যেন কাঁদছে, আঁই···আঁ···আঁয়···এঁ···এঁ···

সগর্বে সাখুমল বলে ওঠে : 'এই হলো স্যার ইণ্ডিয়ান মিউজিক···গজল··· এলাহাবাদের জানকী বাঈ গাইছে···এটি হলো আমার মেয়ে···শীলা···আয়··· সাহেবকে নমস্কার কর···'

শীলা তখন দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল···এবং সেইখানেই দাঁড়িয়ে রইল হতভম্ব হয়ে···পিতার আদেশ প্রতিপালন করার কোন লক্ষণই দেখা গেল না।

মিঃ ইংলণ্ডের যেন সব গুলিয়ে উঠেছিল। কোন কিছুরই কোন হদিস সে খুঁজে পাচ্ছিল না। ঘামে ভেতর থেকে পোশাক ভিজে উঠেছে ! পাশের ঘর থেকে সেই তীব্র আঁও···আঁয়···এ···যেন সূঁচের মতো বিঁধছে কানে···সে-কান বড়জোর শুনতে অভ্যস্ত, আঁকাবাঁকা চার্লস্টন কিংবা রুম্বার সঙ্গে তরুণ ইংলণ্ডের প্রেম-সঙ্গীত, "হায় সখি, প্রেম আমার, যেন একটা···সিগারেট !"

মিঃ ইংলণ্ড গুম হয়ে বসে ভাবে, কি ভুলই না করেছি নিমন্ত্রণ নিয়ে···এখন পর্ব শেষ হলেই বাঁচি !

একটা টেবিলে নানা জাতীয় দেশী খাদ্যসামগ্রী একে একে এনে রাখা হলো। তা থেকে দুটো ডিস তুলে বাবু নাথুমল স্বয়ং সাহেবের সামনে ধরলেন : 'স্যার এটা হলো আমাদের সেরা মিষ্টি, নাম গুলাব জামান···আর এটার নাম হলো রসগোল্লা, তাজা ছানা দিয়ে তৈরি স্যার !···শুঁকে দেখুন, গোলাপের আতর দেওয়া। আপনার জন্যে আলাদা ক'রে অর্ডার দিয়ে তৈরি করা স্যার !'

মিঃ ইংলণ্ড তখন গোলাব জামান আর রসগোল্লার গন্ধে এবং তাদের সেই রস-চটচটে মূর্তিতে গা বমি-বমি ক'রে উঠছিল। আপনা থেকে তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ল : 'না, না, ও সব খাবো না !'

বাবু নাথুমল নাছোড়বান্দা : 'সে কি হয় স্যার ! একটু অন্তত মুখে দিতেই হবে।'

যদি ডিসের সঙ্গে একটা কাঁটা চামচ দেওয়া হতো, তাহলে হয়ত মিঃ ইংলণ্ড কোনরকমে একটা তুলে নিতে পারত, কিন্তু ব্যাপার দেখে সে বুঝল যে, সেই চটচটে বস্তুটি আঙুল দিয়ে তুলতে হবে। একজন ইংরেজের পক্ষে তা একরকম অসম্ভব ব্যাপার···ভুলেও সে আঙুল দিয়ে একটা মুরগীর ছানার ঠ্যাংও তুলে মুখে দেয় না।

অগত্যা নাথুমল বলেন : 'তাহলে এই পাকাড়াগুলো অন্তত স্যার খেতে হবে। আমার স্ত্রী নিজে তৈরি করেছেন। দয়ারাম, নিয়ে আয়—'

দয়ারাম যখন সাহেবের সামনে সেই তৈলাসিক্ত অপূর্ব পদার্থটি ধরে দিল, তার কৃষ্ণবর্ণ মূর্তি দেখে এবং তৈলাক্ত সুগন্ধ পেয়ে সাহেবের দেহের অভ্যন্তরে লিভার নামক পদার্থটি যেন উলটে গেল। বিষের পাত্রের দিকে মানুষ যেমন সভয়ে চেয়ে থাকে, তেমনি আর্তদৃষ্টিতে সেই দিকে তাকিয়ে মিঃ ইংলণ্ড বলে উঠলেন : 'অসংখ্য ধন্যবাদ ! আজ বড় অবেলায় লাঞ্চ খেয়েছি।'

'বেশ, আমাদের দিশি খাবার যদি না খান স্টিফিলস্ হোটেল থেকে আপনার জন্যে অর্ডার দিয়ে বিলিতি প্যাসট্রি নিয়ে এসেছি, তাই খান।'

সাহেব পদার্থটির দিকে সজোরে চেয়ে বুঝল, তার সর্বাঙ্গ এমনভাবে চিনি দিয়ে আবৃত যে, তার ভেতরে যে মূল পদার্থটি কি আছে, তা ঘোরতর গবেষণার বিষয় !

'ধন্যবাদ! গরমের দিনে আমার এত শিগগির খিদে হয় না।

নাথুমল হতাশ হয়ে পড়েন। সাহেব যদি নাই খায়…তাহলে কিসের ভরসায় সে সুপারিশ চাইবে?

সাহেবের একেবারে নাকের কাছে ডিসটা ধরে বাবু নাথুমল কাতরকণ্ঠে আবেদন করেন: 'দয়াক'রে একটুখানি অন্তত মুখে দিন স্যার।'

প্রায় পরাজিত হয়ে উঠে মিঃ ইংলণ্ড বলেন: 'ও সব থাক, তাহলে আমাকে এক কাপ চা দাও…আমাকে এক্ষুণি যেতে হবে। তুমি তো জানো আমার কত কাজ পড়ে রয়েছে!'

বাবু নাথুমলের অধরোষ্ঠ আবেগে কেঁপে উঠল…দাঁত দিয়ে চেপে তিনি কোনরকমে বলেন: 'স্যার, বড় আশা করেছিলাম, দরিদ্র মতে আপনার সেবার জন্যে যে ব্যবস্থা করেছিলাম তা গ্রহণ করে আমাকে ধন্য করবেন। তার বদলে শুধু এক কাপ চা…শুধু চা…ওঃ…চা নিয়ে আয় মুন্নু।'

মুন্নু এতক্ষণ ধরে এই আদেশের জন্যেই অপেক্ষা করছিল। তার সর্বদেহ উৎসাহে কাঁপছিল। প্রভুর আদেশ পাওয়া মাত্রই সে চায়ের ট্রে তুলে ধাববান হলো।

দয়ারাম তখন খাবারের ট্রে নিয়ে ঢুকছিল…আর একটু হলেই মুন্নু তার ঘাড়ে গিয়ে পড়ত…আর তখন?

বিবিজীর নজরে যে তা পড়ে নি তা নয়, তবে আজ তাঁকে চুপ ক'রে থাকতেই হবে, নইলে সাহেব কি মনে করবে! তাই উচ্চারিত ভৎর্সনার বদলে দুই ক্রুদ্ধ চক্ষুর নীরব তিরস্কার একবার মুন্নুর সারা দেহে ঢেউ খেলিয়ে বয়ে গেল। কিন্তু মুন্নুর মন আজ আনন্দে ভরপুর, সাহেবের সামনে দাঁড়িয়ে সে কথা বলতে পেরেছে…বিবিজীর ভ্রূকুটি আজ আর তাকে বিকল করতে পারবে না।

উৎসাহে পায়ের আঙুল মুচকে তার হাতের ট্রে হঠাৎ সশব্দে নিচে পড়ে গেল…চীনে মাটির বাসন ভেঙে টুকরো-টুকরো হয়ে গেল।

বাবু নাথুমলের বুকের ভেতর হৃদ্-যন্ত্র যেন হঠাৎ থেমে গেলে। বহুকষ্টে অর্জিত অর্থের নগদ পাঁচ টাকা তিনি এই চা-পার্টির জন্য খরচ করেছেন তার শেষে পরিণতি কিনা মাটিতে পড়ে নষ্ট হয়ে গেল।

ডাক্তার প্রেমচাঁদ তৎক্ষণাৎ ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে বহুকষ্টে বিবিজীর বাক্-

সংযোম উৎপাদন ক'রে তাড়াতাড়ি আর-এক কাপ চা তৈরি ক'রে নিয়ে হাসতে হাসতে সাহেবের সামনে ধরল।

'আমাদের এই যে চাকরটি দেখছেন, মিঃ ইংলণ্ড, ও জানে একটা জাপানী চা-সেটের দাম মাত্র এক টাকা বারো আনা। তাই ও বেপরোয়া হয়ে কাপ ডিস ভাঙে।'

মিঃ ইংলণ্ড তখন গরমে ঘেমে নেয়ে উঠছিল। তার উপর এই আকস্মিক দুর্ঘটনায় রাগে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ল। কোনরকমে চায়ের কাপটি তুলে চুমুক দিতেই গরমে জিভ পুড়ে গেল।

চায়ের কাপটি নামিয়ে রেখে সাহেব উঠে পড়ল: 'এইবার আমি যাবো!'

বাবু নাথুমল হাত জোড় ক'রে বলেন: 'বড় নিরাশ হলুম স্যার। তবে আমার স্ত্রী আর আমার অনুরোধ, আপনি আবার আসবেন একদিন শিগগির।'

মিঃ ইংলণ্ড তখন চেয়ার ছেড়ে উঠে বাইরের দরজা দিয়ে মাথা হেঁট ক'রে বেরিয়ে পড়েছেন।

চা-পার্টি, ভাঙা কাপের মতোন, ভেঙে গুঁড়িয়ে গেল।

সাহেবকে বিদায় ক'রে এসেই ডাক্তার মিষ্টান্নগুলির দিকে নজর দিল। বিবিজী তখন বিপুল বিক্রমে মুন্নুকে নিয়ে পড়েছেন:

'বলি ও কানা···চোখ-খেগো···বলি এতে লোক মরে, তোর মরণ হয় না? কি করেছিস তার খেয়াল আছে? নরকে পচে মরবি জানিস! বলি তোর এক-মাসের মাইনে দিলেও ঐ সব কাপ ডিসের দাম হয় না, জানিস?'

সেদিকে কর্ণপাত না ক'রে ডাক্তার বলে উঠল: 'সাহেবটা চাষা···খেতে জানে না···এমন সুন্দর জিনিস, একটা মুখে দিলে না!'

বিবিজী তার উত্তর দিলেন: 'সে-দোষ সাহেবের নয়···ঐ হারামজাদার দোষেই তো সব মাটি হয়ে গেল।'

সে কি কথা ভাবী! ঐ বাঁদর-মুখো সাহেবটা খেতে জানে না, মুন্নুর কি দোষ বলো? আর তোমার ঘরে এই যে পাহাড়-পর্বত জমা হয়ে রয়েছে, যা দেখেই সাহেবের মেজাজ বিগড়ে গিয়েছিল, তাও কি মুন্নুর অপরাধ?

বিবিজী গর্জন করে ওঠেন: 'তুমি অমন ক'রে ঐ মড়াটাকে আস্কারা দিও

না তো ঠাকুর পো! ঐ চাষাটা আসবার আগে আমাদের ঘর-দোর তো ঠিক সাহেবদের মতোই ছিল ঐ তো এসে সব নোংরা করল···অমন কাপ-ডিসগুলো সব ভেঙে ফেলল গো!'

রাগে কাঁপতে কাঁপতে বিবিজী সজোরে মুন্নুর গালে একটা চড় বসিয়ে দেন। মুন্নু যেমন মূক হয়ে দাঁড়িয়েছিল, তেমনি দাঁড়িয়ে থাকে। বিবিজীর হাত থেকে তাকে রক্ষা করা প্রয়োজন মনে ক'রে প্রেমচাঁদ মুন্নুর কাছে এগিয়ে যায়।

আর কত বলবে ভাবী? ওর কোন দোষ নেই। ওরে, তুই একবার যা তো···এক গেলাস জল নিয়ে আয়।'

কাজের অছিলায় মুন্নুকে সেখান থেকে সরিয়ে দেয়।

সেই দিনের পর থেকে মুন্নুর আর কাজে মন বসে না···কেমন যেন আচ্ছন্নের মতো সে ঘোরা-ফেরা করে···সর্বদাই ভাবে কি করে এ-কাজ থেকে মুক্তি পাবে সে। মন তার পড়ে থাকে, কখন ছুটি পাবে।

বিবিজী জানতেন ছুটি পেলেই মুন্নু তার চাচার ওখানে যায়। তাই যাতে সে ছুটি না-পায়, তার জন্যই ইদানীং তিনি সর্বদাই একটা-না-একটা কাজে তাকে আটকে রাখতে চেষ্টা করতেন। তাঁর ভয়, হয়ত দয়ারামের কাছে গিয়ে যা-তা-করে সব লাগাবে।

কিন্তু এক-আধ-বেলা ছুটি পেলেই যে মুন্নু দয়ারামের ওখানে চলে যেত, তার পিছনে শুধু যে এই নিত্য গালাগাল আর নিষ্ঠুর নিপীড়ন থেকে ক্ষণিক অব্যাহতি পাবার আশাই একমাত্র প্রেরণা স্বরূপ থাকত তা' নয়, বিবিজীর স্নেহের শাক-চচ্চড়ি খেতে-খেতে তার অরুচি ধরে গিয়েছিল, তাই ঠিক সময়-মতো গিয়ে পড়তে পারলে চাচার প্রসাদ স্বরূপ খানিকটা ডাল-ভাত জুটত···খেলে দেহটা ঠাণ্ডা হতো।

সেদিন সকাল থেকেই তার মনটা পড়েছিল চাচার সেই ডাল-ভাতের ওপর। তাই দুপুরবেলা যখন বিবিজী ভুক্তাবশিষ্ট কুড়িয়ে নিয়মিত শাক-চচ্চড়ি দিয়ে মুন্নুকে খেতে ডাকলেন, মুন্নু স্পষ্ট ঘোষণা করল সে খাবে না, সে তার চাচার ওখানে একটু যাবে।

বিবিজীর পায়ে কে যেন কাঁটা ফুটিয়ে দিল।

'ওমা···বলি কোন্ মুখে এমন নির্লজ্জের মতো কথা বলতে পারলি রে মুখ-

পোড়া, এখানকার খাবার তোমার মুখে রোচে না···তাই কাজ ফেলে ছুটছ চাচার ঘাড় ভাঙবার জন্যে ! আর আমি সারা দুপুর খেটে মরি। বলি তোকে আর রেখে লাভ কি আমার ?'

বাবুজী সেদিন বাড়িতে ছিলেন। চিৎকার শুনে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হলেন।

'বলি, যা খেতে দেওয়া হয় তা বুঝি নবাবের মুখে রোচে না ? নবাবের বেটা নবাব আমার! বেরো···বেরো হারামজাদা···যা···যা-খেলে তোর শোর-পেট ভরে, যা তাই খাগে যা···যা···'

মুন্নু ততক্ষণ দরজা পেরিয়ে রাস্তায় এসে পড়েছে।

পাহাড়ী পথ দিয়ে নিচে নামতে নামতে, তার মনে পড়ে একে-একে কত-না লাঞ্ছনা তাকে এখানে এসে ভোগ করতে হচ্ছে প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে, অকারণ নিষ্ঠুর নির্যাতন।

বহুকষ্টে সে চোখের জল ধরে রাখে···কিন্তু তার শরীরের মধ্যে···ঠিক তার পেটের ভেতর থেকে যেন কি রকম একটা বায়ু ওপর দিকে ঠেলে উঠতে থাকে ···চোখের পাতার আড়ালে এসে তা জলে পরিণত হয়ে গড়িয়ে পড়ে।

চাচার ঘরের সামনে এসে, কাপড়ের খুঁট দিয়ে চোখ-মুখ মুছে নিয়ে ঘরে ঢোকে···দেখে, দয়ারাম নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্ছে···

আস্তে-আস্তে বুড়ো আঙুলের ওপর ভর দিয়ে সে এগিয়ে যায়···চাচার পায়ের কাছে এসে পায়ের আঙুল নেড়ে চাচাকে ডাকে।

দয়ারাম ধড়মড় ক'রে উঠে বসে : 'কে ? কে রে ?···ও···তুই ? কি দরকার—'

'কিছু খাবার আছে চাচা ?'

সাপের মতো ফোঁস করে ওঠে দয়ারাম :

'বলি এখন আমি খাবার পাবো কোথায় ? জন্মের ঠিক নেই বলে কি তোর কিছুরই ঠিক নেই ? কেন, বাবুর বাড়িতে তোকে খেতে দেয় না ?'

সে-প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে মুন্নু সোজা বলে : 'তাহলে কিছু পয়সা দাও আমাকে, বাজার থেকে কিছু কিনে খাই।'

মুন্নু মাসকাবারি যা মাইনে পেত, তা তার হাতে পড়ত না। দয়ারামের ব্যবস্থা অনুযায়ী নাথুমল দয়ারামের হাতেই দিতেন।

দয়ারাম সোজা হ'য়ে বসে।

'এই বাঁদর-বাচ্চা···রোজ রোজ তোকে যদি এরকম পয়সাই দেবো, তা হলে কোত্থেকে তোর জামা-কাপড়-জুতো হবে!'

মুন্মু প্রতিবাদ করে : 'কই, তুমি তো একখানা কাপড়ও আমাকে কিনে দাও নি! জুতোই বা কোথায়?'

সোজা বিছানা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে দয়ারাম মুন্মুর ঘাড় চেপে ধরে বলে : 'এত বড় আস্পর্ধা যে তুই আমার কাছে হিসেব চাইছিস? এতদিন ধরে খাইয়ে-পরিয়ে চাকরি ক'রে দিয়ে, তার এই পরিণাম? পয়সা···পয়সা···বলি সব সময় তোর এত পয়সারই বা দরকার কি শুনি?' কথার সঙ্গে সঙ্গে পিঠে, পাঁজরে পড়ে ঘুষি।

'তোমার পায়ে পড়ি, চাচা, মেরো না আমাকে! মেরো না আমাকে। বড় খিদে পেয়েছে, তাই খেতে এসেছি···'

'বলি এতক্ষণ ধরে কোথায় গোবর খাচ্ছিলি? খাবার সময় আসতে পারো নি? খিদে পেয়েছে···কেন বাবুরা খেতে দেয় না তোকে?'

অশ্রুসিক্তকণ্ঠে মুন্মু বলে : 'আসব কি ক'রে? বিবিজী কিছুতেই ছুটি দেয় না! রাতদিন আমাকে মারে, আমার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে···কি রকম যে করে যদি জানতে, তাহলে তুমি আমার গায়ে হাত তুলতে না। রোজ সেই শাকচচ্চড়ি আমি আর খেতে পারি না।'

দয়ারাম গর্জন ক'রে ওঠে : 'মিথ্যেবাদী, বদমায়েশ, শয়তান! রাতদিন অকারণে ভালোমানুষের নামে লাগানো—'

দয়ারাম রাগে অন্ধ হ'য়ে এত জোরে চড় মারে যে মুন্মু তাল সামলাতে না-পেরে দেয়ালের ওপর গিয়ে পড়ে।

শরীরের অভ্যন্তর থেকে আর্তনাদ জেগে ওঠে : 'মা···মাগো!'

কিন্তু দয়ারামের স্নেহমায়াহীন-চিত্তে তার কোন রেখাই পড়ে না!

'বল্, সত্যি ক'রে বল্, কোথায় টোটো ক'রে ঘুরে বেড়াচ্ছিলি এতক্ষণ?'

কথার জবাব দিতে মুন্মুর আর প্রবৃত্তি হয় না। নীরবে দুই চোখ দিয়ে শুধু অশ্রু গড়িয়ে পড়ে। নীরবতা আরও উত্তেজিত ক'রে তোলে দয়ারামকে।

'কোথায় ছিলি বল? উত্তর দে? চুপ ক'রে রইলি যে শয়তান?'

অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে মুন্মু বলে : 'বাড়িতে ছিলাম!'

'বাড়িতে ছিলাম ! ফের মিথ্যে কথা ! আঁস্তাকুড়ের কুকুর, কাজ কামাই ক'রে আঁস্তাকুড়ের ধারে-ধারে ঘুরে বেড়াচ্ছিলি, জানি না আমি ! ফের যদি বাবুদের নামে লাগাবি তো খুন ক'রে ফেলব···পাজী, শয়তান, সেদিন কাপ-ডিসগুলো ভেঙে সাহেবের সামনে বাবুদের অপদস্থ করলি···উলটে লাগাতে এসেছ··· হারামজাদা !'

মুন্নু সাবধান হবার আগেই দয়ারাম লাথি মেরে তাকে ফেলে দেয় ।

'তোর জন্যে বাবুদের কাছে আমার পর্যন্ত বদনাম হ'য়ে গেল···কত কষ্ট ক'রে নাম কিনতে হয় তা' তুই জানবি কি ক'রে ? তোর বরাত ভালো যে অমন মনিব পেয়েছিস···ভালো চাস তো মন দিয়ে কাজ কর গে যা, নইলে ছাল-চামড়া ছাড়িয়ে নেবো—চাকর, চাকরের মতো থাকবি···চাকরের আবার বই হাতে ক'রে পড়া কি ? দূর হ···তোর মতো ছেলের জন্যে আমার এতটুকুও দুঃখ নেই···'

হাত ধরে তুলে দয়ারাম তাকে দরজার বাইরে ধাক্কা মেরে ফেলে দেয় ।

॥ তিন ॥

মুন্নু ফিরে চলে বাবু নাথুমলের বাড়িতে, আদর্শ চাকরের শিক্ষানবিশী করার অনুপ্রেরণা সর্বঅঙ্গে বহন ক'রে নিয়ে ।

পথে যেতে-যেতে যেই চাচার মূর্তি মনে পড়ে, অমনি নিরুদ্ধ আক্রোশের জ্বালায় তার মনে তীব্র বিদ্রোহ জেগে ওঠে ।

'আস্তাকুড়ের কুকুর আমি নই, তুমি । তোমার মতো লোককে ঘেন্না করি ।'

তরঙ্গ-আস্ফালনের মতো রুদ্ধ আক্রোশ ফুলে ফেঁপে ওঠে মুন্নুর সর্ব অঙ্গে ।

'আমি চলে যাব···এখান থেকে কাউকে কিছু না-বলে চলে যাব···দয়ারাম··· ঐ পাজী মাগী···সকলের কাছ থেকে একেবারে দূরে চলে যাব···আমাকে খুঁজবে ···ধরার জন্যে চারদিকে ঢোল পিটিয়ে দেবে কিন্তু কোথায় পাবে আমাকে ? কিন্তু···আমার কাছে তো একটাও পয়সা নেই ? খাব কি ? আর যদি খুঁজে বার করতে পারে ! তাহলে তো মেরেই ফেলবে—'

গলির মোড়ে তাঁতিদের ভাঙা বাড়ির ফাটলে চড়ুই পাখীরা কলরব করে··· মুন্নুর মনে হয়, তারাও যেন তাকে গালাগাল দিচ্ছে ।

আশে-পাশের তাঁতশালা থেকে মাকুর শব্দ উঠছে···মেয়েরা দরজায় দাঁড়িয়ে জটলা করছে···ছেলেরা লুকোচুরি খেলছে···চেঁচাচ্ছে···কিন্তু মুন্নু তার কিছুই দেখতে পায় না···কিছুই শুনতে পায় না···

তার মনে হচ্ছিল তার জিভের ডগায় যেন কি রকম জ্বালা করছে, কি একটা অস্বস্তি···যেন জ্বর হয়েছে···পেটের ভেতর খিদেতে আগুন জ্বলছে···জ্বলুক! একরকম অচৈতন্যের মতো সে বাড়ি ফিরে আসে। তার সৌভাগ্য বিবিজী তখন বাড়িতে ছিলেন না। রান্নাঘরে ঢুকে যা হাতের কাছে পায় তাই খানিকটা মুখে পুরে দেয়। তারপর একজায়গায় চুপটি ক'রে শুয়ে পড়ে। ঘুমোবার চেষ্টা করে, ঘুমের মধ্যে যদি এসব ভুলে যাওয়া যায়, কিন্তু ঘুম আসে না। মনের মধ্যে পাগলা ঘোড়ার মতোন খ্যাপা-ভাবনা টগবগিয়ে উঠতে থাকে···সে খেপে ওঠে··· 'আমাকে যেমনভাবে মেরেছে তেমনিভাবে তোমাকে মারব···তোমার গা থেকে চামড়া টেনে ছিঁড়ে ফেলব···যখন ঘুমিয়ে থাকবে তখন গিয়ে কেটে টুকরো-টুকরো ক'রে ফেলব···'

ক্রমশ ঠাণ্ডা মাটি মস্তিষ্কের উত্তাপকে ধীরে-ধীরে অপহরণ ক'রে নেয়···মাটির সঙ্গে মিশে তার চেতনা মাটি হয়ে আছে···সে ঘুমিয়ে পড়ে। মড়ার মতো তার দেহ পড়ে থাকে—অচেতন, অসাড়···কিন্তু ভেতরে তখনও আহত চিত্ত জ্বলন্ত কড়ায় ফুটন্ত জলের মতো টগবগ করতে থাকে···অদৃশ্য অবচেতনায়।

কিন্তু কয়েকদিন যেতে-না-যেতে, মুন্নু যেন ভুলে যায় সব। তার গেঁয়ো পাহাড়ী মন পূর্ণ সজীবতায় আবার সহজ হয়ে ওঠে। সেই সবতাতে খুশী, সহজ সরল মন···জীবনের সেই আদিম আগ্রহ···দেহের প্রতি অণু-পরমাণুতে পরিব্যাপ্ত সেই কৌতূহল শিখা···অব্যাহত অনাহতভাবে আবার তাকে টেনে নিয়ে চলে। আশে পাশের রঙে-রেখায় আবার সাড়া দিয়ে ওঠে তার মন।

দিন যায়।

একদিন বাইরের কলে জল তুলতে গিয়ে দেখে, কল-জুড়ে-বসে আছে সাব্-জজ বাবুর বাড়ির রাঁধুনে-বামুন বর্মা। বর্মা যখন কলে আসে, তখন অন্য বাড়ির চাকরদের ধরে নিতে হয় যে সেই কল শুধু তার একলার জন্যেই হয়েছে।

সেদিন সকাল থেকে বিবিজী মুন্নুকে একবারও মধুর সম্ভাষণ করেন নি, তাই

তার মেজাজটা ছিল বেশ খুশী। বর্মাকে দেখে তাই "মৌজ" ক'রে বলে উঠল : 'এই যে মহারাজ···কেমন আছেন ?'

কিন্তু বর্মা ব্যাপারটা অন্যভাবে গ্রহণ করল। তার মুখের বেয়াড়া চেহারা দেখে কারও বুঝতে দেরী হয় না, তার মনটা কি রকম, যদিও ব্রাহ্মণোচিত তিলক-ফোঁটার অভাব মুখে ছিল না।

মুন্নুর সম্ভাষণের উত্তরে সেই বিকৃত মুখকে আরও বিকৃত ক'রে বর্মা বলে উঠল : 'কি রে পাহাড়ী কুত্তা, কি বলছিস! বলি তোর হুজুরানী আজকাল কি রকম আদর-যত্ন করছে ? সেই রকম মারছে ধরছে···না, আজকাল বুকে ক'রে দুধ খাওয়াচ্ছে ?'

এ ধরনের রসিকতায় মুন্নু অভ্যস্ত ছিল না। হঠাৎ লজ্জায় তার মুখ রক্তিম হয়ে উঠল।

'আমার সঙ্গে এ রকম কথা বলতে লজ্জা করে না তোমার ? আমি তোমার মনিব বা মনিবানী সম্বন্ধে তো কোন কথা বলি নি।'

'বলি অত চটিস কেন ? লক্ষণ তো ভালো নয় বাবা! হুজুরানী তা হলে তোকে পটিয়েছে বল্ ? তাই, যা গালাগাল দেয়, মুখ বুজে সব সয়ে থাকিস··· পেটে-খেলে পিঠে-সয় না রে ? বলি···কেমন জমেছে ?'

কথার পর্যাপ্ত বোধ না হওয়ায় বর্মা কুৎসিত অঙ্গ-ভঙ্গী করে···মুন্নু ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে : 'কল ছেড়ে দাও···আমি জল নেব···কল জুড়ে বসে আছ, কল কি তোমার একার ?'

ততক্ষণে পাশের আর-এক-বাড়ির চাকর, লেহ্‌নু সেখানে এসে উপস্থিত হয়েছে। লেহ্‌নুকে শুনিয়ে বর্মা বলে : 'পাহাড়ী চাষার রোগ দেখ! ওর হুজুরানীর নাম করছি বলে উনি চটেছেন! বলি···তোরা করতে পারিস, আর আমরা বলতে পারি না ? কি লেহ্‌নু, বল না! বলি বাবা ভেতরে কিছু নট-ঘট না থাকলে, কেউ অমন চোরের মার সইতে পারে ?'

মুন্নু সে-কথায় লক্ষ্য না ক'রে জলের কলের দিকে এগিয়ে আসে : 'কল ছেড়ে দাও, জল নেবো।'

লেহ্‌নু উস্‌কে দেয় : 'বর্মাজী, ছোঁড়ার বড় তেজ হয়েছে—দাও না একহাত

ঠিক ক'রে···ব্যাটা মুনিবানীর পয়সা থেকে চুরি ক'রে বাজারে গিয়ে ক্ষীর-রাবড়ী খায়···তাই এত তেজ···'

হঠাৎ এই মিথ্যা অভিযোগে মুন্নু অস্থির হয়ে ওঠে : 'মিথ্যা কথা ! মিথ্যে-বাদী···ছাড় কল্···জল নিয়ে আমি চলে যাই !'

লেহ্নু পথ আটকিয়ে বলে : 'আমাকে মিথ্যেবাদী বলে তুই যাবি কোথায় ? বর্মা···লাগাত শালাকে···'

মুন্নু রাগে কটমট ক'রে লেহ্নুর দিকে ফিরে দাঁড়ায়। সেই অবসরে বর্মা পেছন থেকে তাকে ধাক্কা মারতেই সে পড়ে যায়। কোনরকমে টালসামলে নিয়ে উঠে মুন্নু এক লাফে বর্মার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং টিকিসুদ্ধ এক মুঠো চুল ধরে তাকে নিয়ে মাটিতে গিয়ে পড়ে। কোনরকমে ধস্তাধস্তি ক'রে টিকি উদ্ধার ক'রে বর্মা তার মুখে সজোরে এক ঘুষি লাগায়—লেহ্নু পেছন থেকে লাথির-পর-লাথি মারতে থাকে। আহত বাঘের মতো আক্রোশে মুন্নু সজোরে বর্মার গলা টিপে ধরে, কিন্তু দু'জনের সঙ্গে একা সে কতক্ষণ পারবে ? বর্মা সামনে থেকে একটা কাঠের চ্যালা তুলে নিয়ে সজোরে মুন্নুর মাথায় বসিয়ে দেয়···মাথা ফেটে তাজা রক্ত গড়িয়ে পড়ে···গণ্ডগোল দেখে লেহ্নু সরে পড়ে—

সেই অবস্থায় মুন্নু কলেতে গিয়ে কলসী বসিয়ে দিয়ে ছুটে বর্মার হাত থেকে কাঠটা কেড়ে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দেয়।

'যা ব্যাটা, তোর হুজুরানীর কোলে গিয়ে ঘুমুগে—' বলে বর্মা রণে ভঙ্গ দেয়।

ভর্তি কলসীর শব্দে মুন্নুর খেয়াল হলো, দেরি হয়ে গিয়েছে।

রক্ত-ঝরা মাথা নিয়ে সে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফেরে। সামনেই বিবিজী।

'কি সর্বনাশ ! জল তুলতে গিয়ে কার সঙ্গে মারামারি করেছিস ?'

'কারুর সঙ্গে না !'

'বলি মাথা থেকে রক্ত ঝরছে—আর বলিস কি না মারামারি করিস নি ? এ নিশ্চয়ই ঐ নচ্ছার বর্মার কাণ্ড ? বার-বার না বারণ করেছি, ওর সঙ্গে মিশবি না ? এখন বোঝ, বন্ধুত্বের কি সুখ ?'

'ও কিছু নয়—একটু ছড়ে গেছে মাত্র !'

টানতে টানতে মুন্নুকে নিয়ে বিবিজী ছোটবাবুর কাছে হাজির করেন, ছোট-বাবু তখন জামা ইস্ত্রি করছিল।

'দেখ দেখ কাণ্ড ! কার সঙ্গে মারামারি ক'রে মাথা ফাটিয়ে এসেছে !'

ছোটবাবু লাফিয়ে ওঠেন : 'কই, এদিকে আয় তো দেখি !'

ছোটবাবুর কাছে এগিয়ে গিয়ে মুন্নু বলে : 'ও কিছু না—আমি ছাই দিয়ে ঠিক ক'রে দিয়েছি। এক্ষুণি সেরে যাবে !'

এই অব্যর্থ মহৌষধটি সে গাঁয়ে থাকতে গাঁয়ের নাপিতের কাছ থেকে শিখেছিল।

ছোটবাবু চিৎকার ক'রে উঠলেন : কি সর্বনাশ ! কি করেছিস রে মুন্নু ! এখনি যে বিষিয়ে উঠবে, তা জানিস না বুঝি ? এদিকে আয় রাস্কেল !'

তৎক্ষণাৎ পরিষ্কার ক'রে টিনচার আইডিন দিয়ে বেঁধে দেন। যন্ত্রণায় মুন্নুর মাথা ঘুরে আসে কিন্তু ছোটবাবুর ওপর অগাধ বিশ্বাসে সে চুপটি ক'রে থাকে।

রান্নাঘরের দাওয়ার একধারে ছোটবাবুর আদেশে সে শুয়ে পড়ে। তন্দ্রার ঝোঁকে সে শোনে, বিবিজী চেঁচাচ্ছেন···তবে তার বিরুদ্ধে নয়···বর্মা এবং তার মনিবদের নিয়ে পড়েছেন···

'যত সব ছোটলোক, আস্পর্ধা পেয়ে মাথায় উঠেছে···যেমন মনিব, চাকর তো তেমন হবে ? বলি, মান-সম্মান ওদের কি একার আছে ? আর কারুর নেই ? না হয় দুটো মাইনে বেশী পায়···তা' বলে এত তেজ কিসের ? তোরাও মানুষ···আমরাও মানুষ···তেজ দেখাতে হয়, যে যার নিজের ঘরে দেখাবে···'

কথাটা যাঁকে শুনিয়ে জোর গলায় বিবিজী জাহির করেছিলেন, তাঁর কানে পৌঁছতে দেরি হলো না। পাশের বাড়ির পাঁচিল থেকে গলা উঁচু ক'রে সাব-জজ সাহেবের গিন্নী ব'লে উঠলেন : 'কেরানীর মাগ তার আবার এত দেমাক কিসের ? দিন-দিন যেন বেড়েই চলেছে আস্পর্ধা। লঘু-গুরু জ্ঞান নেই। আজ আসুন উনি বাড়ি, দেখিয়ে দেব গায়েপড়ে অপমান করার ঠেলাটা কতদূর ! কোথা থেকে একটা চাষা ধ'রে এনেছে···তার জন্যে এত দেমাক। কুকুর ! কুকুর ! রাস্তার কুকুর !'

যাকে নিয়ে এই ঝগড়া সে তখন নাক ডাকিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে !

ঘুম থেকে উঠে মুন্নু দেখে, তার মাথায় ভীষণ যন্ত্রণা শুরু হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে জ্বর দেখা দিল। জ্বরের ঘোরে, যন্ত্রণায়, সে কাঁদতে শুরু ক'রে দিল।

জ্বর বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সে ভুল বকতে আরম্ভ করল। তার মনে হলো অর

চোখের সামনে যেন সব অন্ধকার হ'য়ে গিয়েছে…রাত্রির আকাশ যেমন অন্ধকার হ'য়ে যায়…শুধু তার মধ্যে দু'একটা তারা মিটমিট করছে। কানে সে কিছুই শুনছে পাচ্ছে না…শুধু মনে হচ্ছে যেন এক মহাশূন্য অব্যক্ত গর্জন ক'রে উঠছে। এক কোণে শুয়ে সে কাঁপতে থাকে। কোন কিছুরই সাড়া নেই…দিনরাত যেন সব এক হয়ে—গলে গিয়ে অন্তহীন বেদনায় পরিণত হচ্ছে।

ছোটবাবু ওষুধ দেন। তার ফলে, সে ঘেমে-নেয়ে ওঠে। সমস্ত শরীরটা যেন কিরকম হালকা অবশ হয়ে যায়ঃ আবার যেন একটু একটু ক'রে সে তার আগেকার অনুভূতি ফিরে পায়…আশেপাশের সব জিনিস আবার যেন ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বোধ হয়।

একে একে তার মনে ছবির মতো অতীতের সব ঘটনা আসা-যাওয়া করতে থাকে। চাচার সঙ্গে তার শহরে আসা—চাচার মুখে নানান আশার বাণী তারপর কাজে লেগে যাওয়া…সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ কাজের অস্বস্তি…কাপ-ডিস ভাঙা…বিবিজীর নিত্য গঞ্জনা…চাচার হাতে অপমান…একে-একে তার সব মনে পড়তে থাকে। কাউকেই সে চায় না, তাকেও কেউ চায় না। একমাত্র শুধু ছোটবাবু যা তাকে একটু স্নেহ করেন। মনে পড়ে, শীলাকে যদিও মাঝে-মাঝে তাকে বানর ব'লে বিদ্রূপ করে, তবুও মন্দ লাগে না তাকে। স্নান সেরে যখন ভিজে কাপড় গায়ে জড়িয়ে স্নানঘর থেকে বেরিয়ে আসে, মুন্নু একদৃষ্টিতে তার দিয়ে চেয়ে থাকে…চেয়ে থাকতে তার ভালো লাগে। মনে পড়ে, ছেলে-বেলা থেকে সে শুনে এসেছে, সব মেয়েকে মা বা বোনের মতো দেখতে। শীলার ছবি মনে পড়লেই, সে চেষ্টা করে তাকে বোন বলে সম্বোধন করতে। কিন্তু যতই সে শীলাকে দেখে, ততই তার সঙ্গে থাকতে, তার সঙ্গে খেলা করতে প্রবল ইচ্ছা জাগে…ভুলে যায় তাকে বোন বলে তফাতে রাখার কথা। কল্পনায় অথবা প্রত্যক্ষ জীবনে, ইদানীং তাই শীলাকে দেখলেই কিরকম এক লজ্জায় তার মাথা হেঁট হয়ে যেত। গাঁয়ে গ্রীষ্মকালে যখন পড়শীদের বাগানের গাছে ফল পেকে উঠতো, সেই সব পাকা ফলের দিকে চেয়ে চেয়ে ঠিক এমনি তার মাথা হেঁট হয়ে যেত…পাতলা ঠোঁটের কোণে বঞ্চিত ক্ষুধার ম্লান হাসি ফুটে উঠত। শীলার ছবি ভাবতে-ভাবতে তার ছোট বুক আনন্দে দুলে উঠত, আপনার অজ্ঞাতে ঠোঁটের কোণে হাসি ফুটে উঠত। কিন্তু পরক্ষণেই সেই

অসম্ভব আশার পরিণতির কথা ভাবতেই, সে-হাসি ঠোঁটের কোণে মিলিয়ে যেত। যদি তার টাকা থাকত, যদি সে যা মাইনে পেতো তা দয়ারামের হাতে না দিয়ে বাবু তাকেই দিতেন, তা থেকে সে একটি পয়সাও খরচ করত না··· জমিয়ে-জমিয়ে সে মিঠাইওয়ালা হয়ে ফেরি ক'রে বেড়াত···শীলাদের স্কুলের সামনে সে দেখছে, একটা ছেলেকে মিটাই ফেরি করতে···রোজ একটা ক'রে টাকা সে রোজগার করে। মনে পড়ে, যেদিন তার চাচা তাকে শহরে নিয়ে আসে, সেদিন দয়ারাম বলেছিল, 'দুনিয়ার টাকাই সব!' মুন্নু আজ বোঝে, সত্যিই, দুনিয়ার টাকাই হলো সব! আজ জীবনে সে প্রথম বুঝল, তার সঙ্গে তার গাঁয়ের মহাজনের ছেলে জয় সিং-এর তফাত কোথায়, গরীব লোকদের সঙ্গে বড় লোকদের পার্থক্য কোথায়!

একে-একে তার মনে পড়ে তার গাঁয়ের সব হতভাগা লোকদের ছবি···আজ যেন সে বুঝতে পারে, তাদের চেহারার মধ্যে রেখায়-রেখায় কি কথা ফুটে আছে। মনে পড়ে সত্তর বছরের বুড়ো গঙ্গুর চেহারা···হাড়ের ওপর শুধু একটা চামড়া জড়ানো···তারই সহপাঠী বিষাণের ঠাকুরদা···সেই বুড়ো বয়সে সেই কখানা হাড় নিয়ে মাঠে-মাঠে জনমজুর খেটে তাকে দিন-গুজরান করতে হয়···মনে পড়ে বিশ্বম্ভরের মায়ের শীর্ণ মুখখানি, জমিদার বাড়িতে দু'বেলা ঘর ঝাঁট দিয়ে যাকে দু'মুঠো ভাতের সংস্থান করতে হয়···অস্পষ্ট ছায়ার মতো মনে পড়ে তার নিজের বাবার কোটরগত দু'টো চোখ···যেন সে স্পষ্ট অনুভব করে তার নিজের মায়ের কোলের সেই স্নিগ্ধ উত্তাপ···মার কোলে সে শুয়ে আছে আর তার মা জাঁতা চালিয়ে চলেছে···বিরামবিহীন···যতক্ষণ পর্যন্ত না মৃত্যু এসে সে-হাত থামিয়ে দিয়েছে। আজ সে বুঝতে পারে সেই ছোট্ট কোলের সেই উত্তাপটুকু জীবনে কত প্রয়োজন···সাধ যায়, সেই উত্তাপকে কাপড়ের মতো সারা অঙ্গে সে জড়িয়ে রাখে।

সে ভাবে আর চারদিকে চেয়ে দেখে, দেখে তার মতোন গরীব লোক, তারাই তো সংসার জুড়ে রয়েছে···তাদের মধ্যে হাতে গোনা যায় দু'তিনজন মাত্র বড়লোক। আচ্ছা, এই যে এত সব গরীব লোক, তারা কি সবাই তার বাবার মতোন একদিন অসহায়ভাবে বিনা চিকিৎসায় মারা যাবে? গরীব লোকেরা কি এইরকম ক'রেই মরে? শহরে অবশ্য সে দেখছে, গাঁয়ের চেয়ে বড়লোকদের

সংখ্যা বেশী। কিন্তু সে নিজের মনে হিসেব ক'রে দেখে, একশোটা গাঁয়ের মধ্যে আছে বড় জোর একটা শহর আর সেই এক-একটা গাঁয়ে সে যত গরীব লোক দেখেছে, সেইরকম যদি সব গাঁয়েই থাকে, তা' হলে পৃথিবীতে কত গরীব লোক আছে ?

সে নিজের মনে বিচার করে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, শূদ্র, এত যে সব জাত-বিচার, তার মধ্যে সে দেখেছে, আসলে মাত্র দুটো জাত আছে। জাতে সে ক্ষত্রিয়, আর গরীব বর্মা জাতিতে ব্রাহ্মণ, কিন্তু সে-ও গরীব···মনিবেরা তাকেও যেমন চাকর বলে ঘৃণা করে, বর্মার মনিবও বর্মাকে তেমনি চাকর বলে ঘৃণা করে। সেখানে তারা দু'জনেই এক জাতের লোক। বাবুদের যে-জাতই হোক না কেন, তারা সাহেবদের মতোই···তারা সবাই এক জাত। সে স্থির মীমাংসায় আসে, জগতে দুটো জাত আছে···এক জাতের নাম হলো মনিব, আর এক জাতের নাম হলো চাকর। এক জাত ধনী···আর এক জাত গরীব।

কিন্তু বিবিজীর ডাকে সেদিন তার সেই চিন্তাধারার গতিরেখা হঠাৎ ঘুরে যায়। সেরে ওঠার সঙ্গে-সঙ্গে আবার সে তার দৈনন্দিন কাজের মধ্যে ডুবে যায়। কাজ করতে করতে দেহের সবলতার সঙ্গে সঙ্গে আপনার অজ্ঞাতে তার মনের স্বাভাবিক সজীবতাও আবার ফিরে আসে। তার নিজের অজ্ঞাতে তার সত্তার ভিত্তিমূলে ছিল যে দুরন্ত প্রাণ-প্রবাহ···তার সহজ মানবীয় স্ফুরণে সে ভুলে যায় উঁচুনিচুর ভেদ-জ্ঞান, মনের মনের আনন্দে আবার সে নেচে বেড়ায়, গান গায়, চেঁচায়, ডিগবাজী খায়। দুদিনের দুশ্চিন্তা মনের আশেপাশে যে-সব বেড়া তৈরি করে, তার বুনো প্রাণের পাগলা ঝোরা তাদের ভেঙে-গুঁড়িয়ে-ভাসিয়ে নিয়ে চলে যায় আবার।

কিন্তু, তার এই স্বভাবজাত বুনোমি, যা কোনদিন ভালো-মন্দের নীতিবোধে বাঁধা পড়ে নি, এবং যা দৈহিক আঘাতের বেদনাতেও কোনদিন সঙ্কুচিত হয় নি, তাকেই মাঝে মাঝে বিপন্ন ক'রে তুলত। তখন আর তার লজ্জার অন্ত থাকত না।

ঠিক এমনিভাবে সে বিপন্ন হলো একদিন।

সেদিন বিকেলবেলা রান্নাঘরের দাওয়ায় বসে সে আলু কাটছিল। এমন সময় শুনল শীলা আর তার স্কুলের বান্ধবীরা বাইরের ঘরে এসেছে। বিবিজী

তখন পাড়ার গিন্নীদের সঙ্গে খোশগল্প করতে বেরিয়েছেন। সে ভাবল তাড়াতাড়ি কাজ সেরে বাইরের ঘরে তাদের সঙ্গে গিয়ে জুটবে।

হাত ধুতে-ধুতে সে শুনতে পেল, সেই বাক্সের গান শুরু হয়ে গিয়েছে। এই তো তার সুযোগ! ইদানীং বিবিজী কড়া হুকুম দিয়ে দিয়েছিলেন যে, তারা যেন মুন্নুর সঙ্গে খেলা না করে। তাদের মন-ভুলানোর জন্যে মুন্নুর কাছে এক ব্রহ্মাস্ত্র ছিল, বাঁদর-নাচ দেখানো। তারই প্রলোভনে তারা ভুলে যেত বিবিজীর নিষেধ···মুন্নু নিঃশব্দে মিশে যেত তাদের দলে।

শীলা তখন বান্ধবীদের নিয়ে স্কুলে-শেখা একটা নাচের মহড়া দিচ্ছিল। তার মধ্যে হঠাৎ লাফিয়ে পড়ে মুন্নু হামাগুঁড়ি দিয়ে বিচিত্র অঙ্গ-ভঙ্গী করতে শুরু ক'রে দিল। মেয়েরা ভয়ে নাচ বন্ধ ক'রে দিল।

কৌশল্যা ভয়ে-ভয়ে বলে উঠল: 'এই, চলে যা এখান থেকে!'

শীলা সমর্থন ক'রে বলে: 'আমাদের সঙ্গে তুই খেলতে এলি যে? মনে নেই মা বারণ ক'রে দিয়েছেন বার-বার?'

কিন্তু মুখে যাই বলুক-না-কেন, তার সেই বিচিত্র অঙ্গ-ভঙ্গী এবং নৃত্য শীলার ভালো লাগত! সে নিজেও চাইত মুন্নুর সঙ্গে খেলতে কিন্তু তার মায়ের আদেশ তাকে লাগাম টেনে ধরত। কিন্তু মুন্নুর রকম-সকম দেখে শীলা বেশীক্ষণ নিজেকে ধরে রাখতে পারল না। কৃত্রিম রাগে মুন্নুর কান ধরে তাকে ঘুরিয়ে বেড়াতে লাগল।

মুন্নুও ইচ্ছা ক'রে তাকে তার কান ধরতে দিল।

মেয়েরা হাসিতে ফেটে পড়ল। শীলা যত জোরে কান ধরে টানে, সে তত তার ওপর লাফিয়ে-ঝাঁপিয়ে পড়ে, দাঁত কড়মড় করে, কামড়াবার জন্যে মুখ হাঁ করে, যেন সে সত্যিকারের বাঁদর।

খেলতে-খেলতে সে হঠাৎ শীলার মুখে দাঁত বসিয়ে দেয়! তার ধারণাতেই ছিল না, সে কি অনর্থই না ক'রে ফেলেছে।

'মা! মা!' বলে শীলা চিৎকার ক'রে ওঠে।

কিন্তু কোন সাড়া পাওয়া গেল না মায়ের। তখন কৌশল্যা বেরিয়ে গেল শীলার মাকে ডেকে আনবার জন্যে।

'ও মাসীমা! শিগগির এসো! শিগগির এসো! দেখে যাও, মুন্নু কি করেছে!'

বিবিজী উন্মাদের মতো ছুটতে ছুটতে এসে পড়েন।

ঘরে ঢুকেই দেখেন শীলা আহত গণ্ডে হাত বুলোচ্ছে।

'কি করেছে দেখি···ওকি তোর মুখে কি হয়েছে ?'

দুধের মতো সাদা গালে কালশিরার দাগ পড়ে গিয়েছে।

ঝড় ভেঙে পড়বার আগেই মুন্নু কাতরকণ্ঠে বলে ওঠে : 'দোহাই বিবিজী ···আমি শুধু খেলছিলাম—'

দেখতে-দেখতে কালবৈশাখীর ঝড় ভেঙে পড়ে···

'ওরে মড়া···তুই মরবি কবে ? কবে হাড় জুড়োবে আমার···ওমা···কি হবে গো···এই দুধের বাছার ওপর···' ইত্যাদি ইত্যাদি···

দৈবচক্রে বাবু নাথুমলও তখন আপিস থেকে ফিরছিলেন। চিৎকার শুনে তিনি ব্যস্ত হয়ে ঘরে ঢোকেন : 'কি ব্যাপার ? কি হয়েছে ?'

তার উত্তরে বিবিজী গর্জন ক'রে ওঠেন ! 'বলি, কি না হয়েছে ? হবার আর বাকি কি আছে ?' মুন্নুর দিকে তাকিয়ে : 'মর্‌না···মর্‌না মড়া ?'

ব্যাপারটা বুঝতে না পেরে নাথুমল আরও রেগে ওঠেন : 'বলি, কি হয়েছে তা তো বলবে ?'

'বলব···বলব···রাগে আমার সর্বশরীর জ্বলে যাচ্ছে···ঐ এতভাগা সর্বস্ব-খেগো শীলার গাল কামড়ে দিয়েছে ! ও মা ! ঘোর কলি···ঘোর কলি ! এইটুকু বাচ্চা ছোঁড়া···এখনও জন্মায় নি বললে হয়···তার কি না এত বাড়···'

বাবু নাথুমল ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে, দাঁতে-দাঁতে চেপে চিৎকার ক'রে উঠলেন। 'এই হারামজাদা···কি করেছিস্‌ বল ?'

মুন্নু মাথা হেঁট ক'রে দাঁড়িয়েছিল···লজ্জায় আর অপমানে তার দেহের সব যেন মুখে এসে জমা হয়েছে···বুক এত জোরে কাঁপছে যে সে নিজেই শুনতে পাচ্ছে তার ধুকপুকুনি !

বাবু নাথুমল এগিয়ে গিয়ে সজোরে মুন্নুর গালে একটা চড় বসিয়ে দেন।

'চুপ ক'রে রইলি যে শুয়োর ! উত্তর দে ?'

কোনরকমে মুখ তুলে মুন্নু বলে : 'বাবুজী বিশ্বাস করুন, আমি খেলছিলাম শুধু···'

'খেলছিলাম···খেলছিল···বাঁদর-বাচ্চা কোথাকার—'

হাড়-বার-করা হাতে বাবুজী পুনরায় আর-এক চড় বসিয়ে দেন সজোরে এবং সঙ্গে সঙ্গে পালিশ-করা কালো বুটসুদ্ধ পায়ের এক লাথি···

চকচকে কালো পালিশ-করা বুট···মুন্নুর বড় সাধের জিনিস !

সেই লাথির বেগ সামলাতে-সামলাতে মুন্নু কেঁদে বলে ওঠে : 'আমাকে মাপ করুন বাবুজী···মাপ করুন আমাকে···'

'মাপ করব···ভালো ক'রে তোকে মাপ করব, আঁস্তাকুড়ের কুকুর !' সঙ্গে সঙ্গে বুটসুদ্ধ পায়ের আবার লাথি···

তাতেও সন্তুষ্ট না হয়ে তিনি ছুটে গিয়ে ঘরের কোণ থেকে একটা লাঠি তুলে নিলেন। লাঠি দেখে মুন্নুর মনের ভের এক মুহূর্তের মধ্যে কি যেন হয়ে গেল। এক দুরন্ত বিদ্রোহ তার মনে জেগে উঠল। কিন্তু বাইরে তা প্রকাশ করতে সে ভীস হয়ে পড়ল। পরিবর্তে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে সে কাঁদে আর বলে : 'বাবুজী মাপ করুন···মাপ করুন বাবুজী !'

'মাপ করবই তো শুয়োর !'

বাবু নাথুমল সবেগে লাঠি তুলে আঘাতের-পর-আঘাত ক'রে চলে।

মুন্নু যন্ত্রণায় মাটিতে পড়ে কাতরাতে লাগল।

বাবু নাথুমল বীরভঙ্গীতে শেষবারের মতোন লাঠি তুললেন,

'যেমন কুকুর···তেমনি মুগুর···'

এতক্ষণ পরে বিবিজী বাবুর হাত ধরে বলে উঠলেন : 'থাক্···আর নয়···'

অন্ধকার ঘরের এক কোণে মাটিতে মুখ ক'রে মুন্নু অর্ধ-চেতন অবস্থায় শুধু বলে : 'মাপ করুন আমাকে···'

বেত্রাহত সারমেয় খোঁজে অন্ধকার কোণ···বেত্রাহত মানুষ খোঁজে নিষ্ক্রমণের পথ।

সেদিন সন্ধ্যার পর, যখন তাকে একলা ঘরে ফেলে রেখে দিয়ে, যে-যার কাজে ব্যস্ত ছিল, সেই সময় মুন্নু সকলের অতর্কিতে অন্ধকার গা ঢাকা দিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল। পাহাড়ী পথ ধরে নিচের দিকে সে নামতে শুধু করলো, সারি-সারি দেওদার গাছ পেরিয়ে, ব্যাঙ্কের বাড়ি ছাড়িয়ে, নানান কাজ করা বড় বড় সব থামওয়ালা বাড়ি পেছনে ফেলে, সে এসে পড়ল বাজারের মধ্যে। ছোট-বড় দোকানগুলোর মধ্যে কারুর ঘরে জ্বলছে ইলেকট্রিক আলো, কারুর

দরজা থেকে দেখা যাচ্ছে হ্যারিকেনের লণ্ঠন···কোনোটাতে জ্বলছে মোমবাতি। সেই আলোর ঝলমলানি মুন্নুর অশ্রুসিক্ত চোখে তীরের মতোন এসে লাগে! অশ্রু আহত চোখ খোঁজে অন্ধকার। তাই গলির অন্ধকারের মধ্যে মুন্নু ঢুকে পড়ে। কিন্তু ছোট্ট গলির মধ্যে কাছাকাছি সব লোক চেয়ে থাকে তার মুখের দিকে ···আলোর চেয়ে সে আরও অসহ্য লাগে। তার সর্ব-দেহ-মন খুঁজছে কোথায় অন্ধকার···কোথায় কোলাহলহীন নীরবতা। এই মানুষের ভিড় থেকে সে যদি এক মুহূর্তের মধ্যে উধাও হয়ে চলে যেতে পারে! কোথাও কোন গভীর অন্ধকারে মুখ রেখে সে যদি ভুলে যেতে পারে, সর্ব অঙ্গের সেই নিদারুণ প্রহারের নির্মম অপমানের জ্বালা। কেউ যেন তাকে না, দেখে, না চিনতে পারে। সে এ-গলি সে-গলি দিয়ে মানুষ এড়িয়ে চলে···শেষকালে সে ছুটতে আরম্ভ করে।

হঠাৎ এক জাগায় এসে দেখে, একটা প্রকাণ্ড দরজার ওধারে একটা মস্ত বড় উঠোনের মতো খোলা জায়গা···তার ভেতর জায়গায়-জায়গায় কাঠের আগুনে সে মানুষের মৃতদেহ পুড়ছে! সব চুপচাপ···কোথাও আর কোন সাড়াশব্দ নেই। সে স্তব্ধ অন্ধকারে মুন্নু ভীত ওঠে···

পাশের এক খোলা নর্দমায় দুটো কুকুর কি নিয়ে চিৎকার ক'রে উঠল···দূরে একটা এঞ্জিন সশব্দে চলে গেল···মুন্নুর মনে হলো, কে যেন তার পেছনে-পেছনে আসছে···ভূত নাকি? না, কাছের রেলের গুদামের প্রহরী। মুন্নু দম বন্ধ ক'রে ছুটতে আরম্ভ করল। দেখে সামনে অসংখ্য লাল নীল আলো···পায়ের তলায় অজগর সাপের মতো পড়ে রয়েছে রেলের লাইন···

রেল-লাইন ধরে মুন্নু স্টেশনের ধারে এসে দেখল একটা গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে ···কিন্তু লোকজন কোথাও কেউ নেই। গাড়ির ভেতরেও অন্ধকার। দরজা ঠেলতে গিয়ে দেখে দরজা বন্ধ। খোলা জানালা দিয়ে গাড়ির ভেতর সে লাফিয়ে পড়ল···গাড়ির মেঝেতে···সটান সেখানেই সে শুয়ে পড়ল···

কিছুক্ষণ পরেই সে শুনতে পেল, মানুষের আওয়াজ···ক্রমশ তা' কলরবে পরিণত হলো···গাড়ির দরজা খুলে অন্ধকারে যে-যার আসন খুঁজে নেবার জন্যে হুড়োহুড়ি লাগিয়ে দিল···মুটেরা দুমদাম ক'রে পোঁটলা নামিয়ে দিতে লাগল···

মানুষের চেঁচামেচিতে আর নিঃশ্বাসে গাড়ির ভেতরের অন্ধকার গরম হয়ে উঠল ···কিছুক্ষণ পরে গাড়ি নড়ে উঠল···ট্রেন ছেড়ে দিল···

কোথায় চলেছে সে-ট্রেন, তা মুনু জানে না···তবে একটা চলন্ত জিনিসের সংস্পর্শে সে-ও চলেছে, এই সান্ত্বনাই তার কাছে চরম হয়ে দেখা দিল।

শ্যামনগর থেকে দৌলতপুরের দিকে যে ট্রেনটি রাত্রির অন্ধকারের মধ্য দিয়ে ধীরে-ধীরে চলছিল, তার থার্ড-ক্লাস কম্পার্টমেন্টের এক কোণে শেঠ প্রভুদয়াল রাশীকৃত লগেজের ওপর কোন রকমে হাত-পা গুটিয়ে বসে ঘুমুবার চেষ্টা ক'রে ভোরের দিকে বুঝলেন বৃথা সে-চেষ্টা···সামনেই তাঁর নামবার স্টেশন, অতএব আগে থাকতে লগেজগুলো সামলে নেওয়া দরকার। কিন্তু লগেজ সামলাতে গিয়ে দেখেন, গাড়ির মেঝেতে এক কোণে একটি ছেলে অগাধে ঘুমুচ্ছে···হঠাৎ তার গায়ে পা পড়ে যেতে যেতে সামলিয়ে নিয়ে শেঠজী বলে উঠলেন: 'রাম··· আরে···রাম!'

তখন একজন শিখযাত্রী সবেমাত্র চোখ খুলে গুরুজীর নাম স্মরণ করছিল: ওয়া গুরুজী! ওয়া গুরুজী!'

একজন মুসলমান-যাত্রী উঠে দাঁড়াতেই দেখে, তার পায়ের তলায় একজন শুয়ে পড়ে আছে: 'ইয়ে আল্লাহ্! ইয়ে কোন্ হ্যায়?'

পাশেই একজন নারী শিশু-পুত্রকে স্তন্যদান করছিলেন, তাঁরও দৃষ্টি সেই দিকে পড়তে তিনি বলে উঠলেন: 'মড়া, না, জ্যান্ত?'

দেখতে দেখতে সেই উষার আলোকে গাড়িসুদ্ধ লোকের মধ্যে একটা সশব্দ কৌতূহল জেগে উঠল। শেঠজী হাত দিয়ে ঠেলে ঠেলে মুনুকে জাগিয়ে তুললেন।

জেগে উঠে চোখ খুলে সেই দৃশ্য দেখে মুনু ভয়ে মুখ বুজে পড়ে রইল। সবেমাত্র সে স্বপ্ন দেখছিল, বিরাটাকার সব দৈত্য তার গায়ের ওপর দিয়ে হেঁটে চলে যাচ্ছে···আর দু'দিক্ থেকে শিঙ-ওয়ালা দৈত্য তাকে তাড়া ক'রে আসছে।

শেঠ প্রভুদয়াল ঈশ্বরের নাম স্মরণ ক'রে অর্ধ-স্বগতোক্তি ক'রে বললেন: 'ভগবানের ইচ্ছে কে বুঝতে পারে? ভোরবেলা চোখ মেলতেই কি না দেখি একটা ছেলে!'

সহযাত্রী বন্ধু গণপতি শেঠজীর মনের কথা বুঝতে পেরে ঠাট্টা ক'রে বলে উঠলেন : 'আর ভাবনা কি শেঠজী ? একেবারে "রেডি-মেড" ছেলে…শেঠ-গিন্নীকেও আর গাছ-গাছড়া খুঁজতে হবে না…তোমাকেও আর হেকিমী ওষুধ খেতে হবে না !' তার পর নিজের রসিকতায় নিজে খানিকটা হেসে নিয়ে বললেন : 'আমার মনে হয় বন্ধু, দোষটা শেঠ-গিন্নীর নয়…তোমারই !'

শেঠ প্রভুদয়ালেরও আদি-বাড়ি ছিল ক্যাংড়ার পাহাড়ে। সেখান থেকে একদিন ভাগ্যবিতাড়িত হয়ে দৌলতপুরে এসে তিনি কপর্দকহীন পথের কুলি থেকে ক্রমশ শেঠজী হয়েছেন…এখন একটা চাটনির কল এবং এসেন্স-তৈরির কারখানার মালিক তিনি।

তাই মুন্নুকে দেখেই তিনি চিনেছিলেন, পাহাড়ী বলে। পাহাড়ী লোকদের কথার টানে তিনি জিজ্ঞাসাবাদ শুরু ক'রে দিয়েছেন : 'কি নাম ? কোথা থেকে আসা হচ্ছে ? কার ছেলে ? কোথায় যাবে ?'

হঠাৎ সেই অবস্থায় নিজের গেঁয়ো বুলি শুনতে পেয়ে মুন্নুর মন যেন স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এল। সে সহজভাবে সব প্রশ্নের উত্তর দিয়ে যায় : 'আমাদের গাঁ বিলাসপুরে, আমাকে তারা মুন্নু বলে ডাকত, শ্যামনগরে এসে আমার নাম হয় মুনুছু ! ছেলেবেলাতেই আমার মা-বাপ মারা যায়। আমার চাচা শ্যামনগরের ব্যাঙ্কের চাপরাশী। সেখানে এক বাবুর বাড়িতে আমার চাকরি ক'রে দেয়। পরশুদিন আমার মনিব আমাকে এমন মারে যে আমি পালিয়ে আসি…'

কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে তার নিজের অজ্ঞাতে তার ঠোঁঠের দুই কোণ কেঁপে উঠে দু'চোখ ফেটে জল গড়িয়ে পড়তে থাকে। ততক্ষণে তাকে নিয়ে গাড়ির ভেতরে জল্পনা-কল্পনা শুরু হয়ে গিয়েছে। একজন আধা-দেশী আধা-বিলিতি পোশাক-পরা হিন্দু ছাত্র বলে উঠল : 'ও সব হলো 'ডবলু. টি.'র দল।'

সে কথায় কর্ণপাত না ক'র প্রভুদয়াল তাঁর সহযাত্রী বন্ধুকে জিজ্ঞেস করেন : 'কি বল হে, সঙ্গে নিয়ে যাওয়া যাক ?'

গণপত তাতে আপত্তি জানায় : বলে, 'জানা-নেই, শোনা-নেই, কোথাকার কে তাকে বাড়ি নিয়ে তুলবে কি হে ? বলি চোর-ছ্যাঁচোড়ও তো হতে পারে ? তবে কারখানাতে আমাদের একটা ছেলের দরকার হতে পারে, তুলসী,

মহারাজ, বোঙ্গা, ওদের সাহায্য করার জন্যে···এ-ধার ও-ধার যাওয়া···এটা-সেটা করা···আর দেখে মনে হচ্ছে, দু'বেলা দু'মুঠো খেতে দিলেই চলবে···মাইনে-টাইনে দিতে হবে না···'

গণপতের উপদেশ যে বিশেষ কার্যকারী হলো তা প্রভুদয়ালের মুখের ভাব থেকে ঠিক বোঝা গেল না। শেঠজী একটু স্নেহকোমলভাবেই মুন্নুকে জিজ্ঞেস করলেন: 'বলি ও মুন্নু না মুনড়ু, তুই আসবি আমাদের সঙ্গে? আমাদের কাছেই থাকবি। আমার বাড়ি হচ্ছে হামিরপুর···বিলাসপুরের কাছেই!'

মুন্নু কথা না বলে ঘাড় নেড়ে জানাল, তার আপত্তি নেই। কিন্তু মনে-মনে তার তখন ভয় এবং সন্দেহ দুই-ই ছিল। পালিয়ে আসবার পর থেকে, সে এক মুহূর্তের জন্যও ভাববার অবকাশ পায় নি, সে কি করবে বা করতে পারে···তার মনকে সারাক্ষণ ধরে জুড়ে ছিল শুধু এই দুশ্চিন্তা, যদি সে ধরা পড়ে!

মুন্নুকে নীরব দেখে, প্রভুদয়াল উৎসাহ দেবার জন্যে পিঠ চাপড়ে বলে: 'ভয় কি? আরে কাঁদতে আছে নাকি? চোখের জল মুছে ফেলো···সাহস ধরো! আমাদের সঙ্গে থাকবে, আমরা তোমার দেখা-শোনা করবো···উঠে পড়ো—এই তো দৌলতপুরের কাছ-বরাবর এসে পড়লাম!

নিজে একটু সরে দেহটাকে পাতলা ক'রে নিয়ে, শেঠজী একধারে মুন্নুর একটু বসবার জায়গা ক'রে দেন। হঠাৎ সেই অবস্থায় মুন্নুকে দেখে তাঁর মন সেই অসহায় বালকের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। মনে হয় তিনি যেন তার আত্মীয়—অজাত-শিশুর দাবি নিয়ে মুন্নু যেন তার পুত্রস্নেহ-বঞ্চিত-অন্তরে অনায়াসে প্রবেশ ক'রে গিয়েছে। কিন্তু একমাত্র ভাবনা, এই সম্পূর্ণ অজানা-অচেনা ছেলেটাকে পুত্র বলে গ্রহণ করা সম্ভব হবে কি না! মনে-মনে ভাবতে চেষ্টা করেন, এর মা-বাপ কি ধরনের লোক হতে পারে। নিশ্চয়ই গরীব। তার পরমুহূর্তেই নিজেকে বোঝাবার জন্য নিজেই ভাবেন, পাহাড়ী লোক মাত্রই তো গরীব! সেই সঙ্গে স্মরণ করেন তাঁর বাল্যকালের কথা, তাঁর মা-বাপের কথা, তাঁরাও তো গরীব ছিলেন। একদিন এই দৌলতপুর শহরে কুলিগিরি ক'রে তাঁকে দু'বেলা দু'মুঠো অন্ন সংগ্রহ করতে হয়েছে—মা-বাবা তাকে দু'বেলা পেট ভরে খাওয়াতে পারেন নি। আজ তিনি শেঠজী, দু-দুটো কারখানার মালিক—আজ যদি, তার মা-বাবা বেঁচে থাকতেন! আপনা থেকে শেঠজীর দীর্ঘশ্বাস

পড়ে, যা হবে না, অসম্ভব, তা ভেবে কি লাভ ? চিন্তাকে উপস্থিত-ক্ষেত্রে নিয়ে এসে ভাবেন, এ ছেলেটির অবস্থা আরও শোচনীয়, তার রোজগার করবার আগেই তার মা-বাবা তাকে ছেড়ে বিদায় নিয়েছেন। গণপত এসব জানবে কি ক'রে ? বড়লোকের ছেলে হয়েই সে জন্মেছে, মদে-মেয়েমানুষে-জুয়োয় পয়সা উড়িয়েছে—তার বাবা তাও খুইয়ে গিয়েছেন। প্রভুদয়াল আজও মনে-মনে আক্ষেপ করে, হায় পয়সার অভাবে আমি শত ইচ্ছা সত্বেও পড়তে পারলাম না—আর পয়সা দু'হাতে নষ্ট ক'রে এরা পড়াশোনার ধারেও গেল না—হয়ত ঠিক আমারই মতোন এই ছেলেটি মনে-মনে তাই আক্ষেপ করে—হয়ত পয়সার অভাবে সে-ও ইস্কুলে যেতে পারে নি। পাশ ফিরে শেঠজী জিজ্ঞেস করেন : 'তুমি খোকা ইস্কুলে পড়েছ কখনো ?'

'হাঁ, আমি তখন পঞ্চম শ্রেণীতে পড়ছিলাম, আমার চাচা আমাকে কাজ করবার জন্যে নিয়ে এল ইস্কুল ছাড়িয়ে।'

গণপত তখন তন্দ্রায় ঢুলছিল। ব্যঙ্গ ক'রে বলে ওঠে : 'তাহলে আর ভাবনা কি! তোমার হিসেবপত্র রাখতে পারবে!'

প্রত্যুত্তরে শেঠজী গম্ভীরভাবে বলেন : 'হ্যাঁ—আমিও তাই ভাবছি—আমাদের একজন কেরানী তো দরকার।'

গণপত বিজ্ঞের মতো বলে : 'তোমাকে সাবধান ক'রে দিচ্ছি—গোড়া থেকেই ছেলেটির মাথা ওভাবে খেয়ো না। পুঁথিপুত্তুর নেবে, মুনসী করবে—ওতো মাটিতে আর পা-ই ফেলবে না! কোথাকার কে, তার ঠিক নেই! একটা চোরও হতে পারে—গাঁটকাটার দলের লোকও হতে পারে!'

গণপত শেঠজীর ব্যবসার অংশীদার এবং ধনী—সেইজন্যে শেঠজী তাকে একটু ভয় ক'রেই চলতেন। তাই গণপতের শেষ সতর্কবাণীর উত্তরে তিনি শুধু একটু ক্ষীণ হাসলেন, কোন জবাব দিলেন না। কিন্তু সব সতর্কবাণী সত্বেও, তাঁর মন যেন আপনা থেকেই অপত্য-স্নেহে সেই অজানা-অচেনা বালকটির দিকে গড়িয়ে চলছিল।

ট্রেন তখন দৌলতপুরের উপকণ্ঠ ভেদ ক'রে এগিয়ে চলেছে। মুন্নু নীরবে জানলার কাছে এসে মুখ বাড়িয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকে—তার চোখের সামনে দ্রুত চলে যায় দৃশ্যের-পর-দৃশ্য—একটা ছবি ভালো ক'রে দেখতে-না-

দেখতে এসে পড়ে আর-একটা-ছবি—পাতকুয়োর ধারে মেয়েরা জল তুলছে, অর্ধ-নগ্ন দেহে পুরুষেরা স্নান করছে—কলা বাগান-ঘেরা মন্দির-মসজিদ—সোডা ওয়াটার ওয়ার্কস-এর কারখানা—বর্মা অয়েল কোম্পানীর বড়-বড় হরফে লেখা বিজ্ঞাপন—একটার-পর-একটা দ্রুত চলে যায়—ট্রেন যতই দৌলতপুরের দিকে এগিয়ে চলে মুন্নুর মনের কাঁপন ততই বাড়তে থাকে—আশা ও আতঙ্ক একসঙ্গে মিলে যেন ডানার ঝাপটা দিতে থাকে—ঠিক যেমনটি হয়েছিল যখন সে প্রথম আসে শ্যামনগরে।

স্টেশনে একটা ঢাকা গরুর গাড়ি ভাড়া করা হলো—তার ভেতর প্রভুদয়াল আর গণপতের মাঝখানে কোনরকমে মুন্নুর একটু জায়গা হলো—কেন না, আরও চারজন যাত্রী সেই গাড়িতেই উঠল। সুতরাং অন্তরের সমস্ত আগ্রহ সত্বেও সে বাইরের কোন কিছুই দেখতে পেল না—কখন যে দৌলতপুরের বাজার তারা পেরিয়ে এল, তা জানতেই পারল না। ক্রমে একটা ছোট্ট গলির মুখে গাড়িটা এসে থামল—বেড়াল খাকীর গলি, সেখানকার লোকে নাম দিয়েছে গলিটার। গলির মুখে খানকতক ছোট ছোট দোকান—মধ্যে ছোট রাস্তার দু'ধারে আবর্জনা আর আঁস্তাকুড়—পা ফেলবার জায়গা নেই—বাতাস যেন তারই দুর্গন্ধে ভারী—তারই মধ্যে দু'ধার থেকে গা-ঘেঁষে সরু-সরু লম্বা সব তেতলা বাড়ি।

প্রভুদয়াল আর গণপতের পিছু পিছু নীরবে মুন্নু সেই গলির ভেতর দিয়ে চলে আর দু'ধারে চেয়ে দেখে—আলুলায়িত-বাস স্ত্রীলোকেরা বাড়ির রোয়াকে বসে মাটির বাসনপত্র তৈরি করছে—দেখলেই বোঝা যায়, তারাও এসেছে পাহাড় থেকে নেমে—কুলি বউদের স্বামীরা দিনের বেলায় খাটতে বেরোয়··· তখন ঘরে বসে তারা এ-টা ও-টা তৈরি ক'রে দু'চার পয়সা বাড়তি রোজগারের চেষ্টা করে।

প্রভুদয়ালকে দেখে তাদের মধ্যে কেউ কেউ হাত জোড় ক'রে নমস্কার জানায়, পাহাড়ি বুলিতে কুশল-প্রশ্ন জিজ্ঞেস ক'রে: 'জয় দেব শেঠজী! ঘর থেকে ভালয় ভালয় ফিরে এলেন তা হলে? সেখানে লোকজন সব ভালো আছে তো?'

প্রভুদয়াল হাতজোড় ক'রে তাদের প্রত্যভিবাদন জানায়: 'তোমাদের আশীর্বাদে সবাই ভালো আছে।'

পাহাড়ী বুলি শুনে মুন্নুর মন যেন একটু আশ্বস্ত হয় ।

একটা প্রকাণ্ড দরজার ভেতর দিয়ে তারা একটা বাড়ির উঠোনে এসে দাঁড়াতেই বাড়ির ভেতর থেকে রাজ্যের মেয়ে এসে প্রভুদয়াল আর গণপতকে ঘিরে দাঁড়ায় —বুড়ীও আছে—তরুণীও আছে সে-দলে। কিন্তু সকলের মুখে এক কথা ঃ 'কি আনলে আমাদের জন্যে ?'

তাদের সকলের উত্তরে প্রভুদয়াল ঈষৎ হেসে আঙুল দিয়ে মুন্নুকে দেখিয়ে দেন—বলেন ঃ 'তোমাদের জন্যে মাত্র এই একটি জিনিস এনেছি।'

মুন্নু রীতিমতো বিব্রত হয়ে পড়ে।

সেখানে মুন্নু দেখে, একটি স্বল্প-দেহা নিরীহ নারীমূর্তি যেন তাদের জন্যেই অপেক্ষা করছিল—চোখে তার স্নিগ্ধ আলো, দীপ-শিখার মতোন যেন দুলছে— মুন্নুর মনে হলো, ইনিই বোধ হয় শেঠজীর স্ত্রী। ঈষৎ ম্লান বিবর্ণ—অতি ধীর-স্থির—কিন্তু মুন্নুকে দেখেই তিনি আকুল আগ্রহে হাত বাড়িয়ে তার দিকে এগিয়ে এলেন—সে-কে—কোথা থেকে এসেছে—কোন কিছুই জিজ্ঞেস করলেন না—কাছে এসে মধুর স্নেহে দু'হাত দিয়ে বুকের কাছে টেনে নিলেন এবং চিবুক ধরে এমন সহজভাবে মুন্নুকে আদর করতে লাগলেন যে এক নিমেষের মধ্যে মুন্নুর মনের সব আশংকা যেন মুছে গেল—এমনি ধারা জীবনে আসে এক-একটি মুহূর্ত, যার মধ্যে দিয়ে অনায়াসে গড়ে ওঠে একটা জীবনের সম্বন্ধ।

শেঠ-গৃহিণীর হাব-ভাব দেখে ব্যঙ্গস্বরে গণপত বলে উঠল ঃ 'চরণে পেন্নাম হই ভাবী।'

একান্ত সহজভাবে সেই অভিবাদন গ্রহণ ক'রে পার্বতী প্রত্যুত্তরে রসিকতা ক'রে উত্তর দিলেন ঃ 'তাহলে ভাইয়া এবারেও পাহাড় থেকে দেখে-শুনে একটা ভালো বউ নিয়ে আসতে পারলে না ?'

গণপত উত্তর দেয় ঃ 'না ভাবী—আমার বরাত মন্দ—তবে তোমার বরাত ভালো—তোমার জন্যে একেবারে একটা তৈরি ছেলে নিয়ে এসেছি।'

মুন্নুকে সস্নেহে জড়িয়ে ধরে পার্বতী বলে ঃ 'তা তো দেখছি।'

তার পর সে-কথা চাপা দেবার জন্যেই স্বামীকে লক্ষ্য ক'রে বলে ঃ 'খাবার তৈরি ক'রে রেখেছি। আমি বলি কি, আগে খাওয়া-দাওয়া ক'রে নাও—তার পর স্নান ক'রে বিশ্রাম করবে'খন। কেমন ?'

আড়ম্বরহীন সহজ স্নেহে প্রভুদয়াল বলেন : 'বেশ।'

দেয়ালে ঠেসান-দেওয়া একটা খাটিয়া টেনে নিয়ে, তার ওপর মালপত্রগুলো রেখে প্রভুদয়াল মুন্নুকে বসতে বলেন।

মুন্নু খাটের ওপর ব'সে ভাবে কারখানাটা তাহলে কোথায়।

এমন সময় পার্বতী তার সামনে এক গেলাস শরবত নিয়ে এসে ধরলেন। মুন্নু বিশ্বাস করতেই পারে নি যে, শরবত তার জন্যেই আনা হয়েছে এবং এনেছেন স্বয়ং শেঠ-গৃহিণী।

শরবত খাওয়া হয়ে গেলে পার্বতী মুন্নুকে স্নানের ঘরে নিয়ে গেলেন। স্নান সেরে আহার।

ভাত—ডাল—দু'তিন রকম তরকারি—পায়েস—তাদের গাঁয়ের রান্না, বহু-দিন মুন্নু যার স্বাদ পায় নি—তেঁতুলের চাটনি—সেই সঙ্গে শহরের রান্না দু'চারটে। জীবনে এরকমভাবে পেটভরে পরিতৃপ্তির সঙ্গে সে আর খায় নি।

উদর আজ পরিপূর্ণ—দেহ-স্নিগ্ধ-শান্ত—খাটিয়ার ওপর শুতেই ঘুমের অতলে যেন সে ডুবে গেল।

ঘুম ভেঙে যখন উঠল তখন বিকেল হয়ে গিয়েছে।

চেয়ে দেখে শেঠজী কাছে বসে হুঁকোতে তামাক খাচ্ছেন। মুন্নুকে ঘুম থেকে উঠতে দেখে তিনি বললেন : 'এবারে উঠে মুখ ধুয়ে কারখানায় যাও—ঐ যে জানালা দেখছ—ওর তলায় নিচের ঘরে কারখানা—ওখান থেকে তুমি নিজে নামতে পারবে না—ওখানে গেলেই কেউ-না-কেউ তোমাকে হাত ধরে নামিয়ে নেবে'খন।'

নির্দিষ্ট স্থানে গিয়ে নিচের দিকে চেয়ে দেখেই মুন্নুর দম আটকে এল। কিছু দূরেই অন্ধকার-বন্ধ-ঘরে দু'তিনটে বড় বড় উনুন জ্বলছে—সমস্ত জায়গাটা ধোঁয়ার অন্ধকারে যেন কালো হয়ে আছে—মাঝে-মাঝে সেদিক্ থেকে যখন বাতাস আসছে—মনে হচ্ছে যেন আগুনের হলকা—এর মধ্যে মানুষ কাজ করে কি ক'রে?

জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই নিচে থেকে এক বিরাটাকায় লোক তাকে তুলে ধরে নিচে নামিয়ে নিল। বিরাট দেহ—সর্ব অঙ্গে কালি-মাখা—মুখটা

দেখলে মানুষের চেয়ে জন্তুর কথাই বেশী মনে পড়ে···হাত-পা-বুক—সব জায়গাতেই যেন মাংস ফুলে শক্ত ইঁট হয়ে আছে···এমন বদ-চেহারার লোক মুন্নু এর আগে কখনো দেখে নি। লোকটার স্পর্শে তার দেহের মধ্যে কেমন তীব্র অস্বস্তি জেগে উঠল।

এমন সময় গণপতের কণ্ঠস্বর মুন্নুর কানে এল : 'ওকে ছেড়ে এখন কাজে চলে যাও মহারাজ!'

মুন্নু ভাবছে কি করবে, এমন সময় দেখে একটা ছোট ছেলে···বেঁটে-মোটা-সোটা, মুখখানা যেন কে কাদা দিয়ে লেপে দিয়েছে···কারখানায় ঢোকবার মুখে বসে রয়েছে···দুটো কটকটে লাল চোখ তুলে তার দিকে চেয়ে যেন কি বলতে চাইছে···মুন্নুর অস্বস্তি বেড়ে ওঠে···সে হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে।

ছেলেটা উঠে দাঁড়িয়ে তার কাছে এগিয়ে এসে তাকে যেন ধাক্কা মারল···মুখ হাঁ ক'রে কি যেন বলতে গেল···কিন্তু কথার বদলে কতকগুলো অস্পষ্ট বিকৃত আওয়াজ তার মুখের ভেতরে থেকে বেরিয়ে এল—মুন্নু অবাক হয়ে ভাবে, কি ব্যাপার?

অন্ধকারে এককোণে বসে গণপত তামাক খাচ্ছিল। মুন্নুর অবস্থা দেখে বলে উঠল : 'বুঝতে পারছিস না? বোঙ্গা তোকে বসতে বলছে—ও হাবা-কালা কি-না।'

ব্যাপারটা বুঝতে পেরে মুন্নু যেন ধাতস্থ হলো। আস্তে-আস্তে সে এগিয়ে গিয়ে উনুনের ধারে যেতেই দেখে একজন ভদ্রবেশী লোক—গায়ে বাবুদের মতোন শার্ট, মাথার চুল বাবুদের মতোনই আঁচড়ানো—একটা গর্তের মধ্যে মস্ত বড় কড়া থেকে গরম জলের মতোন কি যেন ঢালছে।

যেই আরও দু'এক পা এগিয়েছে অমনি লোকটি চিৎকার ক'রে উঠল : 'আরে আরে, গিধ্ধোড়—গাধা—করে কি?'

অমনি চারদিক্ থেকে লোক চিৎকার ক'রে উঠল : 'এই! এই! কোথাকার উজবুক—! পুড়ে মরবি নাকি?'

গণপত তাড়াতাড়ি ছুটে এসে ধমক দিয়ে বলে উঠল : 'এই শুয়োর—এ-দিকে ও-দিকে ঘুরঘুর করছিস কেন? মরবি! দেখছিস না, তুলসী এসেন্স তৈরি ক'রছে? একটু পরেই তোকে নিয়ে ও বেরুবে—যেখানে-যেখানে বিলি

করতে হবে, ওর সঙ্গে গিয়ে দেখে নিবি—বুঝলি ? কাল থেকে তোকেই বিলি করতে হবে দোকানে-দোকানে। আর যতক্ষণ তা না হচ্ছে, কারখানার মধ্যে ঘুরঘুর ক'রে অন্য লোকের কাজ-কর্ম পণ্ড করিস না—চুপটি ক'রে এক জায়গায় বোস—অভ্যেস কর ভদ্র হয়ে হয়ে বসে থাকতে—'

এই বলে একটা টুলের ওপর মুন্নুকে টেনে বসিয়ে দেয়।

'এতক্ষণ তো পথে-পথে না খেতে পেয়ে ঘুরে বেড়াতে, আর না হয়, ফাঁড়িতে বসে লপসী খেতে—দয়া ক'রে তোমাকে এখানে আমরা যে নিয়ে এসেছি—দয়া ক'রে সেটি যেন ভুলো না !'

স্তম্ভিত হয়ে সেখানে বসে মুন্নু চারদিকে চেয়ে দেখে। হঠাৎ তুলসীর জ্বলন্ত কড়া থেকে এক ঝলক গরম হাওয়া সোজা তার চোখে মুখে এসে লাগে চোখ যেন ঝলসে যায়।

সেই আধ-অন্ধকার—তপ্ত বদ্ধ হাওয়া—তার মধ্যে জ্বলছে বড়-বড় উনুন—উঠছে-নামছে বড়-বড় লোহার কড়া—মস্ত-মস্ত সব কাঠের পিপে তার মধ্যে মুন্নুর মনে হতে লাগল, সে যেন একান্তই নিরর্থক—ক্ষুদ্র—অপদার্থ—

চোখ রগড়াতে রগড়াতে মুন্নু দেখতে পেল, তার সামনেই তিনজন লোক তার দিকে আড়চোখে চেয়ে আছে। যেন তাদের দৃষ্টি বলতে চাইছে, তুমি আবার কে বাবা ? উড়ে এসে জুড়ে বসলে ?

মুন্নুর মনে হলো, সত্যিই সে যেন এখানে অনধিকার প্রবেশ করেছে। যতই সে-কথা ভাবে, ততই সে চঞ্চল হয়ে ওঠে।

যদি তার পাখা থাকত, এই মুহূর্তে এখান থেকে সে উড়ে চলে যেত।

ঠিক এমনি সময়ে শেঠ প্রভুদয়াল এসে পড়ায় যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচল।

'বলি ও মুন্নু, কোথায় রে ?'

সেই তপ্ত ধূম্রল অন্ধকারে চোখ টেনে-টেনে শেঠজী অনুসন্ধান করেন।

উত্তর দেয় গণপত : 'ঐ যে ওখানে বসে। হারামজাদা আর-একটু-হলে পুড়ে মরেছিল—তুলসী গরম জলের কড়া নামাচ্ছিল, সেখানে গিয়ে উনি ঘুরঘুর করছিলেন—'

সে-কথার কোন উত্তর না দিয়ে প্রভুদয়াল মুন্নুকে কাছে ডেকে নিয়ে বললেন : 'চলো আমার সঙ্গে—আমাদের যে-সব খদ্দের আছে, তাদের কাছে

আমি তোমাকে পরিচয় করিয়ে দিয়ে আসি। আর তা ছাড়া···ফেরবার সময় আমি মন্দিরে যাব···যেতে নিশ্চয়ই আপত্তি নেই তোমার।'

গণগত রাগে গরগর করতে করতে বলে ওঠে: 'এমনি ক'রেই তুমি সব চাকরগুলোর মাথা খাও!'

হিসেবের জাবদা খাতাটা কোলে তুলে নিয়ে প্রভুদয়াল হাসতে-হাসতে বেরিয়ে পড়ে।

মুন্নু আকুল আগ্রহে অনুসরণ করে।

এক চোখ দোকানের দিকে, আর-এক চোখ শেঠজীর দিকে—পাছে সেই গলি-ঘুঁজি আর মানুষের ভিড়ের মধ্যে সে হারিয়ে যায়—মুন্নু পরম আনন্দে শেঠজীর পেছন পেছন চলে।

কে একজন শেঠজীকে দেখে বলে উঠল: 'আরে শেঠজী—বলি ফিরলে কবে?'

শেঠজী সেখানে দাঁড়ায় কিছুক্ষণ। সেই অবসরে মুন্নু দু চোখ ভ'রে দু'দিকে যতদূর পর্যন্ত দেখা যায়—তন্ন তন্ন ক'রে সব দেখে—তার পাহাড়ী কৌতূহল যেন বেড়েই চলে। একটা দোকানের সামনে আসতেই মুন্নুর দৃষ্টি পড়ে—বাবা! কত রকমের যে শিশি-বোতল তার আর ইয়ত্তা নেই···

'লালাজী, এবার থেকে এই নতুন ছেলেটিই আপনার দোকানে জিনিসপত্তর নিয়ে আসবে···' এই বলে মুন্নুকে আগিয়ে ধরেন।

লালাজী গদির ওপর থেকে মুন্নুর ওপর একবার দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে বলেন: 'আচ্ছা, শেঠজী, আচ্ছা!'

হাতজোড় ক'রে নমস্কার জানিয়ে সেখান থেকে আবার চলতে আরম্ভ করেন শেঠজী। মুন্নু পিছু-পিছু চলে প্রভুভক্ত কুকুরের মতো।

এ-দোকান সে-দোকান ঘুরে সন্ধ্যার মুখে তাঁরা মন্দিরে এসে উপস্থিত হলেন। সেখান থেকে বাড়ি ফিরে মুন্নু সারাদিনের ঘটনা মনের মধ্যে নাড়াচাড়া করে। এ আর এক কোন্ বিচিত্র জগতে এসে পড়ল সে? মনে ভাবে যে-বাড়িতে এসেছি, সেটা তো ভালোই লাগছে। মনে হচ্ছে এখানে মনের সুখে ঘুরে-ফিরে বেড়াতে পারব···আমার অযত্ন এরা করবে না। কিন্তু কারখানায় আমি কি করব?

তবে বাইরে সে যে ঘুরে বেড়াতে পারবে, রোজ বাজারে যেতে পারবে তাতেই সে উল্লসিত হয়ে ওঠে। এই কয়েকঘণ্টা শেঠজীর সঙ্গে বেড়িয়ে সে কত না বিচিত্র জিনিস দেখে এসেছে···এত জিনিস মুন্নুর মনে হয়, দেখে শেষ করা যায় না। বোধহয়—শ্যামনগরে সে কি দেখেছে? তার চেয়ে ঢের বেশী—অদ্ভুত আশ্চর্য সব জিনিস! বেড়িয়ে ফেরবার সময়, তার হঠাৎ মনে পড়ে যায়, ইস্কুলের ভুগোলে সে পড়েছে দৌলতপুরের কথা—'উত্তর ভারতের একটি প্রধানতম শহর' —মনে পড়ে তার, হ্যাঁ, শ্রীরামচন্দ্র যখন অযোধ্যায় রাজত্ব করতেন, সেই সময় সেই প্রাচীনকালে দৌলৎ সিংহ নামে এক রাজপুত মহারাজা এই শহরের প্রতিষ্ঠা করেন—তার পর কত রাজা কত মহারাজা এখানে রাজত্ব ক'রে গিয়ে গিয়েছেন—আপনার মনে একলা বসে সে সেই-সব রাজাদের চিত্র কল্পনা করে—যেন রাস্তা দিয়ে তাঁরা চলেছেন সুসজ্জিত হাওদার ওপর চ'ড়ে—গলায় গজমতির মালা—জরীর পাগড়ীতে হীরে-মণি-মুক্তো সূর্যকরে করছে ঝলমল—

অতীতের স্বপ্নলোক থেকে নিজের ওপর দৃষ্টি পড়ে, নিজের অজ্ঞাতে দীর্ঘশ্বাস বুক থেকে বেরিয়ে আসে, ভাবে, যদি শেঠজী ট্রেন থেকে তুলে নিয়ে না-আসতেন তাহলে আজ হয়ত ট্রেনের মধ্যে না-খেয়ে পড়ে থাকতে হতো—

ভোর-না-হতেই ঘুমের ঘোরে মুন্নু শোনে তুলসী তার বাজখাঁই গলায় তাকে ডাকছে: 'মুন্নু—আরে—ওঠ—ওঠ'

মুন্নুর ঘুম ভেঙে যায়। বুঝতে পারে, তুলসী তার পায়ের বুড়ো আঙুল ধরে মোচড় দিচ্ছে ঘুম ভাঙাবার জন্য: 'ওঠ না!'—'বলি ওরে মুন্নু—ওঠ না।'

মুন্নু আস্তে-আস্তে চোখ খোলে!'

'আরো ওঠ ছোঁড়া—নইলে শেঠজী রাগ করবে!'

তুলসী তার নিজের বিছানা বগলে তুলে নেয়। মুন্নু উঠে দাঁড়ায়। জানালার কাছে এসে পৌঁছলে তুলসী বলে: 'আয়, তোকে ধরে নামিয়ে দিই!'

আজ আর তার প্রয়োজন হবে না। তাদের গাঁয়ে এর থেকে কত নিচুতে সে লাফ দিয়ে নেমেছে। অনায়াসে সে এক লাফ দিয়ে নিচে নেমে পড়ল।

একটা কাঠের তক্তার ওপর পাশাপাশি দুটো মাংস পিণ্ড শুয়েছিল? তুলসী গিয়ে ঠেলা দিয়ে ডাকল: 'এই মহারাজ—বোঙ্গা—ওঠ ওঠ রে।'

মুন্নু দেখে নিবিড় ঘুমের মধ্যে দু'জনে জড়াজড়ি ক'রে শুয়ে আছে, হস্তী-

মূর্খ মহারাজ—আর হাবা-কালা বোঙ্গা। মুন্নু চোখ বড় ক'রে তাদের দু'জনকে দেখে। তাহলে, ওরা দু'জনেই রোজ এখানে শোয়। ওদের থেকে মুন্নুর বরাত ঢের ভালো। সে শেঠজীর বাড়ির ছাতে শুতে পেয়েছে। সেখানে গণপত আর তুলসী শোয়। আর একটা ব্যাপারে মুন্নু নিজেকে আরও সৌভাগ্যবান মনে করে। ছোট হ'লেও তার নিজের আলাদা একটা বিছানা সে পেয়েছে। এই বিরাট সৌভাগ্য যে কার জন্যে সম্ভব হয়েছে, তা সে জানে। ঘুমুবার সময় সে শুনেছে শেঠজী আর পার্বতী তার সম্বন্ধেই কথা বলছিলেন। তাঁদের নাকি ইচ্ছা তাকে পোষ্যপুত্র ক'রে নেন। বাড়িতে পা দেওয়া থেকেই পার্বতীকে সে মনে-মনে ভালোবেসেছে। রাত্রিতে খাবার সময় পার্বতী তাকে রুটির সঙ্গে ক্ষীর খেতে দিয়েছিলেন। সেকথা সে ভুলতে পারে নি, কিন্তু মুন্নু মনে-মনে ভাবে, উনি এত চুপচাপ থাকেন কেন ? ক্বচিৎ কখনো তাঁর ম্লান বিবর্ণ মুখে একটুখানি হাসির রেখা দেখা যায়, তখন মুখটা কি সুন্দরই না দেখায়। কিন্তু সারাদিনের মধ্যে তাঁকে দু'একটা ছাড়া কথা বলতেই শোনে নি। মুন্নুর কেমন যেন ভয় করে তাঁর সঙ্গে কথা বলতে···লজ্জাও যে করে না, তা নয়।

তুলসী তখন একটা লোহার হাতার মতোন জিনিস নিয়ে একটা উনুন থেকে ছাই তুলছিল। মুন্নুকে ডেকে বলে : 'সামনের ঐ উনুন থেকে ছাইগুলো তুলে ফেল।'

মুন্নু দ্বিরুক্তি না ক'রে উনুনের কাছে এগিয়ে যায় এবং উনুনের মুখের ভেতর দিয়ে ভেতরে সটান হাত ঢুকিয়ে দেয়।

'উঃ···উহ্···বাবা রে···'

মুন্নু ছিটকে পেছনে লাফিয়ে পড়ে···যন্ত্রণায় তার মুখ এক নিমেষের মধ্যে যেন বেঁকে যায়—মুঠো ক'রে ছাই তুলতে গিয়ে ছাই-এর মধ্যে একটা জ্বলন্ত কয়লা সে চেপে ধরেছে। তুলসীর উচিত ছিল তাকে সাবধান ক'রে দেওয়া, কিন্তু সে তা করে নি। তাই নিজের ত্রুটি ঢাকবার জন্যে সে বলে ওঠে : 'দূর মুখ্যু! ও সয়ে যাবে—দু'দিন করলেই সব সয়ে যাবে!'

মুন্নু তখন যন্ত্রণায় হাত মোচড়াতে থাকে, কাজ করবার মুখেই এই রকম একটা বাধা পেয়ে তার মনটা মুষড়ে পড়ে। তুলসী হাসতে হাসতে বলে :

'আয়, আয়, সেরে গেলে আর কিছু থাকবে না। দুদিন পরেই দেখবি সব

ঠিক হয়ে গিয়েছে···কোন অসুবিধে হচ্ছে না—তুই বোকা, তাই খালিহাতে ছাই তুলতে গেছিস। একটা কিছু যোগাড় করে নে—লোহার কিংবা টিনের—তাই দিয়ে ছাই তুলবি—বুঝলি? ঐ দেখ, ওখানে ওটা কি রয়েছে।'

কারখানায় ঢোকবার মুখে একটা পুরনো টিনের ভাঙা ক্যানাস্তারা পড়েছিল, তুলসীর নির্দেশ অনুযায়ী মুন্নু সেটা তুলে নিয়ে আবার ছাই তুলতে আরম্ভ ক'রে দিল।

এমন সময় কারখানার গর্তের উপরের জানালায় গণপতের মুখ দেখা গেল।

'কি—এখনও দেখছি উনুন জ্বালা হয় নি?'

সে-কথার উত্তরে তুলসী মুন্নুকে তাড়া দিয়ে বলে উঠল: 'শিগগির কর মুন্নু।'

এইভাবে ওপরওয়ালাদের নির্দেশকে কারখানার কুলিদের ওপর হুকুম রূপে চালাতে তুলসীর অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল। এবং সেই জন্যে কারখানায় এক-রকম ফোরম্যান সর্দারের মতো সে হয়ে উঠেছিল।

তুলসীর হুকুমে মুন্নু আরও তাড়াতাড়ি ছাই তুলতে শুরু করে। কথার আওয়াজ থেকে সে বুঝেছিল গণপত জানালার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। ইতি-মধ্যেই সেই ঘোড়ামুখো লোকটিকে সে ভয় করতে আরম্ভ ক'রে দিয়েছে, যেমন ভয় সে করতো শ্যামনগরে তার ভূতপূর্ব মনিবানী এবং তার চাচীকে। ছাই তুলতে-তুলতে সে ভাবে আমার বরাতটাই এইরকম। যদিও এখানে ভালো আশ্রয় পেলাম কিন্তু এই একটা পাজী লোকের জন্যে বোধহয় সব নষ্ট হয়ে যাবে। তবে ভরসা···যারা আমার আসল মনিব তাঁরা আমাকে রীতিমতো ভালোবাসেন···শেঠজীর স্ত্রী রাত্রিতে রুটির সঙ্গে আমাকে ক্ষীর দিয়েছিল···

এমন সময় ক্ষীরের চিন্তা ভেঙে দিয়ে তুলসী হুকুম করে: 'ছাইগুলো তুলে এবার ঐ গর্তের ভেতর ফেলে দে। তুলসী নিজে তখন উনুন ধরাবার চেষ্টা করছিল।

জানালার ওখানে দাঁড়িয়ে হাই তুলতে-তুলতে গণপত জিজ্ঞেস করে: 'মহারাজ আর বোঙ্গা কোথায়? তারা কি এখনও ওঠে নি নাকি?'

তুলসী চিৎকার ক'রে ওঠে: 'ওরে মহারাজ···এই বোঙ্গা···ওঠ রে···ওঠ···'

'দাঁড়া, আমি নিজে যাচ্ছি!' এই বলে গণপত সেখান থেকে নেমে সোজা মহারাজ আর বোঙ্গা যেখানে শুয়ে ঘুমুচ্ছিল সেদিকে অগ্রসর হয়।

'এত বেলা হয়ে গেল—কারখানার লোকজনের দেখা নেই—এখনও পর্যন্ত প'ড়ে-প'ড়ে ঘুমুচ্ছেন লাটসাহেবরা— ! যে ক'দিন এখানে ছিলাম না, খুব মজা ক'রে নিয়েছে সবাই—কারখানা যে কি ক'রে চলতো তাই ভাবি—দায়িত্ব নিয়ে কাজ করবার একজনও লোক নেই—যাদের জাতের ঠিক নেই তাদের কিছুরই ঠিক নেই—' তক্তার কাছে গিয়ে সে চিৎকার ক'রে উঠে : 'এই আঁস্তাকুড়ের কুকুরের দল —ওঠ্—ওঠ—'

বোঙ্গা চোখ রগড়াতে-রগড়াতে উঠে পড়ল কিন্তু মহারাজ যেমন অসাড় পড়েছিল তেমনি পড়ে রইল।

মহারাজকে দু'হাত দিয়ে ঠেলে গণপত চিৎকার ক'রে ডাকে : 'এই হাতির বাচ্চা—ওঠ্।'

নিদ্রালু মাংস-পিণ্ডের ভেতর থেকে ঘুমে-জড়ানো আওয়াজ এল : 'এই যে, উঠছি হুজুর !' কিন্তু পরক্ষণেই আবার চুপ্চাপ—ওঠবার কোন লক্ষণই দেখা যায় না।

কাছেই একটা কাঠের টুকরো পড়েছিল। সেটা তুলে নিয়ে সেই ঘুমন্ত মাংসপিণ্ডের ওপর বেশ কয়েক ঘা দেবার পর দেখা গেল, ফল ফলেছে। রক্ত-বর্ণ চোখ খুলে মহারাজ উঠে বসল। এবং ঘন ঘন হাই তুলতে লাগল। মনিবের কাষ্ঠপ্রীতি যে তার অঙ্গে বিশেষ কোন বেদনার সঞ্চার করেছে, তার ভাবগতিক দেখে তা বোঝা গেল না।

প্রভাতে উঠেই দ্রুত অঙ্গ-সঞ্চালনের ফলে গণপত হাঁপিয়ে উঠেছিল।

'রোদে সারা দেশ পুড়ে যাচ্ছে আর তুমি শুয়োর পড়ে-পড়ে ঘুমুচ্ছো ?' হাঁপাতে-হাঁপাতে গণপত গর্জ্জন ক'রে ওঠে : 'কাঠ না হলে কি কাঠের ঘুম ভাঙে ? ফের যদি দেখি এত বেলা পর্যন্ত শুয়ে নাক ডাকাচ্ছো, তাহলে এরপর হাড় গুঁড়ো ক'রে দেবো !'

এইভাবে কারখানারকে জাগিয়ে তুলে দরজার দিকে ফিরতেই মুন্নুর চোখে চোখ পড়ে গেল। মুন্নু ভয়-সংকিত দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে ছিল—তার চোখ ঝাপশা হয়ে এসেছিল।

'এখানে দাঁড়িয়ে হাঁ ক'রে দেখছিস কি ? কাজ নেই ? যদি কারুর সঙ্গে এখানে দলে ভেড়ো—তা হ'লে তোমারও ভাগ্যে এই রকম জুটবে—নিজের যা

কাজ মুখ বুজে তা ক'রে যাবে নইলে এই চ্যালা কাঠ তোমারও পিঠে ভাঙব, বুঝলে ?'

এমন সময় দরজার বাইরে থেকে কড়া নাড়ার আওয়াজ এল। গণপত নিজেই এগিয়ে গেল দরজা খুলে দেবার জন্যে, কুলি-কামিনরা আসছে।

দাঁড়া, দাঁড়া, বুড়ো শালিকের দল !'

দরজা খুলতেই প্রথমে লাচী এসে ঢুকল—ছোট্ট মোটা-সোটা, গড়ন-পিটন মন্দ না। গণপতকে দেখেই মুচকে হাসতে-হাসতে মুখ ঘুরিয়ে বলে উঠল : 'কি ভোর না হতেই মার-ধোর আরম্ভ করেছ তো ? কোথায় এখন ঠাকুর-দেবতার নাম নেবে, না, গালাগাল আর মার-ধোর !'

লাচীর পেছনে আরও দু'জন কামিন এসে ঢুকল। মাথার চুল সাদা—দীর্ঘ দিনের পরিশ্রমে শরীর গিয়েছে বেঁকে। মুখে উপবাস, আর অনশনের দীর্ঘ রেখা।

'রাম ! রাম ! শেঠজী !'

লাচীকে দেখে গণপতের উষ্মা নিমেষের মধ্যে যেন উড়ে গেল—কোন কথার আর জবাব না দিয়ে তার জায়গায় এসে হুঁকো কল্কের বন্দোবস্ত করতে বসে গেল।

লাচী এগিয়ে এসে তুলসীকে ডেকে বলল : 'এই তুলসী, আমাদের পিদিমে তেল নেই, তেল দিয়ে দে !'

তারা যেখানে বাস কাজ করে দিনের বেলাতেও সেখানে সূর্যের আলো এসে পেঁছোয় না।

তুলসী তখন উনুন ধরাবার জন্যে শুকনো কাঠের ওপর কেরাসিন ঢেলে আগুন জ্বালাবার চেষ্টা করছে।

লাচীর কথা উত্তর গণপতই দেয় : 'যা, যা, কাজে বসগে যা। সব হচ্ছে—'

ছিলিম তৈরি ক'রে গণপত হুঁকোতে মুখ দেয়।

মুন্নুর যেন দম আটকে আসে। গণপতকে যত দেখে তত যেন তার শ্বাস-রোধ হয়ে আসবার মতোন হয়—এত কাছাকাছি এই কষাই-এর মতোন লোকটার কাছে দাঁড়িয়ে থাকতে তার শরীর যেন ঘিনঘিন্ করে।

মুন্নুর দিকে দৃষ্টি পড়তেই গণপত আবার চিৎকার ক'রে ওঠে : এই শুয়োরের বাচ্চা, দাঁড়িয়ে রইলি যে ? আরও দুটো যে উনুন পড়ে রয়েছে, তা থেকে ছাই তুলবে কে ?'

লাচী এগিয়ে এসে ঝঙ্কার দিয়ে ওঠেঃ 'রাতদিন ওদের পেছনে লেগে আছিস কেন রে হারামী? ওঠ—কোথায় আপেল আছে, গুণে দিবি চল্, নইলে এখুনি তো বলাবি যে আমি চুরি করেছি!'

হুঁকো হাতে গণপত নিঃশব্দে উঠে গিয়ে একটা কুঠুরীতে ঢোকে।

মুন্নু নিঃশব্দে উনুনের ধারে গিয়ে ছাই তুলতে থাকে। সেই অল্প কয়েক মিনিটের মধ্যে তার মন যেন অচল হয়ে আসে—সে কিছুই ভাবতে পারে না।

কারখানায় কাজ শুরু হয়ে যায়।

ভিজে অন্ধকারের সঙ্গে স্যাঁতসেঁতে মাটির গন্ধ—ধোঁয়া—পচা ফলের দুর্গন্ধ—সর্ষের তেল—নানান রকমের মসলার ঝাঁজ সবসুদ্ধ মিলে একটা বিচিত্র বিস্বাদ বাতাস তার নাকে এসে লাগে—ভাবে, অসম্ভব জায়গা—হয়তো কয়েক-দিন পরেই সব সয়ে যাবে—এই তো এরা সবাই কাজ করছে—এরাও তো তার মতো একদিন পাহাড় থেকে এসেছিল।

হঠাৎ জ্বলন্ত উনুনের দিক থেকে একটা চাপা গরম হাওয়ার ঝলক তার চোখে-মুখে এসে লাগে—ভেঙে যায় দিবা-স্বপ্ন—

সেই সঙ্গে সামনের কুঠুরী থেকে একটা ঝাঁঝালো গন্ধ এসে সোজা তার নাকের ভেতরে ঢোকে—নাকের ভেতর দিয়ে গলায় গিয়ে কুটকুট করতে থাকে। বহু চেষ্টা ক'রেও সে কাশি দমন করতে পারে না—কাশতে শুরু করে। কাশতে-কাশতে তার নিজের কানে তালা লেগে যায়। সেই অবস্থায় সে শুনতে পায় কাশতে কাশতে আর-একজন কার যেন দম আটকে যাচ্ছে অথচ সেই অবস্থায় চিৎকার ক'রে গালাগাল দিচ্ছে—কথা আর কাশিতে মিশে জড়াজড়ি হয়ে যাচ্ছে।

'শুয়োরের বাচ্চা—হারামজাদার দল—এই প্রভুদয়াল। এই বেজন্মা—'

মুন্নু কান খাড়া ক'রে শোনে। সেই কাশি আর আওয়াজ থামার সঙ্গে সঙ্গেই আর-একটি কণ্ঠস্বর স্পষ্ট হয়ে ওঠে—গলার আওয়াজ থেকে মুন্নু আন্দাজ করে, নিশ্চয়ই কোন স্ত্রীলোকের গলা—

'মরণ হয় না তোদের? অখদ্যে অলপ্পেয়ে নেমক-হারামের দল। যত সব পাহাড়ী চাষা? আস্তাকুঁড়ের জঞ্জাল—মর্-না-মর্—ওরে বাবা—মরে গেলাম—ধোঁয়া—ধোঁয়া—ঐ ধোঁয়ায় কবে পুড়ে মরবি তোরা? ঘোর-দোর জ্বালিয়ে

দিলো—এই সেদিন বাড়ি ঘর-দোর চুনকাম করেছি গো—ধোঁয়ায় সব জ্বালিয়ে দিলো—জ্বালিয়ে দিলো গো—সেই সঙ্গে জ্বলে মর্ না তোরা—'

হঠাৎ মুন্নুর মনে হয় একি তার ভূতপূর্ব মনিবানীর কণ্ঠস্বর ? সে কি স্বপ্ন দেখছে ? ভালো ক'রে চেয়ে দেখতে গিয়ে ধোঁয়ায় সে কিছুই দেখতে পায় না। ধোঁয়ায় পর্দার আড়ালে তুলসীর আবছা চেহারা চোখে পড়ে। মনে হলো জিজ্ঞেস করে : 'কে চিৎকার করছে।'

তুলসী যেন বুঝতে পেরে তার কাছে এসে কানের কছে চুপি চুপি বলে : 'চুপ !'

বাইরে তখন রায় বাহাদুর, স্যার টোডরমল বি.এল., এল. এল. বি. উকিল, সিটি মিউনিসিপ্যাল কমিটির সদস্য চিৎকার করছেন। 'বলি কোথায় রে প্রভুদয়াল ? গণপত ?'

তাঁর কণ্ঠস্বর থামতে-না-থামতে আবার গর্জে ওঠে সেই নারী-কণ্ঠ—লেডী টোডরমল : 'কোথায় তারা ? কোথায় গেল নেমক-হারামেরা ?'

এবার আর একটা নতুন কণ্ঠস্বর বেজে উঠল—স্যার টোডরমলের যুবক-পুত্র মিঃ রামনাথ : 'বলি সাড়া দিচ্ছিস্ না কেন হারামজাদারা ? এদিকে বেরিয়ে আয়—রায় বাহাদুর যে ডাকছেন, খেয়ালই নেই। হয় আজ এর একটা বিহিত করবো, নয় কালই এখান থেকে তোদের তুলবো !'

সমস্ত কারখানা নীরব নিস্তব্ধ। শুধু আধ-অন্ধকারে ধোঁয়াগুলো কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠছে-নামছে-ঘুরছে।

এইবার শুরু হয় প্রত্যুত্তর।

গণপত পাঁচিলের কাছে এগিয়ে এসে চিৎকার ক'রে বলে : 'যাও—যাও—রায় বাহাদুর আছো তো নিজের বাড়িতে আছ—যা পারো কোরো—'

মিঃ রামনাথ গর্জন ক'রে ওঠে : 'বটে ! ভালো কথা মনে ধরল না ? ওখান থেকে চেঁচাচ্ছিস্ কেন শুয়োরের বাচ্চা ? বাপের বেটা হোস তো বাইরে বেরিয়ে আয়—দেখিয়ে দিচ্ছি কি করতে পারি—'

পুত্রকে শান্ত ক'রে লেডী টোডরমল বলেন : 'ওদের সঙ্গে কথা বলে নিজের মান নষ্ট করার কি দরকার ! সত্যিই তো, ছোটলোকদের সঙ্গে কথা বলাই আমাদের ভুল হয়েছে !'

এইখানেই ব্যাপারটা সেদিনকার মতো শেষ হয়ে যেতো···কারণ স্যার টোডরমল তখন স্ত্রী-পুত্র নিয়ে বেড়াতে বেরুচ্ছিলেন···টোঙ্গা অপেক্ষা করছিল! কিন্তু শেষ হতে দিল না গণপত!

সে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়ে, রামনাথ সেই টোঙ্গায় উঠতে যাবে অমনি তাকে টেনে ধরে ধাক্কা মেরে ফেলে দিল।

পতনোন্মুখ পুত্রকে ধরবার চেষ্টা করতে করতে স্যার টোডরমল চিৎকার ক'রে উঠলেন: 'এতবড় আস্পর্ধা! বটে?'

লেডী টোডরমল আর্তনাদ ক'রে উঠলেন।

মিঃ রামনাথ ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়ে গণপতের গলার জামা মুঠো ক'রে ধরে তাকে বেশ ক'রে বুঝিয়ে দিল যে পয়সা খরচ ক'রে দিনের-পর-দিন বিদ্যা হিসেবে সে বক্সিং শিক্ষা করেছিল।

কি করবে ভেবে ঠিক করতে না পেরে মুন্নু, তুলসী, বোঙ্গা—সকলে বাইরে ছুটে এল।

গণপত মুখ গুঁজে নর্দমায় পড়ে গিয়েছিল। কোন রকমে উঠে দাঁড়িয়ে প্রতিশোধ নেবার ব্যর্থ চেষ্টায় সে রামনাথকে আক্রমণ করল, কিন্তু ঘুষি পেরিয়ে সে তার কাছে পেঁছুতেই পারল না। হঠাৎ একটা ঘুষি সোজা তার নাকের ওপর লাগাতে নাক ফেটে রক্ত পড়তে লাগল!

স্যার টোডরমল তখন বাড়ির দরজার ভিতর গিয়ে দাঁড়িয়েছেন, রাগে এবং উত্তেজনায় তাঁর সর্বশরীর কাঁপছে! রক্ত দেখে তিনি বলে উঠলেন: 'ছেড়ে দে, ছেড়ে দে রামনাথ!'

এধারে আশে-পাশের বাড়ির জানালার পুর-মহিলারা পর্দা সরিয়ে আতঙ্কিত বিস্ময়ে সেই দৃশ্য উপভোগ করছিলেন।

হঠাৎ মুন্নু তুলসী আর বোঙ্গাকে ঠেলে প্রভুদয়াল সামনে এগিয়ে গিয়ে দাঁড়াল···দু'হাত দিয়ে গণপতকে পেছনে সরিয়ে দিয়ে একেবারে রামনাথের সামনা-সামনি গিয়ে বলে উঠল: 'আপনি আমাকে মারতে পারেন, যা খুশী করতে পারেন, করুন বাবুজী। কিন্তু ওকে কেন? ও কি মানুষ! একটা অজ-মুখ্-খু।'

অবস্থা বুঝে লেডী টোডরমল পুত্রকে ডেকে নেবার জন্যে বলে উঠলেন:

'চলে আয়! কি দরকার ওদের গায়ে হাত তুলে হাত ময়লা করার। ছোট লোক —দু'টো পয়সার মুখ দেখে ধরাকে সরা জ্ঞান করছে!'

সে-কথার কোন জবাব না দিয়ে গণপতকে টানতে-টানতে কারখানার ভেতর নিয়ে এসে প্রভুদয়াল বলে: 'এভাবে লড়াই করা চলে না, বুঝলে গণপত···ওদের সঙ্গে যুঝতে হলে যুঝবে অন্যরা, আমাদের বাড়ির মালিক···আমরা নই···উত্তম-মধ্যম খেলে তো যা কতক—'

রাগে, ক্ষোভে, অপমানে ঘোড়ামুখোর মুখ দিয়ে তখন কোন কথা বেরুচ্ছে না। দু'হাত দিয়ে কুলিদের ঝটকা মেরে সরিয়ে সে ভেতরে ঢুকে পড়লো। অপমানের জ্বালাটা কুলিদের ওপরই প্রথম ধাক্কায় গিয়ে পড়ে।

প্রভুদয়াল বলে: 'ঠাণ্ডা হও। ও ভাবে রাগের হাতে নিজেকে ছেড়ে দিতে নেই।'

ঝগড়ার সময় গণ্ডগোলে মুন্নু দুটো পিপের মাঝখানে কাদায় পড়ে যায়—তুলসীর হাঁটু ছড়ে যায়···বোঙ্গা গর্তের মধ্যে পা পিছলে পড়ে।

কারখানায় ফিরে যে-যার কাজে আবার লেগে যায়।

মুন্নুকে ডেকে প্রভুদয়াল বলে: 'তুই একবার বাড়ির ভেতর যা···তোকে ডাকছে।'

হঠাৎ তাকে কেন ডাকা হচ্ছে, বুঝতে না পেরে মুন্নু শেঠজীর মুখের দিকে ফ্যালফ্যাল ক'রে চেয়ে থাকে—শেঠজী ডান হাতটি মুখের কাছে এনে ইঙ্গিত ক'রে জানায় বাড়ির ভেতর তার জন্যে কিছু সু-খাদ্যের বন্দোবস্ত আছে।

মুন্নু আনন্দে সব ভুলে যায়।

গণপতের সঙ্গে স্যার টোডরমলের পুত্র মিঃ রামনাথের এই যে একটা ছোটো-খাটো যুদ্ধ হয়ে গেল, প্রভুদয়াল তার স্বাভাবিক শান্তিপ্রিয়তার দরুন ভেবেছিল, রায় বাহাদুরের কাছে পরে হাত ধরে মিটমাট ক'রে নিলেই চুকে যাবে, কিন্তু স্যার টোডরমল ব্যাপারটাকে অত সহজে ছেড়ে দিতে চাইলেন না। ভারত সরকারের অন্তরঙ্গ মহলে তাঁর রীতিমতো খাতির এবং প্রতিপত্তি আছে। তিনি এতে সহজে ছেড়ে দেবেন কেন?

দীর্ঘ কুড়ি বছর কাল ধরে স্যার টোডরমল দৌলতপুর আদালতে বিপুল বিক্রমে আধিপত্য ক'রে এসে সরকারের সুনজর অর্জন করেন। আদালতে তাঁর

কেরামতিকে ভারত-সরকার স্বীকার করলেন দৌলতপুরের সরকারী উকিলের পদে তাঁকে নিযুক্ত ক'রে। সে-পদ থেকে যদিও বহুদিন হলো তিনি অবসর গ্রহণ করেছেন, তবুও সরকার মহলে তাঁর খাতির বিন্দুমাত্র কমে নি, কারণ যুদ্ধের সময় তিনি বহুবার সরকারের কাজে বহু সাহায্য করেন এবং বড়লাটের ফাণ্ডে কুড়ি হাজার টাকা দান করেন। আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষণের দুরূহ কর্তব্য-পালনে তিনি একনিষ্ঠ সাধকের মতো যে-ভাবে সরকারের অনুজ্ঞা পালন ক'রে এসেছেন, তার স্বীকৃতিস্বরূপ ভারত-সরকার তাঁকে রায় বাহাদুর উপাধিতে ভূষিত করে। যুদ্ধের সময় সরকারের কাজে তিনি যে-ভাবে নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছিলেন, তার কৃতজ্ঞতার চিহ্ন স্বরূপ ভারত-সরকার তাঁকে ভারত সাম্রাজ্যের নাইট-কমাণ্ডারদের সুনির্বাচিত দলে স্থান ক'রে দেয়। আর তাঁর নাগরিক কর্তব্যবোধের দরুন স্থানীয় মিউনিসিপ্যাল কমিটির মনোনীত সভ্যের আসন তাঁর জন্যে নির্দিষ্ট হয়। সুতরাং এহেন উপাধিধারী ব্যক্তিকে দৌলতপুরের নিরীহ জনসাধারণ যে একজন মহাপুরুষ ব'লে মেনে নেবে তাতে আর সন্দেহ কি? যদিও তাদের মধ্যে অধিকাংশ লোকেই জানে না মিউনিসপ্যাল কমিটিই বা কি আর নাইট-কমাণ্ডারই বা কাদের বলে।

গত রাজনৈতিক দাঙ্গাহাঙ্গামার সময় স্যার টোডরমল সপরিবারে দৌলতপুর দুর্গের ভেতর গিয়ে আশ্রয় নেন, তার ফলে অবশ্য কেউ-কেউ তাঁকে বিশ্বাস-ঘাতক বলে গালাগাল দিয়েছে। কিন্তু ভক্তি করুক আর নাই করুক, সকলেই তাঁকে ভয় করতো এবং যখন তিনি তাঁর মান্ধাতা আমলের টাঙ্গাখানিতে মক্ষিকা উপদ্রুত অতি-বৃদ্ধ পক্ষীরাজকে জুড়ে শহরের মধ্যে দিয়ে হাওয়া খেতে বেরুতেন, তখন লোকের মনের ভেতর যাই থাকুক না কেন, তাঁর সামনাসামনি পড়লে হাত জোড় ক'রে "নমস্তে রায় বাহাদুর" জানাতে ভুল করতো না। স্যার টোডরমল তাদের সেই ভক্তি-প্রদর্শনের আড়ালে তাদের আসল মনোভাবের পরিচয় যে জানতেন না তা নয়, এবং তবুও যে তিনি তাদের মধ্যে বাস করতেন, তার একমাত্র কারণ হলো তাঁর যে তিনখানি বাংলো শহরের বাইরের সাহেব-পাড়ায় ছিল, সে তিনখানিই তিনি সরকারী-মহলে বড় সাহেবদের ভাড়া দিয়েছিলেন এবং তা থেকে মাস গেলে বেশ মোটা টাকাই পেতেন। তা ছাড়া লেডী টোডরমল লেখাপড়া জানতেন না—সেই জন্যে সাহেব-পাড়ায় সাহেব প্রীতি-

বেশীদের মধ্যে বাস করার সম্ভাবনায় তিনি বিচলিত হয়ে উঠতেন। এবং রায় বাহাদুরের গৃহিণী হিসেবে এখানে পাড়ার মেয়েদের ওপর যে আধিপত্য তিনি চালাতেন, সেখানে তা সম্ভব হবার আশা খুবই কম ছিল। তবে এক বিশেষ অসুবিধার কারণ হয়ে উঠলো প্রভুদয়ালের এই চামড়ার কারখানা। কিন্তু যখনি তিনি উঠে যাবার চেষ্টা দেখিয়েছেন, তখনই পাড়ার লোকেরা হুজুরের হাতে-পায়ে ধরাধরি করেছে—এতবড় একজন লোকের আওতায় তারা বাস করার সুযোগ পেয়েছে, সে-সুযোগ থেকে তারা বঞ্চিত হবে কেন? তাই আর সে-পাড়া ছেড়ে তাঁদের ওঠা হয় নি। কারখানা তুলে দেবার জন্যে কারখানার বাড়ির মালিক দত্তদের তিনি বার বার অনুরোধ করেছেন, কিন্তু দত্তরা সে-অনুরোধ রাখতে রাজী হয়নি। একটা পোড়ো এঁদো বাড়ি থেকে মাসে মাসে যদি কিছু টাকা পাওয়া যায় তো তারাই বা ছেড়ে দেবে কেন। তাই যখনি সুযোগ পান স্যার টোডরমল চেষ্টা করেন ভয় দেখিয়ে, হুমকি দিয়ে কারখানা-ওয়ালাদের বিতাড়িত করতে। তাঁরই, এই চেষ্টার ফলে সেদিন খণ্ডযুদ্ধ ঘটে গেল। অথচ একটা চিমনী তৈরী ক'রে নিলেই যে এ সমস্যার সমাধান হয়ে যায়, তা কোন পক্ষেরই মগজে আসে না।

তাই সেদিনকার ঘটনার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ স্যার টোডরমল স্থির করলেন ব্যাপারটা সেখানেই নিষ্পত্তি করলে চলবে না—পাবলিক হেলথ্ অফিসর ডাঃ এডোয়ার্ড মার্জরিব্যাঙ্কস্ যেহেতু তাঁর বিশেষ বন্ধু এবং মিউনিসিপ্যাল কমিটিতে তাঁর সহকর্মী—তিনি ব্যাপারটা তাঁর দৃষ্টিগোচর করবেন এবং তাঁর সহায়তায় ছোট লোকদের এবার রীতিমতো শিক্ষা দিয়ে দেবেন।

ভালো ক'রে মুসাবিদা ক'রে তিনি ইংরেজী ভাষায় বন্ধুকে একখানি পত্র লিখলেন:

পত্রখানি অনুবাদ করলে এই রকম দাঁড়ায়:

"ডাঃ এডোয়ার্ড মার্জরিব্যাঙ্কস্ এসকোয়ার, এম. এ., ডি. পি. এইচ., এল. আর. সি. পি., এম. আর. সি. এস. এণ্ড এফ. (অক্সোন) সমীপেষু,

নিবেদক রায় বাহাদুর স্যার টোডরমল বি. এ. এল. এল. বি., কে. সি. আই. ই., এ্যাডভোকেট, হাইকোর্ট, পাঞ্জাব; অবসরপ্রাপ্ত পাবলিক প্রসিকিউটর, দৌলতপুর।

মান্যবরেষু,

পত্র-বিনিময়ের দ্বারা মানুষের সঙ্গে মানুষের অন্তরের আত্মীয়তা রক্ষা করিবার এবং অন্তরের প্রীতি ও শ্রদ্ধা নিবেদন করিবার যে রীতি বন্ধু-সমাজে প্রচলিত আছে, আমি জানি সে-রীতি যথোপযুক্তভাবে পালন না করিয়া আমি ঘোরতর অন্যায় করিয়াছি এবং সে-অন্যায়ের মাত্রা এমন গুরুতর যে তাহার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিবার অধিকার পর্যন্ত আমার নাই। সেই জন্য, অদ্য এই পত্রযোগে পুনরায় আপনার মহৎ সকাশে উপস্থিত হইতে আমি বিশেষ লজ্জাই অনুভব করিতেছি। তথাপি একান্ত আন্তরিকতার সহিত আপনার সমীপে নিবেদন করিতেছি যে মিউনিসিপ্যাল কমিটির ভিতরে কিংবা বাহিরে যেখানেই আপনি অবস্থান করুন না কেন, আমার অন্তরের অন্তরতমস্থলে আপনার নাম ও স্থান আমার সর্বশ্রেষ্ঠ বন্ধুরূপে চিরমুদ্রিত হইয়া আছে।

অতঃপর আপনাকে আমন্ত্রণ জানাইতেছি, আপনি আপনার মহানুভবতায় যদি একবার আমাদের এই বিড়াল-খাগী নামে পরিচিত গলিতে পদার্পণ করেন, তাহা হইলে সচক্ষেই দেখতে পাইবেন, আমার বাড়ির সংলগ্ন এক চাটনির কারখানা হইতে পাথুরে কয়লার ধোঁয়া এতদঞ্চলে কি অনর্থই না সৃষ্টি করিতেছে।

গত ২৬শে তারিখের সূর্যোদয়ের অব্যবহিত পরেই আমার পুত্র যখন উক্ত কারখানার মালিককে এই ধোঁয়ার উৎপাত সম্বন্ধে দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে যায়, সেই সময় কে একজন গণপত কারখানার ভেতর হইতে আসিয়া শ্রীমানকে আক্রমণ করে। যদিও আমার বীরপুত্র মুষ্ঠ্যাঘাতে উক্ত গণপতের নাসিকাগ্রভাগ নিম্নমুখী করিয়া দিয়াছে, তথাপি সংঘর্ষের দরুন শ্রীমানও গুরুতররূপে জখম হইয়াছে, শরীরের স্থানে স্থানে কালশিরা পড়িয়া গিয়াছে এবং আঙুল এখনও আড়ষ্ট রহিয়াছে।

সরকারের খেদমতে অধীনের সেবার কথা আপনার অবিদিত নাই। মহামান্যবর বড়লাটের সমর-তহবিলে আমি এককালীন বিশ সহস্র মুদ্রা দান করি— এবং তাহার বিনিময়ে আমি মহা-গৌরবান্বিত নাইট উপাধি লাভ করিয়াছি। অশেষ মঙ্গলময় ভারত-সাম্রাজ্যের প্রতি আমার আনুগত্যের কথা স্মরণ করিয়া আশা করি আপনি আমাকে এই ধূম্র-উৎপাতের হস্ত হইতে রক্ষা করিবেন।

জানিবেন, ইহা আমার ও আমাদের বিশেষ দুঃশ্চিন্তা, দুর্ভাবনা এবং বেদনার কারণ হইয়াছে।

মিসেস মার্জরিব্যাঙ্কসকে আমার স্ত্রীর বিনীত সালাম জানাইবেন।

ইতি—

আপনার একান্ত চির-অনুগত ভৃত্য

'টোডরমল'

॥ চার ॥

কিন্তু এ হেন চিঠি হেলথ অফিসার সাহেব গ্রাহ্যই করলেন না।

স্যার টোডরমল যখন দেখলেন ডাক্তার মার্জরিব্যাঙ্কস তাঁর পত্রের উত্তরও দিলেন না, গলি-পরিদর্শনেও এলেন না, তখত আহত-অভিমানে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন। সামনের সেপ্টেম্বর মাসে মিউনিসিপ্যাল কমিটীর যে সাধারণ অধিবেশন বসার কথা আছে, তার জন্যে স্যার টোডরমল উৎসুক অপেক্ষায় রইলেন।

সেদিন প্রাতঃকালেই তিনি তাঁর সহিসকে পাশে নিয়ে বড় গাড়িটা হাঁকিয়ে বেড়াতে বেরুলেন। টাঙ্গা ছাড়া রায় বাহাদুরের আর-একটা গাড়ি ছিল, সেটা বিশেষ-বিশেষ দিনে ব্যবহার করতেন। সরকারী বাগানে একটু হাওয়া খেয়ে তিনি টাউন হলের দিকে রওনা হলেন কারণ সেইখানেই সাধারণ অধিবেশন বসবে।

পাছে সভায় পৌঁছুতে দেরি হয়ে যায়, সেই আশঙ্কায় তিনি টাউন হলে পৌঁছে দেখলেন সভা বসবার একঘণ্টা আগে এসে গিয়েছেন।

সেপ্টেম্বর মাসে তখন সকাল থেকেই সূর্যের তেজ রীতিমতো প্রখর। তার ওপর ভেতরে তিনি রাগে জ্বলছেন। ভেতরের আর বাইরের গরমে রীতিমতো ঘর্মাক্ত হয়ে তিনি টাউন হলের বারাণ্ডায় পায়চারি ক'রে বেড়াতে লাগলেন।

ঘড়িতে দশটা বাজতেই তিনি সভা-গৃহে প্রবেশ করলেন।

ঘরে ঢুকে দেখেন, ঘর শূন্য···তিনি একাই উপস্থিত। আধ ঘণ্টা ধরে সেই একা ঘরে তিনি বসে রইলেন। তবুও কেউ আসে না। এক ঘণ্টা বসে থাকার পর দেখেন, ঘরে দ্বিতীয় প্রাণী প্রবেশ করছে, কমিটির পিয়ন। ঘরে ঢুকে সে চেয়ার টেবিলের ধুলো ঝেড়ে পরিষ্কার করতে লাগল।

তারও আধঘণ্টা পরে প্রবেশ করল কমিটির সেক্রেটারী, হেমচাঁদ বি. এ. (ক্যান্টাব)—তরুণ যুবা, চোখে পাতলা চশমা। ঘরে ঢুকে রায় বাহাদুরকে দেখেই সে মাথা নত ক'রে অভিবাদন জানালো। মিউনিসিপ্যাল কমিশনার দেখলেই তার মাথা আপনা থেকে নিচু হয়ে যেতো কারণ সে জানতো কমিশনারদের কৃপার ওপরেই তার চাকরি নির্ভর করছে।

পকেট থেকে রুপোর চেন বাঁধা সোনার ঘড়িটা বের ক'রে একবার দেখে নিয়ে স্যার টোডারমল বিরক্ত হয়ে বলে উঠলেন: 'সাড়ে-এগারোটা বাজে··· অথচ কারুর দেখা নেই।'

হেমচন্দ্র তখন তার ছোট্ট টেবিলের কাছে বসে গত সভার বিবরণী তাড়াতাড়ি লিখে শেষ করতে লেগে গিয়েছে। স্যার টোডরমলের উত্তরে ঘাড় তুলে জানায়— 'আপনি তো জানেন। লালাদের রকম-সকম। সময়ের জ্ঞান যাদের নেই, তারা কি ক'রে শিখবে স্বয়ত্ত-শাসন, বলুন?'

মিউনিসিপ্যাল কমিটিতে কমিশনার হয়ে যারা আসে, তাদের স্যার টোডরমল বেশ ভালো করেই জানেন···অধিকাংশ হলো দোকানদার···ব্যবসা ক'রে কিছু পয়সা করেছে···কিন্তু নাম-সই করার বিদ্যা তাদের কারুরই নেই··· সরকারি কাগজপত্রে সই করতে হলে, তারা বুড়ো আঙুলের ছাপই ব্যবহার করে এবং সভায় যেসব জিনিস আলোচনা করা হয়, তার বিন্দুবিসর্গও তারা বোঝে না, বুঝতে চায় না। সে সূত্রে চিন্তা করতে করতে হঠাৎ স্যার টোডরমল আতঙ্কিত হ'য়ে ওঠেন, দত্তদের বিরুদ্ধে তিনি যে অভিযোগ নিয়ে আসবেন, তার গুরুত্ব তারা কি তাহলে বুঝতে পারবে? শুধু দত্তদের বিরুদ্ধে নয়, আজ তিনি স্বয়ং হেলথ্ অফিসারের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনবেন···বাড়িতে তিনি রীতিমতো মুসাবিদা ক'রে এক কড়া বক্তৃতা মুখস্থ ক'রে এসেছেন···বর্তমান হেলথ্ অফিসারকে সরিয়ে নতুন একজন যোগ্যতর ব্যক্তিকে আনতে হবে···এই পঞ্জাবী লালারা কি তাঁর সব যুক্তি বুঝতে পারবে? তবে ওপর, তাঁর বক্তৃতা তিনি তৈরি করেছেন হিন্দুস্থানীতে···তারা কি তা ভালো বুঝতে পারবে? রীতিমতো চিন্তিত হয়ে পড়েন স্যার টোডরমল।

এমন সময় হঠাৎ হেমচাঁদ তাঁকে ডেকে নিয়ে বলে: 'দেখুন, ডাঃ মার্জরি-ব্যাঙ্কস্ আমাকে আপনার চিঠিটা দেখিয়েছেন···ঐ যে আপনাদের পাড়ায়

চাটার্জির কারখানার ধোঁয়ার উৎপাত সম্বন্ধে···তাঁর অবশ্য সময় কম···আর এ ধরনের তদারকে তিনি একদমই যান না···তবে তিনি বলেছেন, আপনার খাতিরে আপনার সঙ্গে একবার যেতে পারেন। অবিশ্যি, আমি দেখছি, স্বায়ত্তশাসন-বিধির ৩৯৭ ধারার ১০নং উপধারায়···'

স্যার টোডরমল হেমচাঁদকে শেষ করতে না দিয়ে বলে ওঠেন : 'দেখুন আজকের সভায় আমি একটা প্রস্তাব আনবো···আপনি আজকের কর্মসূচীতে সেটা লিখে নিন···বর্তমান হেলথ্ অফিসারের বিরুদ্ধে অভিযোগ···'

'শুনুন···শুনুন···রায় বাহাদুর! এসব ব্যাপারে এই মিউনিসিপ্যাল সভায় আলোচনা করা আপনি তো জানেন স্যার, যাকে বলে অসম্ভব। অধিকাংশ সদস্য হলো সরকারের ধামা-ধরা, তারা আইনই বলুন···আর নাগরিক বিজ্ঞানই বলুন···তার কিছুই ধার ধারে না। লালা চিরঞ্জীবলাল তিন ঘণ্টা ধরে আবোল-তাবোল বকবেন···শেখ ইফতিখারউদ্দীন দাড়ি নেড়ে নেড়ে এক ঘণ্টা ধরে যা তা গালাগাল দেবেন···সর্দার খড়্গ সিং বাকি সময়টা উচ্ছ্বাস করবেন···আপনার প্রস্তাবে ভোট দেবার সময়ই পাবেন না। আসল কথা কি জানেন একজন ইংরেজ হেল্থ অফিসর, তাকে সরাতে কেউ চাইবে না···আর সরকার স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থাই তুলে দেবে যদি দেখে তার উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথে অন্তরায় ঘটছে। তাই আমি যা বলছি শুনুন, ডাঃ মার্জরিব্যাঙ্কসকে আমি অনুরোধ করব, সভা হয়ে গেলে তিনি আপনার সঙ্গে গিয়ে একবার তদারক ক'রে আসবেন। আপনিও সরকারের একজন বন্ধু লোক···বুড়ো বয়সে একজন ইংরেজের সঙ্গে ঝগড়া ক'রে আপনার কোন সুবিধা হবে?'

সেক্রেটারীর যুক্তি স্যার টোডরমল অন্তরে গিয়ে লাগল···সত্যিই তো, প্রকাশ্যভাবে এইসব অপ্রিয় ব্যাপার আলোচনাতেই বা কি লাভ সেক্ষেত্রে যদি ভালোয় ভালোয় মিটে যায়, মন্দ কি! তাই হেমচাঁদের উপদেশের উত্তরে জানালেন : 'বেশ, ভালো কথা···'

একজন ইংরেজের পাশে বসে, মাথা উঁচু ক'রে তিনি পাড়ায় ঢুকছেন··· পাড়ার লোকেরা চোখ বড় ক'রে তার দিকে চেয়ে আছে বিস্ময়ে ও সম্ভ্রমে···এক নিমিষের মধ্যে স্যার টোডরমল সেই মহাদৃশ্য কল্পনা ক'রে নিলেন। মনে মনে, ইংরেজকে ভারত থেকে তাড়াতে চাইলে কি হবে, ইংরেজের পাশে দাঁড়াতে

পেলে, আজও পর্যন্ত আমাদের অনেকের দেহের মধ্যে বিদ্যুৎ শিহরণ জেগে ওঠে···

স্যার টোডরমল প্রীত হয়েই বললেন : 'বেশ, তাই হোক!' তখন হেমচাঁদ গিয়ে ডাঃ মার্জরিব্যাঙ্কস্‌কে ডেকে নিয়ে এল।

'গুড মর্নিং স্যার টোডরমল। আপনার চিঠির উত্তর দিতে সময় পাইনি বলে বড়ই দুঃখিত···লাহোর চলে গিয়েছিলাম জিমখানার হয়ে পোলো খেলবার জন্যে।'

নিজের আভিজাত্যের কথা ভুলে গিয়ে স্যার টোডরমল বেয়ারাদের মতোন ঘাড় হেঁট ক'রে সাহেবকে প্রত্যভিনন্দন জানান।

'আসুন, আমার গাড়িতে···আনকোরা নতুন ফোর্ড···আমার স্ত্রী হোম থেকে এই সবে মাত্র আনিয়েছেন···নিশ্চয়ই আপনার পছন্দ হবে···'

ডাঃ মার্জরিব্যাঙ্কস্‌ স্যার টোডরমলকে আমন্ত্রণ করেন। এই আমন্ত্রণের পেছনে অবশ্য সাহেবের অন্য উদ্দেশ্য ছিল। তিনি চান না স্যার টোডরমলের ঘোড়ার গাড়িতে তাঁর পাশে বসে যান, যত সব "নিগার" তাঁর দিকে চেয়ে হাঁ ক'রে থাকে।

নিজের গাড়িতে সাহেবকে পাশে নিয়ে বীরগর্বে পাড়ায় ঢুকবেন বলে যে আশার ফানুস মনে মনে ওড়াচ্ছিলেন, এক নিমেষে তা ফেটে চুপসে গেল। কি আর করা যাবে? স্যার টোডরমল সাহেবের মোটরে গিয়ে ঢুকলেন। সাহেব তাঁর পাশে এসে বসলেন।

ড্রাইভার সাচ্ছা সিং জিজ্ঞেস করল : 'রায়সাহেবের বাড়ি হুজুর?'

'হাঁ।'

কিন্তু কিছু দূর গিয়েই সাহেব বুঝল যে, এই গাড়ি নিয়ে তো সে-গলির ভেতর ঢোকা যাবে না। অগত্যা একান্ত বিমর্ষ অন্তরে গলির মুখেই তাঁকে নেমে পড়তে হলো। সঙ্গে সঙ্গে একদল ছেলে তাদের পিছু পিছু চলতে শুরু ক'রে দিল। কেউ কেউ আবার কাছে এসে ভিক্ষা চায়। চাপা রাগে সাহেবের লাল মুখ আরও লাল হয়ে ওঠে।

গলিতে ঢুকতেই দু'ধারে রয়েছে যত রাজ্যের ময়লা, ছেঁড়া ন্যাকড়া, ভাঙা কলসী, পরিত্যক্ত উচ্ছিষ্ট খাবার, পচা ইঁদুর, গোবর···সাহেবের পা ফেলে চলতে

যেন কাঁটা ফুটছিল।

তার ওপর আবার স্যার টোডরমল সেদিকেই দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়ে বলে উঠলেন : 'দেখুন স্যার, লক্ষ্য করুন, মিউনিসিপ্যালিটির ঝাড়ুদাররা কি রকম কাজের গাফিলতি করে!'

ঠিক সেই সময় সামনের এক বাড়ি থেকে চুড়ি-পরা দুটি হাত একরাশ নোংরা জিনিস ছুঁড়ে রাস্তায় ফেলে দিল…একেবারে সাহেবের গা ঘেঁষে গিয়ে পড়ল। সাহেব রাগে ঠোঁটে ঠোঁট চেপে চলতে লাগলেন।

কিন্তু কয়েক পা যেতে-না-যেতে আর-এক বিপত্তি ঘটল। সামনের এক বাড়িতে দোতলার পাইপ ফেটে গিয়েছিল…সেই ফাটা পাইপ থেকে ঝরনার মতো জল রাস্তায় নির্বিবাদে এসে পড়ছে…সাহেব কোনরকমে পিছু হটে আত্মরক্ষা করলেন…মনে মনে তখন অভিশাপ দিচ্ছিলেন, এই ভারতবর্ষ…এই নরক…

'এই যে স্যার, আমার বাড়ি…আর এই সেই কারখানা…'

বাড়ির সামনে এসে তাঁরা দাঁড়িয়ে পড়েন।

চারদিকে চোখ বুলিয়ে নিয়ে সাহেব বলেন : 'আই সী!'

লেডী টোডরমল বাড়ির ভেতর থেকে দেখতে পেয়ে তাড়াতাড়ি দরজার কাছে চলে আসেন। মুখে ওড়নাটা টেনে দিয়ে শেঠজীর বাড়ির দিকে মুখ ক'রে তিনি চেঁচিয়ে বলে ওঠেন : 'কই…কোথায় গেলি…এবার আয়, বেরিয়ে আয়!'

ডাঃ মার্জরিব্যাংকস্ কারখানার দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়েন।

দরজার গোড়াতে ভেতর দিকে মুন্নু বসেছিল। হঠাৎ একজন সাহেবকে আসতে দেখে, সে দাঁড়িয়ে বলে উঠল : 'গুড্ নুন!' এইটুকু ইংরেজী শ্যামনগরে সে ছোটবাবুর কাছে শিখেছিল…সকালে, দুপুরে, সন্ধ্যায় ও রাত্রিতে কি ক'রে সাহেবদের অভিবাদন জানাতে হয়! সুযোগ বুঝে সে কাজে লাগিয়ে দিল।

হঠাৎ একটা অর্ধ নগ্ন নেটিভ ছেলের মুখ থেকে সেই বিচিত্র অভিবাদন শুনে সাহেব প্রথমে একটু অবাক হয়েই গিয়েছিলেন। তবে অভ্যাসবশতঃ উত্তরে বললেন : 'গুড্ মর্ণিং।'

উঠোনের চারদিকে বিক্ষিপ্ত পিপে, কলের ঝুড়ি…বড় বড় লোহার কড়া… সাহেব সেখানে দাঁড়িয়ে যতদূর সম্ভব দেখলেন…ঘামে তাঁর ভেতরের জামা ভিজে

উঠছিল···রুমাল বার ক'রে ঘন ঘন মুখ মোছেন···কিন্তু একবারও রুমাল চোখের ওপর নিয়ে যান না···ছেলেবেলায় তিনি পেনী-সিরিজের রোমাঞ্চকর সব ডিটেকটিভ কাহিনীতে ভারতবর্ষের এই নিগার ছেলেদের কথা পড়েছিলেন··· যে-কোন সময় পেছনের জনতার ভয়ে সাহেব চোখের ওপর রুমাল নিয়ে যেতে পারছিলেন না···যদি ঐ ডার্টি নিগারদের মধ্যে থেকে কেউ···

হঠাৎ পাশ থেকে কিসের শব্দ হতে সাহেব ঘুরে দাঁড়ান।

প্রভুদয়াল সাহেবের সামনে এগিয়ে আসে। তাকে দেখে সাহেব বহু তাচ্ছিল্যে-শেখা ভুল হিন্দুস্থানীতে জিজ্ঞেস করেন: 'তুমি···মাস্টার···এখানকার?'

ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে প্রভুদয়াল বলে: 'হাঁ জনাব।'

তারপর স্যার টোডরমলের দিকে চেয়ে সাহেব বলেন: 'অল রাইট রায়-বাহাদুর! আমি দেখব···আমি কি করতে পারি···এই সব ডার্টি লোক···আমি চাই না···পথ আটক ক'রে থাকে···পারেন না তাড়িয়ে দিতে?'

স্যার টোডরমল জনতার দিকে চেয়ে গর্জন ক'রে ওঠেন: 'যাও···যাও···'

তারপর নিজের হাতের ছড়িটা ঘোরাতে ঘোরাতে সাহেবের পথ ক'রে দিয়ে তিনি সাহেবকে আগিয়ে নিয়ে চলেন।

সাহেব পিছন ফিরতেই, মুন্নু দুষ্টুমী ক'রে বলে উঠে: 'গুড্—আফটার—নুন্ সাহেব!'

হঠাৎ সেই অপরিচিত কণ্ঠস্বরে সাহেব ভ্রূকুটি ক'রে ফিরে তাকান কিন্তু মুন্নুকে ইংরেজীতে বলতে দেখে সাহেব হেসে ফেলেন।

ধুলো উড়িয়ে গাড়ি অদৃশ্য হয়ে যায়।

॥ পাঁচ ॥

প্রভুদয়াল ভীত, সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। নিশ্চয়ই সাহেব জেল দিয়ে দেবে। তাড়াতাড়ি কারখানার ভেতরে গিয়ে দুটো ভালো বোতলে সে নিজে হাতে চাটনি পুরে মুন্নুর হাতে দেয়। তারপর মুন্নুকে সঙ্গে নিয়ে নিজে চলে লেডী টোডরমলের কাছে। বেশীদূর যেতে হয় না, লেডী টোডরমল তখন দরজার সামনেই বৈঠকখানা ঘরে দাঁড়িয়ে শুনিয়ে শুনিয়ে বলছিলেন: 'এইবার দেখি কি করতে পারি! বড় বাড় বেড়েছিল···এখন এমন নাচন নাচাব যে···'

প্রভুদয়াল কোন ভূমিকা না ক'রে নত হয়ে লেডী টোডমলের চরণে মাথা রেখে ব'লে ওঠে: 'মাপ করুন মা···এবারটির মতো আমাদের মাপ করুন! আপনার জন্যে এইটুকু এনেছি···দয়া ক'রে গ্রহণ করুন!'

এই বলে চাটনির বোতল দুটো তাঁর পায়ের কাছে রেখে দেয়।

ঠিক সেই সময় স্যার টোডরমল সাহেবকে আগিয়ে দিয়ে ফিরে আসছিলেন ···পাড়ার সকলকে তিনি দেখিয়ে দিয়েছেন তিনি যে-সে লোক নন্···বড়-বড় সাহেব তাঁর হাত ধরা···সেই গর্বে তাঁর বৃদ্ধ দেহে যেন নতুন শক্তির সঞ্চার হয়েছে···

ঘরে ঢুকেই প্রভুদয়ালকে দেখে রাগে জ্বলে ওঠেন: 'এই যে পাজী, বদমায়েশ! এখানে এসেছ কি জন্যে? আদালতে সবাইকে দেব ঝুলিয়ে, তার পর···'

লেডী টোডরমল বাধা দিয়ে বলেন: 'যাক্ গে, যা হবার হয়ে গিয়েছে। হাজার হোক্, একটা মানুষকে জেলে পাঠিয়ে আমাদের আর কি লাভ হবে!'

প্রভুদয়াল হাঁফ ছেড়ে বাঁচে···তার স্পষ্ট ধারণা হয়ে গিয়েছিল যে, স্যার টোডরমলের কথায় সাহেব নিশ্চয়ই তাকে জেলে পুরে ফেলবে!

সকলের চেয়ে খুশী হলো মুন্নু···তুলসী, বোঙ্গা, মহারাজকে সে বুক ফুলিয়ে জানায়···সাহেবদের সঙ্গে তার যে শুধু জানাশোনা আছে তাই নয়, তাদের ভাষাও সে জানে! সকলের সামনে সে তা দেখিয়েছে আজ!

কালক্রমে কারখানায় জীবন ধারার সঙ্গে মুন্নু নিজেকে খাপ খাইয়ে নেয়।

কিন্তু সে-জীবন অন্ধকারময়···ভালো লাগে না তার।

শোয় গভীর রাত্রিতে···সম্পূর্ণ ক্লান্ত পরিশ্রান্ত হয়ে।

তবে সে এখন কাজের লোক। ভোর থাকতে কারখানায় ঢুকে সে প্রথমে উনুনগুলো পরিষ্কার করে, তারপর তুলসী এলে দু'জনে মিলে উনুন জ্বালায়। রোজ উনুন জ্বালাবার সময় তারা উৎকর্ণ হয়ে থাকে প্রতিবেশীরা কেউ চিৎকার ক'রে উঠছে কি না শোনবার জন্যে। চাটনি, মোরব্বা, এসেন্স ঘুষ দিয়ে প্রভুদয়াল তাদের ঠাণ্ডা ক'রে রাখে বটে কিন্তু কে জানে, কখন আবার সে-সব ভুলে গিয়ে তারা চিৎকার ক'রে উঠবে!

ঘোড়া-মুখো তেমনি সকাল থেকে সকলকে উদ্ব্যস্ত ক'রে তোলে, তবে

রামনাথের ঘুষিতে ইদানীং তার আর সে রুদ্র প্রতাপ নেই। অনেক ঠান্ডা হয়ে গিয়েছে। এমনকি মাঝে মাঝে সকাল বেলা প্রভুদয়ালের সঙ্গে সে মন্দিরেও যায়। মন্দিরে থেকে পুজো সেরে ফিরতে বেলা হয়ে যায়, তার পর সে বেরোয় অর্ডার সংগ্রহের জন্য। সেই জন্যে কারখানাতে তাকে আর বেশীক্ষণ দেখতে পাওয়া যায় না। তবে যে-কোন মুহূর্তে সে এসে পড়তে পারে এবং তখন যদি কাউকে দেখে, গল্প করছে বা বসে আছে, তার রক্ষা আর নেই। সেই জন্যে মুন্নু সর্বদাই সতর্ক হয়ে থাকে। ঘোড়া-মুখোকে সে রীতিমতো ভয় করে।

তবে ইদানীং সে যেন কেমন গম্ভীর হয়ে গিয়েছে। হাসি-ঠাট্টা বা গল্প সে কারুর সঙ্গেই করে না। সকাল বেলা যখন সে ঘুম থেকে ওঠে, তার মনে হয় কি একটা যেন দুঃখ পাষাণের মতো তার বুকে চেপে আছে। তখন মনিব বা মনিবানী, কারুর সঙ্গেই দেখা করতে মন চায় না। তার ভয় হয়, যদি তাঁরা আদর করেন, দুটো স্নেহের কথা বলেন, তাহলে সে হয়তো আর নিজেকে ধরে রাখতে পারবে না, হয়ত সেই পাষাণের ভারে একেবারে ভেঙে পড়বে।

সন্ধ্যাবেলাতেও ঠিক এমনি কি এক অজানা অনির্দেশ্য দুঃখভার তাকে পেয়ে বসতো। সে চঞ্চল হয়ে উঠত অন্তরের সেই চাঞ্চল্য লুকোতে গিয়ে সে আরও ম্লান হয়ে পড়ত।

শুধু একটি ব্যাপারে তার মনের এই পাষাণভার যেন মন থেকে নেমে যেত···অন্তরঙ্গ কথাবার্তার মধ্যে দিয়ে যখন সে অনুভব করত, এইসব কারখানার কুলি মজুর···এদের সঙ্গে কোথায় যেন নিঃশব্দে গড়ে উঠেছে এক নিবিড় আত্মীয়তা···

এইভাবে গ্রীষ্ম চলে গিয়ে এল শীত। মুন্নু এখন কারখানার সেই আধ-অন্ধকারে স্পষ্ট দেখতে পায় কোথায় কি আছে···আজ আর তার চোখে সে অন্ধকারে ধাঁধা লাগে না। গ্রীষ্ম চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কারখানার ভেতরকার আবহাওয়া বদলে গেল। সেই বায়ুহীন বদ্ধ গহ্বরে বাতাস আজ আর তপ্ত অগ্নির কণা নয়···শীতের দিনে উনুনের আঁচে ভালোই লাগে হাত পোয়াতে··· উনুনের ধারে মুন্নু চুপটি ক'রে বসে বসে দেখে আগুনের খেলা···রক্ত আলো তার গায়ে পড়ে সারা গা লালচে করে দেয়। দেখতে দেখতে তার মনে হয়, সেই

আগুনের সঙ্গে যেন তার অন্তরের বন্ধুত্ব হয়ে গিয়েছে···দিনের আলোর বিবর্ণ দেহকে আগুন যেন ভালোবেসে রাঙিয়ে দিয়েছে···তার ভাবতে ভালো লাগে, সে-রঙ বুঝি আগুনের নয়, তার নিজের দেহেরই···পরিপূর্ণ স্বাস্থ্যের বহিঃপ্রকাশ···সে-আঁচ যেন তার দেহ ভেদ ক'রে মনের ভেতর গিয়ে লাগে···বড় দরকার তার সেই আগুনের আঁচের—তপ্ত স্পর্শের···

শীতান্তে এল বসন্ত। মুন্নুর মন যেন আনন্দে সজীব হয়ে উঠল। ভোর না-হতেই ঝুড়ি-ঝুড়ি সব আম আসতে থাকে···কাঁচা, পাকা, ডাঁশা—মনে করিয়ে দেয় তার গাঁয়ের কথা—দুপুর বেলা অপরের বাগান থেকে আম চুরি করার ধুম। সকাল থেকে কুলিরা বস্তা বস্তা আম নিয়ে এসে জড় করে, লাচী আর তার দলের বুড়ীরা বসে যায় ছাড়াতে।

মুন্নু ভাবে, ঘোড়া-মুখো কখন কারখানা থেকে বাইরে যাবে—সে একটু প্রাণ খুলে ঘুরতে-ফিরতে পাবে, আমের ঘরে গিয়ে একবার ঢুকবে। মুন্নু কেন, কারখানার সবাই সেই এক চিন্তাই করত, কখন গণপত বাইরে বেরুবে!

আম দেখে মুন্নুর মনে দুরন্ত লোভ জেগে ওঠে···এ লোভ তার ছেলেবেলা থেকেই আছে। সে কি জানত, তার জন্যে তাকে বিষম বিপদে পড়তে হবে একদিন···

যেই গণপত বেরিয়ে যেত মুন্নু আমের ঘরে গিয়ে আম বাছতে আরম্ভ ক'রে দিত···কিন্তু পাকা আম তখনও আসে নি, তাই তারই মধ্যে বেছে যেগুলোতে একটু রং ধরেছে বোধ হতো সেগুলো সরিয়ে খেয়ে ফেলত একটার-পর-একটা। এক হাতে আম···আর-এক হাতে কাজ···

কাঁচা আমের রসে দাঁত টকে যায়···সির্ সির্ করতে থাকে···তবুও এমনি আমের লোভ, মুন্নু থাকতে পারে না। ক্রমে সর্দি লেগে যায়···চোখ ফুলে ওঠে।

ঘোড়া-মুখোর বুঝতে দেরি হয় না, কাঁচা আম চুরি ক'রে খাওয়ার ফলেই সর্দিতে চোখ ফুলে উঠেছে।

একদিন ঘুম থেকে উঠে মুন্নু দেখে কিছুতেই যেন চোখ খুলতে চায় না, এমন ভারী হয়ে আছে! এমন সময় ঘোড়া-মুখো কোথা থেকে এসে তার গালে এক চড় বসিয়ে দিল। কি হলো বোঝবার আগেই, গণপত গুণে গুণে আরও চারটি ভারী ওজনের চড় দু'গালে মেপে বসিয়ে দিল।

মন্নু চিৎকার ক'রে কেঁদে উঠল। সে-কান্না শুনে প্রভুদয়াল তাড়াতাড়ি নেমে এল। ব্যাপারটা বুঝতে পেরে গণপতের আক্রমণ থেকে তাকে রক্ষা করার জন্যে হাত ধরে টেনে নিয়ে বলে: 'মুখখু। কাঁচা আমগুলো ওভাবে না খেয়ে দু'-একদিন খড়ের মধ্যে রেখে দিয়ে খেলেই তো পারতে···তাহলে আর শরীর খারাপ হতো না!'

মন্নু ফুঁপিয়ে কাঁদে।

গণপত চিৎকার ক'রে ওঠে: 'এইভাবে তুমি ছেলেটার মাথা খেয়েছ··· চোর ক'রে তুলেছ।'

মন্নুকে সেখান থেকে টানতে টানতে বাইরে নিয়ে গিয়ে প্রভুদয়াল বলে: 'এখন চল ডাক্তারের বাড়ি···চোখে একটা ওষুধ তো দিতে হবে।'

গণপত আরও ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে।

'এই ক'রেই তুমি ব্যবসা চালাবে? যত সব রাস্তার কুকুর, তাদের নিয়ে মাথায় ক'রে নাচো! সারাদিনে একটা কুটো নেড়ে উপকার করবে না, পাজী ওধারে এক ঝুড়ি আম উড়িয়ে দেবে শোর-পেটে! বেত না খেলে কাজে ওদের হাত ওঠে না। এখন এই কাজের সময়···একজন লোক যদি চোখে অসুখ ক'রে বসে থাকে···তাহলে তার ক্ষতিপূরণ করবে কে? আমাকে এখন টাকার যোগাড়ে দিন কয়েক বাইরে যেতে হবে···খুব, খুব মজা হবে কারখানায়···'

প্রভুদয়াল তখন মন্নুকে নিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছে।

গণপত যে কদিন কারখানা থেকে অনুপস্থিত ছিল, সে কদিন মানুষ এবং ভগবান, দু'পক্ষই শান্তিতে ছিল।

চোখের তাড়সে মন্নুর জ্বর দেখা দিল এবং বিছানা নিতে হলো। কিন্তু এ অসুখের মধ্যে মন্নুর মনে এক পরম পরিতৃপ্তি এল···তার মনিবানী রাত দিন নিজের ছেলের মতোন ক'রে তাকে সেবা করেছেন···

মন্নুর বিছানায় বসে কোমল কর-সঞ্চালনে পার্বতী তার মাথা টিপে দেয়··· যন্ত্রণা বোধ হচ্ছে সারা গায়ে ধীরে, অতি সন্তর্পণে হাত বুলিয়ে দেয়···আদর ক'রে বুকে টেনে নেয়···জ্বর ছেড়ে যাওয়ার সময় সারা গা ঘেমে উঠলে···নিজের আঁচল দিয়ে মাতৃ স্নেহে মুছিয়ে দেয়···কত আদর ক'রে বলে: 'বাছা রে··· তোর কেন জ্বর হলে? আমার তো হলে পারতো? আহা···বড় কষ্ট হচ্ছে না? আমার হয়ে যদি তোর ভালো হয়ে যায়···'

অন্তর নিঃসৃত সেই স্নেহ-বাণী, স্নিগ্ধ অদৃশ্য বায়ুর মতো অন্তরে প্রবেশ ক'রে ভেতর থেকে যেন দেহের সব গ্লানি ধুয়ে-মুছে দেয়···দিব্য-সঙ্গীতের সম্মোহনের মতো অন্তরকে আচ্ছন্ন ক'রে ফেলে। যুগযুগান্ত ধরে মাতৃত্বের বেদনার মধ্যে দিয়ে নারী পেয়েছে এই অপরূপ বাণীর সহজ অধিকার সারা জীবন ধরে কৈশোরের সমস্ত সুখে-দুঃখে চির বন্ধুর স্মৃতির মধ্যে স্নেহময়ী নারীর সেই মাতৃ-দুগ্ধ-শুভ্র কথাগুলি মুন্নু অন্তরের সর্বোত্তম আনন্দের, তীব্রতম বেদনার স্মৃতিস্বরূপ সঞ্চয় ক'রে রাখে।

যন্ত্রণায় যখন বিছানায় এ-পাশ ও-পাশ করে, পার্বতী তখন তাকে দু'হাতে তুলে বুক জড়িয়ে ধরে···সে তপ্ত আলিঙ্গনে যেন অবশ হয়ে সে ঘুমিয়ে পড়ে। কি এক অপরূপ দেহ গন্ধ তাকে আচ্ছন্ন ক'রে ফেলে, সে-গন্ধের স্নিগ্ধতার মধ্যে হারিয়ে যায় বেদনার উগ্রতা। অক্ষয় হয়ে থাকে তার স্মৃতির ভাণ্ডারে এই ক্ষণিক স্পর্শের স্মৃতি···চির-উত্তপ্ত, চির-স্নিগ্ধ···ঠিক তার মায়ের আলিঙ্গনের মতো···অথচ যেন তা থেকে পৃথক···কি আছে তার মধ্যে যা টেনে নিয়ে যায় মনকে জানা অনুভূতির সীমানা ছাড়িয়ে দুর্জ্ঞেয় অনুভূতির রহস্য লোকে···

কবিরাজী মোড়কের জোরে ক্রমশ জ্বর ছেড়ে এল···পার্বতীর তৈরি কাজলে চোখের জ্বালাও ক্রমশ দূর হয়ে গেল···সুস্থ হয়ে মুন্নু আবার নামল সেই কারখানার গহ্বরে।

কারখানার লোকেরা তাকে ভালোবাসত। তাই দুর্বল দেহ তাকে বেশী কাজ করতে হতো না। তার হয়ে তারা কাজ ক'রে দিত।

গণপতের ফিরতে দেরি হচ্ছিল, অবশ্য তাতে কারখানার লোকেরা খুশীই ছিল কিন্তু প্রভুদয়ালের উৎকণ্ঠা বেড়েই চলেছিল, কেন না গণপত টাকা না নিয়ে এলে ব্যবসা চালান মুশকিল হচ্ছে। স্যার টোডরমল পাড়ার লোকদের কাছেই শুধু যে মহাপুরুষ ছিলেন, তা নয় তিনি রীতিমতো মহাজনও ছিলেন। প্রভুদয়াল নিজে একদিন কারখানার কুলি ছিল···তার পর ভাগ্যের সঙ্গে যুঝতে যুঝতে সে নিজেকে বিত্তশালী মধ্যবিত্ত শ্রেণীতে উন্নীত ক'রে তোলে···তাই স্যার টোডরমলের কাছে হাত পাততে তার কোন কুণ্ঠাই ছিল না। তবে স্যার টোডরমল শুধু হাতে কাউকে ঋণ দিতেন না···প্রভুদয়ালকে এক মাসের মধ্য টাকা শোধ ক'রে দেবার কড়ারে তিনি হ্যাণ্ডনোট লিখিয়ে শতকরা পঁয়তাল্লিশ

টাকা হিসেবে পাঁচশো টাকা ধার দেন। এইভাবে পাড়ায় আর দু'এক জায়গায় প্রভুদয়ালকে হ্যান্ডনোট কেটে টাকা নিতে হয়েছে। তবে তার ভরসা ছিল, গণপত ফিরে এলেই সে সকলের টাকা শোধ ক'রে দিতে পারবে।

পাড়ার লোকেরা যে তার পেছনে আর লাগত না, এটাও তার একটা কারণ দাঁড়িয়েছিল। তবে প্রভুদয়াল মনে করত, পাড়ার লোকেরা সত্যি-সত্যিই তাকে ভালোবাসে। ইত্যবসরে স্যার টোডরমলের সঙ্গেও তার প্রীতির সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর হবার আর-একটা কারণ ঘটে গেল। গোলাপী মোরব্বা করার জন্যে সে একটা নতুন চেষ্টা করছিল। তার জন্য কতকগুলো বাড়তি কুলিকামিন তাকে নিতে হলো। কিন্তু তাদের বসতে দেবার মতো জায়গা তার কারখানায় আর ছিল না। তাই স্যার টোডরমলের বাড়ির নিচে একটা ছোট ঘর পড়েছিল, সেটা ভাড়া নেবার প্রস্তাব করতে স্যার টোডরমল রাজী হয়ে গেলেন। একটা পোড়ো ঘর থেকে যদি মাসে-মাসে কিছু আসে, সে-সুযোগ ছেড়ে দেওয়া যুক্তিযুক্ত নয়।

তাই আজকাল প্রভুদয়ালের সঙ্গে দেখা হয়ে গেলে লেডী টোডরমল নিজের আভিজাত্য ভুলে প্রশ্ন ক'রে ফেলেন: 'একি প্রভু, তুমি এরকম রোগা হয়ে যাচ্ছ কেন বলো দেখি?'

প্রভুদয়াল বুঝতে পারে না, লেডী টোডরমলের এই প্রশ্নের পেছনে আন্তরিকতা আছে কি না, জেনে লাভই বা কি? তারা ধনী-মানী—তাদের মান্য ক'রে চলাই ভালো। তবে গণপত ফিরে এলেই আগে স্যার টোডরমলের ধারটা শোধ দিয়ে ফেলতে হবে। কিন্তু গণপতের আসবার কোনো লক্ষণই দেখা যায় না।

অবশেষে গণপত ফিরে এল।

কিন্তু এল যেন জিভে শান দিয়ে। একে তো দুর্মুখ, তার ওপর এমন আরম্ভ করল যে তার মুখের সামনে দাঁড়ায় কার সাধ্য।

ছেলেবেলা থেকেই মুন্নুর একটা স্বাভাবিক ক্ষমতা ছিল, লোকের মন-মেজাজ বোঝবার। যেদিন ঘোড়া-মুখো ফিরে এল, সেইদিনই তার মুখের দিকে চেয়ে মুন্নুর মনে হলো, ঘোড়া-মুখোর মনে যেন কি একটা নতুন জিনিস খেলা করছে। সেটা যে কি তা বুঝতে পারে না। তবে গণপতের সব কাজে,

সব কথায় মুন্নু লক্ষ্য করে, কি একটা জিনিস যেন সে চাপা দিতে চাইছে। তাইতে সে যেন আরও রূঢ় হয়ে উঠেছে।

সেদিন চারবার মুন্নু ধরা পড়ে গেল···গণপতের দিকে সে একদৃষ্টিতে চেয়ে আছে। প্রথমবার চোখাচোখি হওয়াতে গণপত শুধু একটা ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকে বিদ্ধ ক'রে চলে গেল। দ্বিতীয়বার সে বিনা কারণে চিৎকার ক'রে উঠল। তৃতীয়-বার চোখাচোখি হওয়াতে মুখ ফিরিয়ে সে চলে গেল। কিন্তু চতুর্থবার সে সরবে গর্জন ক'রে উঠল : 'হাঁ ক'রে দেখছিস কি রে বেজন্মা···কাজ নেই ?'

তারপর আর গণপতের দিকে চেয়ে থাকতে মুন্নুর সাহসে কুলোয় নি। তবে সে মনে-মনে যেন ভাবতে চেষ্টা করে, কেন হঠাৎ ঘোড়া-মুখোর লম্বা-মুখ আরও লম্বা হয়ে গেল ? কিন্তু কাজের মধ্যে ভুলে গেল গণপতের কথা।

কিন্তু মুন্নু যে তার দিকে, একবার নয়, চারবার কটমট ক'রে চেয়েছিল, সে-কথা গণপত ভুলল না। সে সুযোগ খুঁজতে লাগল, তার এই পরের ব্যাপারে নাক গোঁজবার প্রবৃত্তির জন্যে কি ক'রে তাকে রীতিমতো শিক্ষা দিতে পারা যায়। শীঘ্রই সে-সুযোগ এসে গেল।

প্রভুদয়াল মুন্নুর হাতে নতুন-তৈরি গোলাপী মোরব্বা এক শিশি দিয়েছিল, লেডী টোডরমলকে দিয়ে আসবার জন্যে। হ্যাণ্ডনোটের মেয়াদ সাতদিন হলো কাবার হয়ে গিয়েছে, সুতরাং কিছু ঘুষ দিয়ে ঠাণ্ডা ক'রে রাখা দরকার। মোরব্বার শিশি নিয়ে মুন্নু বড়-বড় পা ফেলে চলছিল···কারণ স্যার টোডরমলের বাড়ির ভেতরটা তার কাছে এক মহা আকর্ষণের বস্তু ছিল···সেখানকার ইংরেজী আসবাব-পত্র, ছবি—সাজানো-গোছানো সবকিছু তার কৌতূহলী মনকে তীব্র-ভাবে আকর্ষণ করত। যাবার সময় সে লক্ষ্য করে নি, অন্ধকারে এককোণে গণপত বসে হুঁকো টানছিল। হঠাৎ তার সামনে দিয়ে মুন্নুকে মোরব্বার শিশি নিয়ে বেরিয়ে যেতে দেখে, কৌতূহলী হয়ে গণপত তার অজ্ঞাতে পিছু-পিছু-বেরিয়ে এল। দেখল, কি আশ্চর্য, মুন্নু স্যার টোডরমলের বাড়িতে ঢুকছে। দরজার গোড়াতেই লেডী টোডরমল দাঁড়িয়ে একজন ঝি'র সঙ্গে কথা বলছিলেন। গণপত দেখল মুন্নু হেসে মোরব্বার শিশিটা তাঁর হাতে দিল। রাগে গণপতের সর্বাঙ্গ জ্বলে উঠল। তাহলে তার অসাক্ষাতে প্রভুদয়াল লুকিয়ে-লুকিয়ে এমন ভাব ক'রে নিয়েছে যে, উপহার দেওয়া-নেওয়া হচ্ছে! যার ছেলে তাকে মেরে

নাক ফাটিয়ে দিয়েছে, তাদের তাড়িয়ে দেবার জন্যে হেলথ্ অফিসারকে ডেকে আনিয়েছিল, যেচে তাকে মোরব্বার শিশি উপহার দেওয়া!

মুন্নুকে ফিরে আসতে দেখে সে ইচ্ছে ক'রেই ঘুরে দাঁড়াল···মুন্নু কাছে এলে সে তার গলা টিপে ধরে জিজ্ঞেস করল: 'কার হুকুমে তুই মোরব্বা দিতে গিয়েছিলি?'

ভয়ে মুন্নু বলে: 'শেঠজীর হুকুমে। তিনি আমাকে দিয়ে আসতে বললেন, তাই তো গিয়েছিলাম। তা' ছাড়া তিনি আমাদের বলে দিয়েছেন, উনি যখনি যা-চাইবেন, তা যেন আমরা দিই।'

দাঁতে-দাঁত-চেপে গণপত বলে ওঠে: 'চুপ রও, হারামজাদা···মজা পেয়ে গিয়েছ না, এখানে ভালোমানুষটি সেজে থাকবে, আর আমাদের যারা শত্তুর তাদের কাছেও মজা মারবে···' এই বলে মুন্নুর গালে সে সজোরে একটা চড় বসিয়ে দেয়।

আত্মরক্ষার জন্যে মুন্নু হাত তুলে দাঁড়ায়। কিন্তু গণপত তখন রাগে দিক-বিদিক্ শূন্য। মারতে-মারতে সে মুন্নুকে রাস্তার কাদার মধ্যে ফেলে দিল··· অসহায়ভাবে মুন্নু চিৎকার ক'রে উঠল।

তার আসল রাগ হয়েছিল উপহার যে দিয়েছে এবং উপহার যে নিয়েছে, তাদের দু'জনের ওপর, কিন্তু তাদের ওপর রাগ প্রকাশ করার কোন সুযোগ না পেয়ে, তার সব রাগ সেই হতভাগ্য বালকের ওপরেই সে প্রয়োগ করে।

'কাজ ফেলে, এখানে-ওখানে ছুটোছুটি! ফের যদি দেখি কাজের সময় কারখানা থেকে বেরিয়েছিস, তাহলে মেরে হাড় গুঁড়িয়ে দেব শুয়োরের বাচ্চা!'

প্রভুদয়াল তাড়াতাড়ি বাইরে ছুটে এসে দেখে, মুন্নু কাদায় পড়ে কাঁদছে। গণপত চোখ লাল ক'রে তার দিকে চেয়ে আছে। সেখান থেকে বাইরে দেখে পাশের দরজার কাছে, পাথরের মূর্তি'র মতো লেডী টোডরমল দাঁড়িয়ে আছেন। লেডী টোডরমলের বুঝতে এতটুকু দেরি হয় নি, গণপতের এই বিক্রমের লক্ষ্য কোথায়। প্রভুদয়ালকে দেখে লেডী টোডরমল চিৎকার ক'রে ওঠেন:

'আরে নেমকহারাম ছোটলোক! একটা মোরব্বার শিশির জন্যে এত আক্রমণ! আর আমরা যে তোদের এত দয়া করলুম···তোদের সব উৎপাত

মুখবুজে সহ্য ক'রে আছি···যখনই টাকার দরকার হচ্ছে তখনই টাকা দিচ্ছি ···আর তার এই প্রতিদান? ছোটলোক আর কত ভালো হবে!'

উত্তেজিত হয়ে গণপত উত্তর দেয়ঃ 'আপনার সঙ্গে কে কথা বলেছে? আপনি যান! আমার চাকরকে আমি শাসন করছি, তাতে আপনার কি?'

লেডী টোডরমলের গায়ে যেন কে বিষ ছড়িয়ে দিল। তিনি চিৎকার ক'রে উঠলেন ঃ

'দূর হ, দূর হ, নেমকহারাম···বজ্জাত পাজী···তোর জন্যেই তো প্রভুদয়ালের সঙ্গে আমাদের ঝগড়া···নইলে সে তো ভদ্রলোক···তুই হলি আঁস্তাকুড়ের কুকুর··· বদমায়েশ···কেমন বাপের ছেলে···তা' আর কত ভালো হবে? তোদের কথা জানতে আমার বাকী নেই···নিজের স্ত্রীকে বাড়ি থেকে বের ক'রে দিয়ে একটা মুসলমানী নিয়ে ঘর করতো তোর বাপ—জানি না আমরা? তোর বাপ পরকে ঠকিয়ে বড়লোক হয়েছিল···তুইও তোর অংশীদারকে ঠকাচ্ছিস···উপযুক্ত বাপের উপযুক্ত ছেলে! তোর মতো লোচ্চা-বদমায়েশ-মাতালকে ভদ্দরলোকের পাড়ায় ঢুকতে দিতে নেই!'

লেডী টোডরমল মুখ থেকে গণপতের কুলজী শুনতে-শুনতে মুন্নুর কান্না আপনা থেকেই থেমে গিয়েছিল। এমনি ধারা কথায় কেউ যে ঘোড়া-মুখোকে অপমান করতে পারে, ভেবেও সে মনে সান্ত্বনা পায়। পাছে কাঁদতে গেলে সে শুনতে না পায়, সেই জন্যে জোর ক'রে তার কান্না থামিয়ে রাখে।

উত্তেজিত রায় বাহাদুর-গৃহিণীকে শান্ত করবার জন্য প্রভুদয়াল ছুটে এসে হাত জোড় ক'রে বলে ঃ 'দোহাই মা, দোহাই তোমার, ক্ষমা করো···এই দেখ হাত জোড় ক'রে তোমার কাছে ক্ষমা চাইছি···যদি বল, নাকখত দেব···যে শাস্তি দিতে চাও, মাথা পেতে নেব···শুধু তুমি রাগ ক'রো না···আমি জানি, ও অন্যায় করেছে···ওর বুদ্ধিশুদ্ধি নেই···বল···তুমি ক্ষমা করলে মা? আমি তোমার ছেলের মতোন···ছেলেকে ক্ষমা করবে না মা?'

কিন্তু এত কাতর মিনতিতেও লেডী টোডরমলের রাগ পড়ল না।

'না, না···এবার আর তোমাদের ক্ষমা করছি না। সেবার আমার ছেলের সঙ্গে মারামারি করল, তবুও আমি ক্ষমা করেছিলাম···কিন্তু এবার আর নয়··· আমার বাড়ি থেকে এই মুহূর্তে তোমার লোকজন জিনিস-পত্তর বের ক'রে

নাও···তোমাদের চিনেছি আমি···এ সব তোমাদের চালাকি···এই মুহূর্তে আমার টাকা শোধ ক'রে দাও।'

প্রভুদয়াল বুঝল ব্যাপারটা কতদূর গড়াতে পারে। একে তো স্বভাবতই সে ভীরু-ভীতু···তার ওপর আজ সে প্যাঁচে পড়ে গিয়েছে।

হাত জোড় ক'রে তবু বলে: 'এ লোকটার কোন কাণ্ডজ্ঞান নেই, আমি জানি মা কিন্তু তা'বলে আপনি তো···'

লেডী টোডরমল গর্জন ক'রে ওঠেন: 'না, না···ওভাবে তুমি আর তোমার বন্ধুকে বাঁচাতে পারবে না···ভালো চাও তো আমার টাকা দিয়ে দাও···'

প্রভুদয়াল অসহায়ভাবে, তার কণ্ঠস্বরে যতখানি মিনতি আনা সম্ভব তা এনে বলে ওঠে: 'তবু মা, ক্ষমা চাইছি।'

মুন্নুর কান্না একেবারে থেমে গিয়েছিল। মনিবের বিপদের আশঙ্কায় তার মন ভয়ে কাঁপতে থাকে। কারখানার কুলিরা কাজ ছেড়ে দিয়ে চুপটি ক'রে এসে দাঁড়িয়ে আছে, জানালায়-জানালায় প্রতিবেশিনীরা মুখ বাড়িয়ে শুনছে।

কয়েক সেকেণ্ডের জন্য সব চুপচাপ।

হঠাৎ লেডী টোডরমলের মনে পড়ল, আশেপাশে চারদিকে পাড়ার লোকজন জমা হয়েছে। এই তো উপযুক্ত সময়, নিজের মনের ঝাল মেটাবার। সজোরে মাটিতে পা ঠুকে, অভিনয়ের ভঙ্গি তিনি চিৎকার ক'রে বলে ওঠেন: 'মেয়েমানুষের মতো ওখানে পাঁচিলের আড়ালে লুকিয়ে আছিস্ কেন? বেরিয়ে আয়···'

বাড়ির ভেতর অপরাহ্ন-ভ্রমণের জন্যে স্যার টোডরমল তখন বেশ পরিবর্তন করছিলেন। সেই অবস্থাতেই গোলমাল শুনে তিনি নিচে নেমে ব্যাপার দেখে বলে উঠলেন: 'কি ব্যাপার? উঁহ···হুহু···' পুরনো হাঁপানিটা বেড়ে ওঠায় স্যার টোডরমলের কথা বলতে গেলেই কাশি এসে যাচ্ছিল: 'উঁহ···হুহু···হু··· কি ব্যাপার?'

ঘাড় ফিরিয়ে স্বামীকে দেখে লেডী টোডরমল হুঙ্কার দিয়ে বলে ওঠেন: 'নেমকহারামের দল···ওরা ধোঁয়া দিয়ে আমাদের ঘর-দোর নষ্ট করবে···আমরা উল্টে তার বদলে ওদের ঘর ছেড়ে দেব—দরকার হলে টাকা ধার দেব···আর—একটা সামান্য মোরব্বার শিশি···তার জন্যে কি কাণ্ড, ছিঃ!'

স্যার টোডরমল স্ত্রীকে ভর্ৎসনা ক'রে বলে ওঠেন : 'বলি, বাজার থেকে এক শিশি···উঁহু···হুহু···হু···মোরব্বা ? কেনাবার···হুহু···হু···হু···'

হাঁপানির জন্যে স্যার টোডরমল আর-কিছু বলতে পারেন না।

এবার প্রভুদয়াল স্যার টোডরমলের শরণাপন্ন হয়।

'ক্ষমা করুন আমাকে রায় বাহাদুর ! গণপত বুদ্ধিশুদ্ধিহীন···ও জানত না যে লেডী টোডরমলের জন্যে আমি ঐ শিশি পাঠিয়েছি···কত লোক আসে-যায় কারখানায়···কারখানার লোকেরা···'

'মিথ্যে কথা···তুমি এখনও ঐ পাজীটাকে ঢাকতে চাইছ ?'

গর্জন ক'রে ওঠেন লেডী টোডরমল।

প্রভুদয়াল হাত জোড় ক'রে বলে ওঠে : 'আপনি আমাদের মা-বাপ···' তার কাতরতা স্যার টোডরমলের অন্তর স্পর্শ করে।

'বেশ···এবারের মতোন ক্ষমা করলাম—কিন্তু তোমার বন্ধুকে সাবধান ক'রে দিও···ফের যেন আর কোনদিন ও-রকম না করে···'

এমন কোমল পরিসমাপ্তিতে-অসন্তুষ্ট হয়ে প্রতিবেশিনীরা জানালা থেকে সরে যায়।

প্রভুদয়াল কাদা থেকে মুন্নুকে টেনে তোলে।

'যা তো মহারাজ—জল দিয়ে ওর গায়ের কাদাগুলো ধুয়ে দে !'

আড়ালে গণপতকে ডেকে নিয়ে গিয়ে প্রভুদয়াল বলে : 'প্রতিবেশীদের সঙ্গে এভাবে ঝগড়া করা ঠিক নয় গণপত···বিশেষ ক'রে, তুমি যখন ছিলে না, ওঁদের কাছে থেকেই টাকা ধার নিয়ে আমি কাজ চালাই।'

গণপত সে-কথায় ভ্রূক্ষেপ না ক'রে বলে ওঠে : 'যাও, যাও, কাঁচ ছেলের মতোন আমাকে উপদেশ দিতে এসো না···বসে-বসে দাতব্য ক'রে ব্যবসাটাকে উচ্ছন্নে দিতে বসেছ তুমি···নিশ্চয়ই খুব চড়া সুদে ধার নিয়েছ ?'

'কি করি বল ? মহাজন মাত্রই তো চড়া ধারে সুদ নেবে। তুমি দু'এক দিনের মধ্যে টাকা নিয়ে ফিরবে বলে গেলে···কিন্তু যে সব টাকা আদায় করলে তার কিছুই পাঠালে না। সুতরাং বাধ্য হয়েই আমাকে ধার করতে হলো। টাকা শোক দেবার দিনও চলে গিয়েছে। তাই বলছি, ওসব কথা এখন থাক··· টাকা-কড়ি কি আদায় ক'রে এনেছ, তাই বল ! যা-যা ধার আছে সেগুলো

আগে শোধ ক'রে দিই···তার পর যা হয় হবে···হাঁ···কত আদায় হলো ? কাজের ভিড়ের মধ্যে তোমাকে জিজ্ঞেস করতে পারি নি···তুমিও বলো নি।'

মাথা নিচু ক'রে ঘোড়া-মুখো বেজার ক'রে বলে : 'কত আর আদায় হবে ? পঞ্চাশ টাকা।'

প্রভুদয়াল লাফিয়ে ওঠে : 'বল কি, মাত্র পঞ্চাশ টাকা ! এধারে যে ধার হয়ে গিয়েছে প্রায় দু'হাজার টাকা।'

'তা আমি কি করব বল ! তবে আমি বলছি আসলে আদায় করেছি তিনশো। আমার গত বছরের লাভের টাকাটা আমি তো সব এখানো পাই নি···তাই তা' থেকে আড়াই শো আমি নিয়ে নিয়েছি, বাকি পঞ্চাশ টাকা আছে।'

'তাই বলো। পঞ্চাশ টাকা আদায় হয়েছে শুনে আমি সত্যিই অবাক্ হয়ে গিয়েছিলাম।'

দু'জনে মুখোমুখী বসে···কিন্তু দু'জনেই চুপচাপ।

হঠাৎ গণপত বলে উঠল : 'আমি ভাবতেই পারি নি যে তুমি এই রকম ভাবে আমায় অপমান করবে।

প্রভুদয়াল বন্ধুর মুখের দিকে মুখ তুলে চেয়ে দেখে। হঠাৎ সেই মুহূর্তে তার জীবনে প্রথম গণপতের দিকে চেয়ে সে বুঝল, লোকটা সত্যিই ঘৃণ্য। অপরাধী যতই চেষ্টা করুক, একসময়-না-একসময় অজ্ঞাতে তার মুখে ফুটে ওঠে সে-অপরাধের চিহ্ন। জ্ঞানপাপী গণপত নিজের মুখের ম্লান বিকৃতি লুকোবার জন্যে চেষ্টা ক'রে হাসতে যায়···সেই একটি মুহূর্তের মধ্যে তার মুখের পরিবর্তন অতি স্পষ্টভাবে প্রভুদয়ালকে জানিয়ে দেয় যে, সে অপরাধী।

সেই একটুখানি দৃষ্টি এক নিমেষের মধ্যে প্রভুদয়ালের মনে যেন কি ভেঙে চুরমার ক'রে ফেলে দিল। এমন এক মুহূর্ত আসে, যখন একটা কথা, একটা দীর্ঘশ্বাস, একটা চোখের চাউনি, একটুখানি দেহের ভঙ্গী এক নিমেষের মধ্যে ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়ে যায় জন্মজন্মান্তরের বিশ্বাস, চিরদিনের বদ্ধ ধারণা। সেই মুহূর্তে প্রভুদয়াল সন্দেহাতীতভাবে বুঝল কতখানি স্বার্থপর তার লাভ-লোকসানের অংশীদার রূপে যাকে সে গ্রহণ করেছে। এতদিন যে-ধারণাকে সে মনে রেখাপাত করতেই দেয় নি, আজ তা' যেন তাকে পেয়ে বসে। সে বুঝতে পারে, বিশ্বাস করা যায়, নির্ভর করা যায় যে লোককে, সে-লোক গণপত নয়। যদিও

তাকে বোঝবার তার আর-কিছু বাকি রইল না, তবুও তার স্বভাব-ভদ্রতায় সে তখনও তার মঙ্গল কামনা করে—মনে-মনে বলে, কিছুতেই যেন তাদের সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন না হয়। তাই একান্ত সহজভাবেই সে বলে: 'আমার কথা শোন। তুমি নিজের জন্যে যে আড়াই শো টাকা নিয়েছ তা' থেকে আপাতত তুমি কোম্পানীকে দু'শো টাকা ধার দাও···সেই দু'শো টাকা দিয়ে অন্তত ছোটখাটো দেনাগুলো শোধ ক'রে দি। তারপর সামনের সপ্তাহে আমি লাহোর গিয়ে সেখানে যে আমাদের পাঁচশো টাকা পড়ে আছে, নিয়ে এসে তোমার টাকা শোধ ক'রে দেব।'

গণপত ম্লান-বিবর্ণ-মুখে উত্তর দেয়: 'টাকা আমার হাতে নেই।'

গণপত আগাগোড়াই মিথ্যে কথা বলছিল। সে সব সুদ্ধ আটশো টাকা আদায় করেছিল এবং লাহোর থেকেও সে পাঁচশো টাকা নিয়ে নিয়েছে। সমস্ত টাকাই সে লাহোরের এক বারবনিতার পেছনে খরচ ক'রে এসেছে।

তাই কি বলবে ঠিক করতে না পেরে সে বলে ওঠে: 'আমার টাকা আমি সমস্তই খরচ ক'রে ফেলেছি, আর লাহোরের টাকার কথা যা তুমি বলছ, সেখানে গিয়ে কোন লাভ নেই···আমি বহু চেষ্টা ক'রেও সেখানে বিশেষ-কিছু আদায় করতে পারি নি।'

প্রভুদয়ালের সন্দেহ বেড়ে যায়।

বড় ভায়ের মতো সে মৃদু ভর্ৎসনার ভঙ্গীতে বলে: 'তোমার মনে যা আছে স্পষ্ট ক'রে এখনো খুলে বল। খাতাপত্র দেখে ভালো ক'রে হিসেব ক'রে দেখি কোথা থেকে কি বার করা যায়!'

এই বলে সে মুন্নুকে ডাকে।

'মুন্নু, এখানে বসে খাতা পেনসিল নিয়ে যোগ দে তো···গণপত যা-যা বলছে একটা হিসেব জোড় তো···'

মুন্নু উনুনের ওপর কড়া নাড়তে-নাড়তে কান খাড়া ক'রে তাদের কথাবার্তা শুনছিল···হুকুম পাওয়া মাত্রই সে ছুটে হাত ধুতে গেল···কারণ সে জানতো নোংরা হাতে হিসেবের খাতা-পত্র ছুঁতে নেই।

মুন্নুকে খাতা কাঁধে আসতে দেখে, গণপত রাগে মস্‌মস্ করতে করতে বলে উঠল: 'এই সব ছোটলোক কুলির সামনে আমাকে হিসেব দাখিল করতে

হবে নাকি ? কখ্খনো না···আর ঐ অজাত-কুজাতের একটা রাস্তার ছোঁড়া, সে ছোঁবে ব্যবসার খাতা-পত্র··· । এ আমি কিছুতেই সহ্য করব না···আমি অনেক সয়েছি···রাস্তার এ'টো পাতা···তাকে কি না মাথায় তুলে নাচা !

তার কথায় বিন্দুমাত্র উত্তেজিত না হয়ে প্রভুদয়াল বলে : 'দেখ ধর্ম' বলে একটা জিনিস আছে···ছেলেটার মা-বাপ নেই···অনাথ···তাকে পালন করা এমন খারাপ কাজ তো কিছু নয় ! ওর দেহ যে রকম তাতে ও-কে দিয়ে কুলির কাজ করানো চলবে না । সেইজন্যে হিসেবের কাজ ওকে একটু-একটু শেখাতে হবে···বুদ্ধি আছে, মাথা আছে···ঠিক পারবে···আর তা' ছাড়া, ওকে যদি আমার সংসারের একজন বলেই মনে করা যায়, তাহলে তো ওর সামনে হিসেব করতে তোমার আপত্তি থাকতে পারে না ? কেমন ? আর বাকি যে সব কুলি কারখানায় রয়েছে···তারা হিসেবপত্রের কিছুই বোঝে না ।'

ঘোড়া-মুখো কিন্তু তেমনি আপত্তির সুরে প্রতিবাদ ক'রে ওঠে : 'হিসেব-পত্রের ব্যাপার···তোমার ঐ অনাথ বালকও বোঝে না ! দু'দিন কোথায় ইস্কুলে-পড়েছে কি না-পড়েছে···সে হিসেবের কি বুঝবে ? বড়জোর হয়ত এক আর একে গুনে দুই বলতে পারে । আমার ত্রিসীমানায় যদি ও আসে, তাহলে ওকে আমি খুনই ক'রে ফেলব বলে দিচ্ছি ।'

প্রভুদয়াল কোন উত্তর না দিয়ে মুন্নুর হাত থেকে হিসেবের খাতাগুলো নিয়ে নেয় । মুন্নু ন-যযৌ ন-তস্থৌ অবস্থায় অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে···সামনে এগিয়ে যেতে তার আর সাহসে কুলোয় না ।

গণপতের মনের ভেতর তখন ঝড় বইছিল । অন্য কেউ জানুক আর নাই-জানুক, সে তো জানে, কি ক'রে দিনের-পর-দিন মিথ্যা অজুহাতে সে হিসেবের খাতা সব গোলমাল ক'রে রেখেছে । আজ যদি প্রভুদয়াল খাতা খুলে হিসেব মিলিয়ে দেখে ! তাই টাকার কথা থেকে প্রভুদয়ালের মন সরিয়ে ফেলবার জন্যে গণপত প্রাণপণ চেষ্টা করতে থাকে ।

'কিন্তু আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করি···জানা-নেই, শোনা-নেই, রাস্তা থেকে একটা কোথাকার বেজন্মা ছেলে ধরে নিয়ে এসে, তাকে সকলের থেকে আলাদা ক'রে দেখবার মানেটা কি ?'

আস্তে-আস্তে হিসাবের খাতা খুলতে-খুলতে প্রভুদয়াল বলে : 'কই, ওকে তো তেমন আলাদা ক'রে কিছুই দেখি না আমি—!'

প্রভুদয়াল পাতার-পর-পাতা উলটে চলে।

গণপতের বুকের স্পন্দন দ্রুততর হয়ে ওঠে। যা করবার এখনই করতে হবে। তার এখনো ধারণা আজকের বিপদ সে কাটিয়ে উঠতে পারবে।

'আজ এত যে কেলেঙ্কারী হলো—তার মূলে তো ঐ ছোঁড়াটাই! যদি ও হারামজাদা ঐ মাগীটাকে মোরব্বার শিশি দিতে না যেত···'

গণপতকে বাধা দিয়ে প্রভুদয়াল বলে : 'অকারণে লোককে গালাগাল দাও কেন? ছিঃ! এইমাত্র তোমার সামনে, তোমার ব্যবহারের জন্যে আমাকে ও'দের কাছে হাতজোড় ক'রে ক্ষমা চাইতে হলো! সেকথা কি এরই মধ্যে ভুলে গেলে? আর তা ছাড়া, মুন্নুকেই বা দোষ দিচ্ছ কেন? মুন্নু তো নিজের ইচ্ছায় মোরব্বা দিতে যায় নি, আমি তাকে পাঠিয়েছিলাম বলেই না সে গিয়েছিল, আর আমি যে পাঠিয়েছিলাম, তা-ও এমনি-এমনি নয়—ওদের টাকা শোধ দেবার দিন কবে চলে গিয়েছে—সেটা ভুললে চলবে কেন!'

এদিক্ দিয়ে কোন সুবিধা হলো না দেখে গণপত অন্য পথ ধরল।

'এই হ্যান্ডনোট লিখে টাকা ধার ক'রে ব্যবসা চালানো আমার আদৌ ইচ্ছে নয়···টাকা যদি ধারই নিতে হয়···ও সব লেখালেখি কেন? যদি না-ই দিতে পারি, তখন তো আর কেউ আমাকে ধরতে-ছুঁতে পারবে না!'

প্রভুদয়াল গম্ভীরভাবে উত্তর দেয় : 'তুমি যা বলছ সে তো ব্যবসার ধারা নয়···সে তো জোচ্চুরী!'

গণপত দেখল, এই তো সুযোগ! এই সুযোগে প্রভুদয়ালের সঙ্গে তার ঝগড়া করতেই হবে। সে চিৎকার ক'রে বলে উঠল :

'কি বললে, জোচ্চুরী! আমি জোচ্চোর! ফের যদি ও-কথা মুখে আনবে তা'হলে মেরে হাড় গুঁড়িয়ে দেব বলে দিচ্ছি!'

কিন্তু তাতেও প্রভুদয়াল উত্তপ্ত হয় না। শান্তভাবেই বলে : 'তোমাকে জোচ্চোর আমি বলি নি। অকারণে উত্তেজিত হচ্ছো কেন। আজ আর তোমার সঙ্গে আমি কোন আলোচনাই করছি না—তুমি মাথা ঠান্ডা কর।'

গণপত উদ্গ্রীব হয়েছিল, এবার প্রভুদয়াল রেগে যাবে, দুটো কড়া কথা

বলবে···তাহলেই ঝগড়া ক'রে তার বেরিয়ে পড়ার সুবিধা হবে···কিন্তু প্রভুদয়াল সে-ধরনের কিছুই করল না···একটা কথাও উত্তেজিত হয়ে বলল না। প্রভু-দয়ালের সেই শান্তভাবে গণপত যেন আরও ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল।

তাই যাতে ঠাণ্ডা হয়ে না যায়, সেই জন্যে সে তেমনি চিৎকার ক'রে বলে উঠল : 'জোচ্চোর বললে না তো কি? মুখের ওপর সোজা না বললেই কি বলা হয় না! আমাকে কচি খোকা পেয়েছ? ঐ মাগী আমাকে অপমান করেছে···আমি এখন বুঝছি···তার মধ্য তুমি···তুমিও আছ···নইলে ও-মাগী ও-সব জানবে কোত্থেকে? বেশ···আমিও তোমাকে বলে দিচ্ছি···আমি আটশো টাকা আদায় করেছিলাম···এবং পঞ্চাশ টাকা ছাড়া তার সবই খরচ ক'রে দিয়েছি···এ থেকে···আমার ওপর চোখ রাঙাতে এসো না···আমি যা খরচ করেছি, তা খরচ করার সম্পূর্ণ অধিকার আমার আছে···তার জন্যে যদি আমাকে জেরা ক'রে জ্বালাতন করতে চাও···ভালো হবে না···মনে রেখো আমি তোমার মাইনে-করা কুলি নই! আমাকে চোখ রাঙাতে এসো না!'

রাগে প্রভুদয়ালের সর্বশরীর কাঁপতে থাকে, কিন্তু তবুও অসাধারণ বেদনায় সেই রাগ দমন ক'রে বলে :

'আমি তোমাকে চোখ রাঙাতে বা ভয় দেখাতে কখনও চাই নি···চাইও না···যা করেছ ভালোই করেছ···ঠিকই করেছ। তুমি বিয়ে করো নি, তোমার বয়স অল্প—মাঝে মাঝে একটু-আধটু ফুর্তি করবে না-ই বা কেন? টাকাটা যে খরচ হয়ে গিয়েছে, তাতে আমার বিন্দুমাত্র আপত্তি বা কষ্ট নেই—অন্তত সেকথা যে তুমি আমাকে এমনি খোলাখুলিভাবে বললে, তাতে সত্যিই আমি খুব খুশী হয়েছি। আমাদের হ্যাণ্ডনোটে যা ধার আছে, চেষ্টা ক'রে অন্য জায়গা থেকে ধার নিয়ে শোধ দিলেই চুকে যাবে সব গণ্ডগোল, কেমন?'

গণপত মহাবিপদে পড়ল। এতেও যখন লোকটা উত্তেজিত হলো না, তখন সে আরও ক্ষেপে বলে উঠল : 'ও সব ভালোমানুষী ভান রেখে দাও! ভেবেছ, তোমার ঐ ভালোমানুষীর চাল দিয়ে আমাকে দাবিয়ে রাখবে! সেটি হবে না! তোমার মতো মিনি-মুখো লোকের মিষ্টি কথায় আমি ভুলি না···তুমি ভেবেছ, তুমি নিজে খুব সাধু, না?'

এতক্ষণ পরে যেন প্রভুদয়ালের গা একটু ঘামল। কণ্ঠস্বরের মধ্যে ঈষৎ পরি-

বর্তন দেখা দিল : 'দোহাই তোমার গণপত, আমার সঙ্গে তুমি ও-ভাবে কথা বলো না। ওটা ঠিক নয়। আমি তোমার ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে কোন কথাই বলি নি—কারণ আমি জানি, তোমার মতো অবস্থায় পড়লে, হয়ত তোমারই মতোন কাজ আমিও করতাম—তুমি আমার চরিত্র সম্বন্ধে যা খুশি তাই ভাবতে পার···কিন্তু আমি তোমার চরিত্র সম্বন্ধে কোন আলোচনাই করি নি··· করবও না···তবে টাকা আদায়ের ব্যাপার নিয়ে তুমি আমার কাছে মিথ্যে কথা বলেছিলে···তার জন্য সত্যিই আমার মনে বড় দুঃখ হয়েছিল···হয়ত রাগও হয়েছিল, কিন্তু বিশ্বাস কর, এখন আমার মনে ওসব কিছুই আর নেই।'

গণপত তারস্বরে চিৎকার ক'রে ওঠে : 'তুমি বদমায়েশ···তোমার মুখে মধু ···বুকে গরল···ভণ্ড—'

তবুও প্রভুদয়াল মিনতি করে : 'দোহাই তোমার, আমাকে ভুল বুঝো না ···আমি সোজা গাঁয়ের লোক···তুমি যা সব বলছ, তার কিছুই জানি না···সারা জীবন আমি মাথার ঘাম পায়ে ফেলে খেটে এসেছি···তবে তোমাদের শহুরে লোকেরা যে-ভাবে কথা বলে, কাজ করে, আমি হয়ত তা পারি না, বা করি না ···সত্যিই আমার এক-এক-সময় ইচ্ছে হয়, আমি কেন কুলিই রইলুম না···কেন মরতে ব্যবসা করতে এলুম ?'

'আহা···ভাজা মাছটি উলটে খেতে জানেন না! তোমার এ সব চালাকি বুঝতে আমার এক মুহূর্ত দেরি লাগে না···মুখে যত তোমার সাধুতার বুলি··· অন্তরে তত তোমার জিলিপীর প্যাঁচ···তোমার মতো ধূর্ত···তোমার মতো শয়তান আর দুটি নেই···জাত-পাহাড়ী কুত্তা।'

প্রভুদয়াল যদিও বুঝেছিল যে, অতঃপর গণপতের সঙ্গে তার কোন ব্যবসাগত সম্পর্ক থাকা সম্ভব নয়···তবুও সে তার সব গর্ব ত্যাগ ক'রে শেষবারের মতোন চেষ্টা করল লোকটাকে কাজের কথার মধ্যে আনবার জন্যে : 'তোমার যা খুশি তাই বল। আমি তো জানি, সত্যিই ভালো হবার এত চেষ্টা করেও আমি ভালো হতে পারি না···আমার মধ্যে রয়ে গিয়েছে হাজার দোষ-ত্রুটি···'

এত গালাগালের পর এই বিনয়···গণপতের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেল···

'যা যা···ঢের হয়েছে···আর ন্যাকামো করতে হবে না···ন্যাকা বদমায়েশ কোথাকার!'

প্রভুদয়াল আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়, গণপতের হাত ধরবার জন্য হাত বাড়িয়ে দিল : 'পাগলামো ক'রো না···মাথা ঠাণ্ডা কর···তুমি আর আমি এক ব্যবসায়ের সমান অংশীদার···ভুলে যেয়ো না, আমাদের ব্যবসার সব কাগজ-পত্রে দু'জনের সই পাশাপাশি আছে···'

ঝটকা মেরে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে গণপত বলে : 'আজ সকালে তুমি যে অপমান আমাকে করেছ, তারপরও আশা করো যে আমি তোমার অংশীদার হয়ে থাকব ? আমি এই মুহূর্তেই তা ভেঙে দিচ্ছি দেখব তোমার তেজ কোথায় থাকে ? ঐ নর্দমায় লুটোবে···আমাকে ঠকানোর ফল হাতে-হাতে বুঝতে পারবে ! রাস্তার কুলি ছিলে···রাস্তার কুলিই থাকবে !'

এই বলে হিসাবের খাতা-পত্র কাঁধে তুলে নিয়ে চলে যাবার জন্যে জুতোর দিকে পা বাড়াল।

প্রভুদয়াল একেবারে ভেঙে পড়ল সর্ব-অভিমান ত্যাগ ক'রে ছুটে গিয়ে গণপতের পা থেকে জুতো খুলে নিয়ে অসহায়ের মতো বলে উঠল : 'এই আমার মাথা আর তোমার জুতো···যত খুশি, আমার মাথায় মার···আমাকে এভাবে ছেড়ে যেয়ো না···আজ দু'বছর একসঙ্গে থেকে এই ব্যবসা গড়ে তুলেছি—আজ এই দেনার মুখে আমাকে ফেলে যদি চলে যাও, তাহলে সত্যিই এই বুড়ো বয়সে আমাকে আবার কুলিগিরি ক'রে মরতে হবে ! দোহাই তোমার !'

'তুমি মর বাঁচ, তাতে আমার কিছু যায় আসে না ! যার জন্মের ঠিক নেই, তার আবার মান-অপমান ! তোমার বাপ ছিল কুলি···তুমিও কুলি···তুমি পার-যার-তার কাছে হাঁটুগেড়ে হাত-জোড় ক'রে পা চাটতে—আমি তা পারি না···বিশেষ ক'রে তোমার মতো একজন কুলির কাছে আমি পারবো না হাতজোড় ক'রে থাকতে।'

'যা খুশি আমাকে বলো···শুধু আমাকে ছেড়ে যেয়ো না···একটু মাথা ঠাণ্ডা ক'রে ভাবো···সব ঠিক হয়ে যাবে !'

গণপত সে আবেদনে কোন দৃকপাত না ক'রে ছুটে দরজার দিকে এগিয়ে গেল···দাঁতে দাঁত চেপে বলে উঠল : 'দূর হও রাস্তার কুকুর।'

মুন্নু এতক্ষণে চুপটি ক'রে দাঁড়িয়ে দেখছিল···এক অজানা ভয়ে তার সর্ব-শরীর ঠকঠক ক'রে কাঁপছিল। গণপতকে চলে যেতে দেখে, কি মনে ক'রে ছুটে

গিয়ে তার জামা টেনে ধরে বলে উঠল : 'দোহাই হুজুর ! চলে যাবেন, চলে যাবেন না···এটা উচিত হচ্ছে না !'

তুলসী, বোঙ্গা আর মহারাজ কোথা থেকে ছুটে এসে হাত জোড় ক'রে

ধাক্কা মেরে মুন্নুকে সরিয়ে দিয়ে গণপত চিৎকার করে ওঠে : 'দূর হ ফ্যান-চাটার দল !'

মাথায় হাত দিয়ে প্রভুদয়াল বসে পড়ল। তার অজ্ঞাতে তার দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে বেরিয়ে এল : 'সর্বনাশ ! সর্বনাশ হবে !'

গণপত ততক্ষণ দরজার বাইরে পা দিয়েছে। প্রভুদয়াল ছুটে গিয়ে তার হাত ধরে। ধাক্কা মেরে গণপত চলে যায়। সে-ধাক্কা সামলাতে না পেরে প্রভুদয়াল টলে পড়ে যায়।

গণপত তার পরের দিনই নিজে তার একটা চাটনির কারখানা খুলে বসল। তার হাতে পঞ্চাশটা টাকা ছিল, তাই দিয়ে একটা সেড্ ভাড়া নিল এবং কিছু কিছু আসবাবপত্র যোগাড় করল। দু'বছর ধরে ব্যবসা চালানোর দরুন বাজারের লেন-দেনের কারবার ছিলো। তারই সুযোগে কাঁচামাল যা কিছু তা সে ধারে সংগ্রহ করল। যে-সব পুরনো খরিদ্দার ছিল, নিজে তাদের দোকান গিয়ে প্রভুদয়ালের নামে যা খুশি তাই দোষারোপ ক'রে তাঁদের সহানুভূতি আদায় করল। এবং তাদের প্রত্যেকের কাছ থেকে এই আশ্বাস নিয়ে এল যে তারা আর প্রভুদয়ালের সঙ্গে কারবার করবে না। সেই সঙ্গে অতি চতুরভাবে সে এই খবরটাও প্রচারিত ক'রে দিল যে দেনার দায়ে প্রভুদয়াল ডুবে আছে···শিগ্‌গিরই হয়ত পাততাড়ি গুটোবে···

যে-সব লোক ধারে মাল-পত্র দিয়েছিল, তারা আতঙ্কিত হয়ে উঠল···বুঝি তাদের টাকা সব মারা যায়। সন্ত্রস্ত হয়ে তারা সবাই প্রভুদয়ালের দরজায় তাগাদা লাগাল।

প্রভুদয়াল পাগলের মতো হয়ে উঠল।

একদিন একজন পাওনাদার অনেকক্ষণ ধরে ডাকাডাকি ক'রে সাড়া না পেয়ে গালাগাল দিতে শুরু ক'রে দিল।

'ধারে জিনিস নিয়ে এখন মাগের পেটে লুকিয়ে রইলি নাকি ? কই রে··· সাড়া নেই কেন ?'

নিজের ভবিষ্যৎ দুরবস্থার কথা কল্পনা ক'রে প্রভুদয়াল এতদূর চঞ্চল হয়ে ওঠে যে, জ্বরে তাকে শয্যা নিতে হলো। পাওনাদাররা ভাবল গণপতের কথাই ঠিক···প্রভুদয়াল তাহলে তাদের ফাঁকি দেবার জন্যই গা ঢাকা দিয়েছে। কারখানার কুলিরাও কি করবে ভেবে না পেয়ে কারখানায় আসা বন্ধ ক'রে দিল। পাওনাদারদের মনে আর সন্দেহের অবকাশ রইল না।

দরজায় একজন চলে যায়, আর একজন আসে। গালাগালে কানপাতা যায় না।

বাড়ির ভেতর থেকে প্রভুদয়াল সেসব কুৎসিত গালাগাল শুনতে পায় না কিন্তু পার্বতীকে শুনতে হয়। অসহ্য বোধ হওয়ায় একদিন পার্বতী তুলসীকে ডেকে বলল : 'বাবা, তুমি বেরিয়ে লালাজীকে বলো, ওর জ্বর হয়েছে···জ্বর সেরে গেলেই উনি দেখা করবেন।'

অভ্যাস মতো তুলসী সে-আদেশ মুন্নুর ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে বলে : 'যা মুন্নু, তুই বলে আয় !'

জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে মুন্নু বলে : 'লালাজী, কর্তার জ্বর হয়েছে···'

কথা শেষ হতে-না-হতে লালাজী চিৎকার ক'রে ওঠেন : 'তা' আমরা জানি। জ্বর হবেই তো এখন ! এত লোকের খেলে আর জ্বর হবে না ! ও সব বুজরুকী ছেড়ে দিতে বল্ তোর মনিবকে। ভালো চায় তো বেরিয়ে এসে দেখা করুক···না হ'লে হারামজাদাকে বাড়ির ভেতর থেকে টেনে বের ক'রে আনব।'

সব দায়িত্ব যেন মুন্নুর। হাত জোড় ক'রে কম্পিতকণ্ঠে মুন্নু বলে : 'বিশ্বাস করুন লালাজী। তাঁর সত্যি জ্বর হয়েছে, দয়া ক'রে আজ যান···কাল আসবেন, কাল নিশ্চয়ই উনি দেখা করবেন।'

'আরে যা যা নেড়ী কুত্তার বাচ্চা—'

মুন্নু ভয়ে মুখ সরিয়ে নেয়।

ঠিক সেই সময় লেডী টোডরমল তাঁর তেতলার ছাদ থেকে এক ঘটি নোংরা জল নিচে রাস্তায় ফেলছিলেন। যখন প্রয়োজন বোধ করেন, নিরঙ্কুশ-

ভাবে তিনি এমনি রাস্তাতেই সব নোংরা ছুঁড়ে ফেলে থাকেন। প্রভুদয়ালের দুর্ভাগ্য যে সেদিন তার পাওনাদারদের মাথা আর লেডী টোডরমলের হস্ত-নিক্ষিপ্ত সম্মেলিন-জলধারা ঠিক একই লাইনের মধ্যে এসে পড়ল।

লেডী টোডরমল একটু বিস্মিত হয়েই কান খাড়া ক'রে শোনেন, তাঁর বাড়ির নিচে কারা যেন চিৎকার ক'রে কি সব ব'লছে। তিনি মুখ বাড়াতেই স্পষ্ট শুনতে পেলেন:

'লজ্জা নেই···নির্লজ্জ···বেহায়া ··মাথার ওপর নোংরা জল ঢেলে দিলে?' লেডী টোডরমলকে দেখতে পেয়ে সকলে সমস্বরে বলে উঠল: 'আমাদের জামা-কাপড় সব নোংরা ক'রে দিলেন কেন?'

একটু লজ্জিত হয়েই লেডী টোডরমল বলেন: 'তোমরা যে ওখানে দাঁড়িয়ে আছো, তা' জানব কি ক'রে? কে তোমরা? কি করছো ওখানে?'

একজন বলে উঠল: আমরা এসেছি দেউলে প্রভুদয়ালের খোঁজে।'

দেউলে! লেডী টোডরমলের যেন মাথা ঘুরে গেল! পাগলের মতো ছুটতে ছুটতে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এসে তিনি জিজ্ঞেস করেন: 'দেউলে হয়েছে? নেমকহারাম সত্যি-সত্যি দেউলে হয়েছে।'

'তাই তো দেখছি···নইলে আমাদের সঙ্গে দেখা করে না কেন?'

সমবেত পুরুষ-কণ্ঠের সঙ্গে এবার নারী-কণ্ঠ সংযুক্ত হলো। একা লেডী টোডরমল তাদের সকলের অন্তরের জ্বালাকে ফুটিয়ে তুললেন···স্থানকালপাত্র ভুলে নিজের অর্থনাশের সম্ভাবনায় তিনি চিৎকার ক'রে উঠলেন:

'বলি ও মড়া···সত্যি সত্যি মরেছিস নাকি রে? আমার সোয়ামীর পাঁচ পাঁচশো টাকা গো···বলি···সর্ব-অঙ্গে গরল হবে···কুট হবে···'

পাওনাদারদের দলের মধ্যে লম্বা-মুখো একজন সমবেদনায় বলে উঠল: 'তা'হলে আপনাদের পাঁচশো গিয়েছে!'

আগুনে যেন ঘি পড়ল।

'পাঁচ-পাঁচশো গো! কেমন মাথা হেট ক'রে এসে আমার সোয়ামীর পা ধরে কেঁদে পড়ল···তাঁর নরম মন, গলে গেলেন···'

পাওনাদারদের দিক্ থেকে মুখ ফিরিয়ে প্রভুদয়ালের বাড়ির দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে অদৃশ্য শব্দঘাতী বাণ ছাড়তে থাকেন:

'এই নেমকহারাম···সাড়া দিচ্ছিস্ নে যে বড় ? লোকের সর্বনাশ ক'রে গর্তের ভেতর লুকিয়ে থাকা ! ধর্মে সইবে না···পচে পচে মরবি···এখনও ভালো চাস তো বেরিয়ে আয় ! আয় বলছি !'

কিন্তু প্রভুদয়ালের বাড়ির দিক্ থেকে কোন সাড়াশব্দই পাওয়া গেল না। শুধু মাঝে মাঝে কার যেন কান্না শোনা যাচ্ছিল···

প্রভুদয়ালের শয্যার পাশে বসে পার্বতীর সঙ্গে মুন্নু ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে।

কে একজন বলে ওঠে : 'পুলিসে খবর দাও···আসুক পুলিস !'

তাদের আশ্বাস দিয়ে লেডী টোডরমল বলেন : 'পুলিস ডাকতে হবে কেন ? আমার ছেলে কি বৃথাই থানাদার হয়েছে, সে ওপরেই আছে···দাঁড়াও, তাকে আমি ডেকে আনছি !'

তরতর ক'রে তিনি ভেতরে চলে যান।

পার্বতী আর মুন্নুর চাপা কান্নায় প্রভুদয়ালের নিদ্রা ভেঙে যায়।

জিজ্ঞেস করে : 'কি ব্যাপার ?'

বহু কষ্টে অশ্রু রোধ ক'রে মুন্নু বলে : 'দরজায় পাওনাদাররা চেঁচামেচি করছে। তারা আপনাকে ডাকছে।'

তৎক্ষণাৎ প্রভুদয়াল বিছানা থেকে উঠে দাঁড়াল। জানালা থেকে মুখ বাড়িয়ে নিচে দেখল। জ্বরে, উত্তেজনায় তার দেহ কাঁপছিল। মুখ বাড়িয়ে তাদের সঙ্গে কথা বলতে যেই যাবে, অমনি তারা নিচে থেকে চেঁচিয়ে উঠল :

'ঐ যে···ঐ যে হারামজাদা মুখ বাড়িয়েছে !'

'পাজী নচ্ছার···বেরিয়ে আয়···বেরিয়ে আয়···বের কর আমাদের টাকা—'

হাত জোড় ক'রে প্রভুদয়াল বলে : 'আমাকে ক্ষমা করুন আপনারা··· আপনাদের কষ্ট দিলাম···তবে বিশ্বাস করুন, আপনারা আমার কাছ থেকে যে যা পান, আমি পাই পয়সা তা শোধ ক'রে দেবো···তার জন্যে যদি আমাকে জীবন দিতেও হয় জানবেন, তাতেও আমি দ্বিধা করব না—অনুগ্রহ ক'রে আমাকে এরকম ক'রে গালাগাল দেবেন না।'

'এতক্ষণ ধরে যে চেঁচিয়ে গলা ফাটিয়ে ফেললাম আমরা, সাড়া দিচ্ছিলে না কেন ? ওখান থেকেই বা জবাব দিচ্ছো কেন ? নিচে এসে সামনাসামনি জবাব দিতে পারো না ?'

'জ্বরে আমি শয্যাশায়ী···আমি শুনতে পাই নি।' প্রভুদয়াল হাত জোড় ক'রে বলে।

এমন সময় ভিড় ঠেলে কে একজন এগিয়ে এলেন।

'আরে! বাবু দেবদত্ত যে!'

বাবু দেবদত্ত উপরের দিকে চেয়ে বলে উঠলেন: 'শুনে ছুটতে ছুটতে আসছি, পালাবার আগে আমার বাড়ি ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে যাও!'

'আমি পালাব না! বিশ্বাস করুন···'

'তোমাকে আবার কি বিশ্বাস! আমার ভাড়া এখুনি চুকিয়ে দাও!'

হঠাৎ প্রভুদয়াল জানালা থেকে মুখ সরিয়ে নিল, ভাবল, স্ত্রীর গায়ে সামান্য যা গহনা আছে, তাই দিয়ে বাড়িওয়ালার ভাড়াটা চুকিয়ে দেবে।

এমন সময় গলির মোড়ে মহাসোরগোল পড়ে গেল।

সকলে পেছনে ফিরে দেখে, লেডী টোডরমলের পুত্র এবং পুলিশ ইনস্পেক্টর সাহেব পাহারাওয়ালা সমেত বীরদর্পে এগিয়ে আসছেন।

থানাদার গম্ভীরকণ্ঠে জিজ্ঞেস করল: 'কোথায় প্রভু?'

'এই জানালায় মুখ বাড়িয়েছিল···তোমাদের আসতে দেখে উবে গেছে।'

লেডী টোডরমল কোমরে হাত দিয়ে সগৌরবে দাঁড়ান।

থানাদার আদেশ করে: 'তেজ সিং! ইয়ার মহম্মদ! যাও, বাড়ির ভেতর থেকে টেনে বের ক'রে নিয়ে এসো ব্যাটাকে!'

এমন সময় কারখানার দরজা খুলে গেল। প্রভুদয়াল আর তার পেছনে কারখানার জনকয়েক মজুর। একজন পাহারাওয়ালা এগিয়ে গিয়ে প্রভুদয়ালের ঘাড় ধরে টেনে আনতে আনতে চেঁচিয়ে বলে: 'নিকালো শুয়ার!'

মুন্নু প্রভুদয়ালকে জড়িয়ে ধরে।

দু'জন পাহারাওয়ালা জোর ক'রে টেনে মুন্নুকে ছাড়িয়ে দেয়···পেছন থেকে লাথি মারতে মারতে প্রভুদয়ালকে একেবারে ভিড়ের মধ্যে এনে ফেলে।

পাওনাদাররা উল্লাসে চিৎকার ক'রে ওঠে:

'মার লাথি···জোরে···হারামজাদা···পাহাড়ী চাষা···চোর···'

একবার আপাদমস্তক চক্ষু দিয়ে প্রভুদয়ালকে মেপে নিয়ে ইনস্পেক্টর সাহেব হুকুম দেন: 'জলদি থানামে লে যাও!' শয়তান মালুম হোতা।'

সাহেবকে সমর্থন ক'রে থানাদার বলে ওঠে: 'পয়লা নম্বরের শয়তান—'

তারপর নিজের জননীর দিকে চেয়ে বলে: 'যতক্ষণ আমি না ফিরি তুমি কারখানায় তালা লাগিয়ে রেখে দাও!'

পাওনাদারদের ওপর হুকুম হলো, আপনারা কাল কতোয়ালীতে আসবেন··· সকালে আপনাদের এজাহার নেওয়া হবে···এখন আপনারা যে যার ঘরে ফিরে যান, যা করবার আমরাই করছি।'

'জী! জো হুকুম, থানাদার সাব!' হাতজোড় ক'রে তারা সকলে আংরেজী সরকারের সেই মূর্ত বিগ্রহকে অভিবাদন জানায়···জগতে তারা আর কোন জীবকে এতখানি ভয় করে না।

ছোট্ট গলি···দু'পাশের জানালায় কৌতুহলী সব মুখ···আশেপাশে চারিদিকে ফিসফাস আওয়াজ···দু'ধারে জনতা···এতক্ষণ মজা দেখছিল···ভালো লাগছিল তাদের দেখতে শক্তির দাপট···তেজ সিং আর ইয়ার মহম্মদ, একজন শিখ আর একজন মুসলমান···প্রভুদয়ালকে হাঁটিয়ে নিয়ে চলে···তার দুই গণ্ড বেয়ে নীরবে অশ্রুধারা গড়িয়ে পড়তে থাকে···মাঝে মাঝে পেছন ফিরে চেয়ে দেখে···অশ্রুজলে ঝাপশা চোখে পড়ে, জানালার ম্লান প্রস্তরমূর্তি···পার্বতী···পাথরের কি অশ্রু আছে?

থানাদার গর্জন ক'রে ওঠে: 'পেছনে ফিরে কি দেখছিস শুয়োর! সামনে দেখ···কতোয়ালীর···'

কতোয়ালীর বারাণ্ডায় এক চারপায়ার ওপর বসে গৌরবর্ণ এক মুসলমান ইনস্পেক্টর গড়গড়ার নলে মৃদু টান দিচ্ছিলেন।

থানাদার তার সামনে গিয়ে জানাল: 'আসামীকে যেমন ক'রে পার কবুল করাও, পাণ্ডে খাঁ! ধার ক'রে লোকেদের ফাঁকি দিয়েছে···'

চারপায়া ছেড়ে ইনস্পেক্টর ওপরওয়ালাকে সম্মান দেখাবার জন্যে সোজা হয়ে দাঁড়ায়। তার পর ভেতর থেকে একটা বেত নিয়ে আসে।

তেজ সিং আর ইয়ার মহম্মদ দু'দিক থেকে দু'জনে প্রভুদয়ালকে ভালো ক'রে ধরে।

বেত আস্ফালন করতে করতে পাণ্ডে খাঁ হুঙ্কার দিয়ে বলে ওঠে: 'ভালো-

মানুষের মতো বলে ফেল তো···টাকাকড়ি সব কোথায় লুকিয়ে রেখেছিস ? শিগ্‌গির···'

হাত জোড় ক'রে প্রভুদয়াল বলে : 'হুজুর, টাকা···আমার নেই···কোথায়ও লুকিয়ে রাখি নি। নেই তো লুকিয়ে রাখব কি ? কিন্তু আমার কারখানায় আমার মাল-পত্র আছে·· আমি বলছি আমার পাওনাদারদের পাই পয়সা পর্যন্ত চুকিয়ে দেব।'

পাণ্ডে খাঁ গর্জন ক'রে ওঠে : 'খবরদার। কুত্তার মতো কেঁউ-কেঁউ ক'রে মিথ্যে বলবি না হারামজাদা!'

প্রভুদয়াল আর্তনাদ ক'রে উঠল : 'আমি সত্যি কথাই বলছি হুজুর।'

সোজা মুখের ওপর জোরে এক ঘা বেত বসিয়ে দিয়ে পাণ্ডে খাঁ ব্যঙ্গ ক'রে উঠল : 'বেহেস্তের ফেরাস্তা আমার···সত্যি ছাড়া মিথ্যে জানেন না!'

বদ্ধ হাত ওপরের দিকে তুলে প্রভুদয়াল চিৎকার ক'রে ওঠে : 'সত্যি···সত্যিই বলেছি আমি।'

'তাহলে বলতে চাস্ যে থানাদার সাহেব মিথ্যে বলছেন ? পুলিশ-ইনস্পেক্টর সাহেবও মিথ্যে বলছেন ? দেরি করিস্ না···শিগ্‌গির বল···বল শিগ্‌গির।'

কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে বেতের আঘাত তাল দিতে থাকে···প্রত্যেক আঘাতের সঙ্গে সঙ্গে উত্তেজনা বেড়ে ওঠে···উত্তেজনা বেড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে আঘাতও তীব্রতর হয়ে ওঠে।

মুন্নু আর তুলসী সঙ্গে সঙ্গে এসেছিল। তারা দু'জনেই আর থাকতে না পেরে চিৎকার ক'রে বলে উঠল : 'দোহাই হুজুর···আর মারবেন না···আর মারবেন না···ও'র দোষ নেই···দোষ যদি কারুর হয়ে থাকে তা গণপতজীর···'

পাণ্ডে খাঁ নিশ্বাস নেবার জন্যে হাত থামায়।

পুলিশ ইনস্‌পেক্টর সাহেব পাণ্ডে খাঁর গায়ে আঘাত ক'রে দেখিয়ে দিয়ে বলে : 'এইভাবে জোরে মারো, তবে না কাজ হবে!'

তারপর কৌতূহলী জনতার দিকে ফিরে গর্জন ক'রে ওঠে : 'যাও—'

সাহেবের কণ্ঠস্বরের রেশ থামতে-না-থামতে থানাদার হেঁকে ওঠে : 'এখানে কি চাস্ তোরা ? পালা···পালা এখান থেকে···মেলা বসেছে ? মেলা দেখতে এসেছিস বেটারা ? পালা বলছি!'

বলতে বলতে থানাদার হাতের লাঠি দিয়ে মুন্নু আর তুলসীর ওপর দু'ঘা বসিয়ে দেয়।

প্রভুদয়াল বলে ওঠে: 'দোহাই হুজুর, মারতে হয় আমাকে মারুন, নিরীহ ওরা···ওদের মারছেন কেন?'

পাণ্ডে খাঁ বেত উঁচিয়ে বলে: 'চুপ কর শুয়োরের বাচ্চা। নিজের পিঠ আগে সামলা···তোর ওপর দয়া করতে গিয়ে সাহেবের মার খেতে হলো আমাকে···তার শোধ আমি নেবো তবে ছাড়ব···'

কথার সঙ্গে সঙ্গে বেত পড়তে থাকে···ক্রমে বেত আর দেখা যায় না···বাতাসে শুধু বেত যাওয়া-আসার একটা ক্রমান্বয় শব্দ শোনা যায়···

জ্ঞানহারা প্রভুদয়াল যেন স্বপ্নের ঘোরে চিৎকার করে: 'ভগবান! ভগবান! তুমি কোথায়!'

দূরে সরে গিয়ে মুন্নু, তুলসী আর বোঙ্গা শুধু চেয়ে থাকে···একবার প্রভু-দয়ালের দিকে···আর-একবার নির্মম নির্মেঘ শূন্যের দিকে···অন্তরের অন্তস্তল যেন তাদেরকে লৌহ শলাকা বিদ্ধ করেছে···কিন্তু চোখে তাদের অশ্রু নেই। যন্ত্রণায় বুক ভেঙে পড়েছে···তারা জানে না কেমন ক'রে তাকে সহ্য ক'রে থাকা যায় কেমন ক'রেই বা তাকে প্রকাশ করা যায়, তাও ভেবে পায় না তারা। সেই অবস্থায় তারা তিনজনে বাড়ি ফিরে এল···তাদের চেহারা দেখলে মনে হয় যেন শ্মশান থেকে এই মাত্র কাউকে দাহ ক'রে ফিরছে···

উঠোন পেরিয়ে ঘরের ভেতর ঢুকল···তাদের পায়ের শব্দ ছাড়া আর কোন শব্দ নেই···সমস্ত চুপচাপ···থমথম করছে···পার্বতীর চোখের জলে ঘর-দোর সব ভিজে গিয়েছে।

ঘরে ঢুকে মুন্নু দেখে, জানালার ধারে মাটিতে পার্বতী পড়ে আছে···মনে হচ্ছে যেন তার সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তাল পাকিয়ে গিয়েছে···অসাড় কি একটা যেন তাল পাকিয়ে পড়ে আছে। অন্তরের সহজ প্রেরণায় মুন্নু তাড়াতাড়ি তার দিকে ছুটে যেতেই ঘরের মাঝ বরাবর গিয়ে হঠাৎ থেমে গেল। ছেলেবেলায় মাঠ থেকে কাজ সেরে কিংবা খেলা শেষ ক'রে যখন সে বাড়িতে ফিরত, তখন এমনি-ধারা মাকে দেখলেই মার কাছে আগে ছুটে যেতে তার ইচ্ছে জাগত···তেমনি সে আজও ছুটে এসেছিল কিন্তু আজ আর সে শিশু নয়···তার মনের

মধ্যে সে সহসা অনুভব করে, কিসের যেন একটা পরিবর্তন ঘটে গিয়েছে···কিসে যেন আজ তার পা আটকে ধরে···সে তেমনি ক'রে পার্বতীর বুকে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে না।

তুলসী ডেকে বলে ঃ 'মুন্নু বরঞ্চ একটু বাইরে বস···একটু বিশ্রাম কর।'

পার্বতীর অশ্রু-রুদ্ধ চাপা কান্না মুন্নুকে আচ্ছন্ন ক'রে ফেলে···আশেপাশে সে কিছুই যেন দেখতে পায় না···কিছুই শুনতে পায় না।

সমস্ত ঘর নিস্তব্ধ···বেদনাবিদ্ধ অপরূপ নিস্তব্ধতা···কান্নার জোয়ার ভেঙে পড়বার ঠিকপূর্ব-মুহূর্তে···সেখানে কোন শব্দ করা···এমন কি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলা···একটু নড়াচড়া মুন্নুর মনে হলো যেন ঘোরতর অন্যায় হবে।

সেই সঙ্গে তার চিন্তার গতি পর্যন্ত যেন থেমে যায়···ফ্যালফ্যাল ক'রে সে ঘরের চারদিকে চেয়ে থাকে···মাজা বাসনগুলোর ওপর আলো পড়ে ঝিকমিক করছে··মাটির কলসী দুটোর গায়ে হাতে-আঁকা ফুল-লতা-পাতা দাঁড়িতে ঝোলানো বিছানার চাদরের গায়ে ছাপানো সব আমের ছবি···সব যেন তার চোখে এসে বিঁধতে থাকে···তাকে উত্ত্যক্ত ক'রে তোলে···

ভেঙে পড়ল জোয়ার চাপা-কান্নার বাঁধ। পার্বতী ডাক ছেড়ে কেঁদে উঠল। মুন্নু পারল না আর চুপটি ক'রে দাঁড়িয়ে থাকতে। পার্বতীর কাছে ছুটে গিয়ে সেও কেঁদে ওঠে ঃ 'আপনি উঠুন···উঠুন আপনি!' পাশে বসে নতজানু হয়ে পার্বতীর হাত ধরে টানে ঃ 'উঠুন···পায়ে পড়ছি উঠুন!'

পার্বতীর কান্না আরও তীব্র হয়ে ওঠে।

'ওরে, আমি কোথায় যাব···কি করব কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না রে!'

আস্তে আস্তে মাথা তুলে মুন্নুর কাঁধের ওপর রাখে।

মুন্নুর মনে হয় পার্বতীর সেই তপ্ত দীর্ঘশ্বাস, তার অশ্রুধৌত গণ্ডের সেই সজল সুকোমলতা যেন তার চামড়া ফুঁড়ে ভেতরে গিয়ে লাগছে। সে আড়ষ্ট হয়ে ওঠে।

কান্না-ভাঙা দু'টি ঠোঁটের মৃদু কম্পন ভুলে-যাওয়া কোন অস্পষ্ট স্মৃতিকে সহসা জাগিয়ে তোলে···একদা কবে বিস্মৃত-শৈশবের ঘুমে-ভরা রাত্রিতে এমনিধারা স্নেহ-ভরা দুটি ঠোঁটের মৃদু কম্পন তার মায়ের স্মৃতির সঙ্গে মনের

অবচেতনার অন্ধকারে ছিল সঞ্চিত হয়ে···আজ সহসা সেই অবচেতনার অন্ধকার তল থেকে তা যেন ভেসে উঠল সব চেতনার ওপরে।

মুন্নু আকুল আবেগে জড়িয়ে ধরে পার্বতীকে···স্পষ্ট অনুভব করে কান্নায় কাঁপছে তার সারা দেহ···ছুঁড়ে ফেলে দেয় আত্ম-চেতনার নিগ্রহের বোঝা···হাঁফ ছেড়ে বাঁচে। সেই উত্তপ্ত স্পর্শের অন্তরঙ্গতার মধ্যে কয়েক মুহূর্তের মতো সে যেন বিলুপ্ত হয়ে যায় সম্পূর্ণভাবে···চারদিকে তার অন্ধকার, ঘন অন্ধকার, সে-সমুদ্রে যেন সহসা সে যায় তলিয়ে। এক দুরন্ত আবেগ বিপুল বেদনায় তার রক্তে তোলে ঢেউ···চোখ ফেটে সে ঢেউ তপ্ত অশ্রুতে পড়ে গড়িয়ে। অভূতপূর্ব বেদনার সুতীব্র পীড়নে ভেঙে গুঁড়িয়ে যায় দেহ মন।

চিৎকার ক'রে কেঁদে সে বলে ওঠে: 'কেঁদো না তোমার পায়ে পড়ি, কেঁদো না মা।'

কাঁদতে কাঁদতে পার্ব্বতী বলে: 'তুই কাঁদিস না, বাছা···কাঁদতে নেই, ওরে···'

বাইরে তখন সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে। হঠাৎ সিঁড়ির দিক থেকে যেন কার পায়ের শব্দ এল···কে যেন আস্তে সিঁড়ি দিয়ে উঠছে···ক্লান্তপদে—

কান্নার মধ্যে দিয়ে সে-শব্দ শুনতে পায় না পার্বতী আর মুন্নু।

হঠাৎ বাইরে থেকে তুলসী চিৎকার ক'রে উঠল: 'মুন্নু···মুন্নু · কত্তা ফিরে এসেছে···ওরে কত্তা ফিরে এসেছে!'

টলতে টলতে প্রভুদয়াল ঘরে ঢুকেই একটা খাটের ওপর লুটিয়ে পড়ে।

'একি! তোমরা দু'জনে করছ কি? কাঁদছ? কেন আমি কি মরে গিয়েছি?'

ম্লান···পাংশু···মুখ। সারা দেহ ঠকঠক ক'রে কাঁপছে।

মুন্নু ছুটে এসে পায়ে লুটিয়ে পড়ে: 'তা'হলে ছেড়ে দিয়েছে ওরা?'

মুন্নুর দিকে চেয়ে নির্বাক পার্বতীকে শুনিয়ে প্রভুদয়াল বলে: 'হ্যাঁ, দেবে না তো কি? মিছি মিছি···উঃ···কোন ওয়ারেণ্ট নেই···কোন প্রমাণ নেই! দেউলে আমি···কিন্তু কারুর পাই-পয়সা আমি মারব না···উঃ··· অকারণে পুলিশের লোকেরা আমাকে মারল···আমার হাড় যেন ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়েছে গো···একটা লেপ···কাঁথা···যা হোক কিছু দাও···ভয়ানক শীত

করছে…উঃ…' প্রভুদয়াল কাঁপতে কাঁপতে খাটিয়াতে লুটিয়ে পড়ে…বিকারের ঝোঁকে অস্পষ্ট কি সব বকতে থাকে…অবশেষে অচৈতন্য হয়ে পড়ে…ছেঁড়া জামার ভেতর দিয়ে কাল-শিরার দাগগুলো ফুলে উঠেছে…চাপচাপ রক্ত শুকিয়ে গায়ের সঙ্গে লেগে রয়েছে…

ডাক্তার আনবার জন্য তুলসী, মহারাজ আর বোঙ্গাকে সঙ্গে নিয়ে ছুটে বেরিয়ে পড়ে।

পার্বতী সজোরে কান্না রোধ ক'রে লেপ দিয়ে সর্বাঙ্গ ঢেকে দেয়…তার পর…স্বামীকে জড়িয়ে ধরে বিছানার পাশেই লুটিয়ে পড়ে।

॥ ছয় ॥

গভীর রাত্রিতে তুলসী আর মুন্নু নীরবে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ে। এতদিন যার অন্ন খেয়ে এসেছ আজ যদি তার দুর্দিনে তাকে তারা একটুও সাহায্য করতে পারে!

পথ চলতে তুলসী বলে: 'যেমন করেই হোক, কিছু রোজগার করতে হবে কত্তার জন্যে…'

মুন্নু বলে: 'আমিও তাই ভাবছি…কিন্তু কি করতে পারি?'

'মোট বইবো। ভোর-না হতেই গমের বাজারে মুটের দরকার হয়। মোট পেতে হলে, রাত্তির বেলা বাজারের কাছেই কোথাও শুয়ে থাকতে হবে—'

তাদের পাড়ার গলি ছাড়িয়ে, পাপাদুম্ বাজার পেরিয়ে, তারা চলে গমের বাজারের দিকে। কারুর মুখে আর কোন কথা নেই।

অন্ধকার রাত্রি। আকাশে নাম-মাত্র চাঁদ আছে। তেমনি গরম, কোথাও এতটুকু বাতাস নেই। সারাদিন উত্তেজনায় আর পরিশ্রমে দেহ আর চলে না। পথ চলতে যেন ভেঙে পড়ে। একমাত্র চিন্তা, কোনরকমে কোথাও যদি দেহটাকে এলিয়ে দেওয়া যায়…বিশ্রাম…শান্তি…

গমের বাজারে পেঁছে দেখে শোবার জায়গা বলতে কোথাও কিছু নেই। চারদিকে গমের সব আড়ত, মাঝখানে খানিকটা খোলা জায়গা। সেখানে তাদের আগে থাকতেই মানুষে আর জন্তুতে মিলে জায়গাটা দখল ক'রে নিয়ে আছে। গরুর গাড়ি, বিচুলি, শুকনো ঘাসে…সারাদিনের আবর্জনা…তারই

মধ্যে সারাদিন খাটুনির পর, যে যেখানে পেরেছে মাটিতে শুয়ে পড়েছে···গরু-মোষ-মানুষ—সব একসঙ্গে। বদ্ধ হাওয়ায় পচা খোলা ড্রেনের দুর্গন্ধের সঙ্গে গোবর, চোনা, গম-পচানি, কুলিদের গায়ের ঘেমো-গন্ধ, আর তার সঙ্গে গরু-মোষের গায়ের বোটকা গন্ধ মিশে এমন এক অপরূপ সুবাসের সৃষ্টি হয়েছে যে মন্নুর দম আটকে আসতে লাগল। তবুও কোথাও এতটুকু স্থান পড়ে নেই।

হঠাৎ মন্নুর মনে হলো, সারা গায়ে একসঙ্গে কে যেন হাজারটা পিন্ ফুটিয়ে দিল। দু'হাত তুলে সে চিৎকার ক'রে উঠতে গিয়ে দেখে, তুলসীরও সেই অবস্থা!

'আাঃ, বাবারে! কি মশা! শালা···'

অন্ধকারে কে একজন কুলি বলে উঠল: 'শালা বলে কোন্ শালা রে?'

তুলসী আর মন্নু দেখে, তাদের পায়ের কাছেই একজন কুলি শুয়ে আছে। তাড়াতাড়ি তুলসী ঘুরিয়ে বলে: 'আরে ভাই, তোমাকে বলব কেন? এই মশাকে বলছিলাম···উঃ কি মশা!'

এমন সময় পেছন থেকে আর-একজন জিজ্ঞেস ক'রে উঠল: 'কে হে?'

তুলসীর গায়ে একটা ফরশা জামা ছিল, তাই মন্নুর ভয় হলো, সে যদি কুলি ব'লে পরিচয় দেয়, হয়ত তারা বিশ্বাস করবে না। তাই নিজের খালি গায়ের দিকে চেয়ে খানিকটা আশ্বস্তভাবেই মন্নু বলে উঠল: 'আমরা কুলি!'

'এখানে আর কারুর জায়গা হবে না···ভাগো।'

এবার যে লোকটি কথা বলে উঠল, মন্নু চেয়ে দেখে, তার সর্বাঙ্গে অন্ধকার চিকমিক করছে। মশার হাত থেকে আত্মরক্ষা করবার জন্য সারা গায়ে তেল মেখে শুয়ে আছে।

সত্যিই সেখানে কোথায় জায়গা? কোন রকম লোকের গা বাঁচিয়ে সেই গোলকধাঁধার মধ্যে দিয়ে তারা এগিয়ে চলে।

'কোন্ রে?'

হঠাৎ অন্ধকার চিরে একটা গম্ভীর আওয়াজ আসে। একধারে এক খাটিয়ার ওপর চৌকিদার সাহেব লাঠি পাশে নিয়ে ঘুমিয়ে পাহারা দিচ্ছিলেন।

মন্নু আর তুলসী থমকে দাঁড়ায়।

চৌকিদার হাঁকে: 'চোর নাকি রে!'

'না আমরা কুলি!' মুন্নু জবাব দেয়।

'আরে, এখান থেকে সরে পড়…এক্ষুনি সরে পড়…এ দোকানের সামনে কেউ শুতে পারবি না…দোকানে তহবিল থাকে কিনা!'

'জো হুকুম মহারাজ!'

চৌকিদার সাহেবকে অভিবাদন জানিয়ে তুলসী, মুন্নুর হাত ধরে উত্তরমুখে খানিকটা খোলা জায়গা দেখতে পেয়ে এগিয়ে যায়। কাছে যেতেই মনে হলো অন্ধকার মাটিতে, কারা যেন নড়ে উঠল। কতলোক যে পাশাপাশি গড়াগড়ি দিচ্ছে…তার কোন আন্দাজই তারা করতে পারে না। তবে ঘুমোবার প্রাণান্ত চেষ্টায় তারা কেউই ঘুমোতে পারছে না। এ-পাশ, আর ও-পাশ ফিরছে… কাশছে থুতু ফেলছে…আর সেই অনড়-অচল-দুর্দান্ত গরমকে অভিশাপ দিয়ে যে যার ইষ্টদেবতার নাম স্মরণ করছে: 'রাম-রাম, হরি-হরি'…'মহাদেও'…

ঠাকুর-দেবতার নাম শোনবার মতো মনের অবস্থা তখন মুন্নুর ছিল না। বিশেষ ক'রে আজ একটু আগেই প্রভুদয়ালের দুর্দশা দেখে তার মনে ঘোরতর সন্দেহ এসে গিয়েছিল, সত্যি সত্যি ভগবান বলে মাথার ওপরে কেউ আছে কিনা…আর থাকলেও লোকে কেন তাকে দয়াময় বলে মুন্নু বুঝতে পারে না!

তুলসীকে সেখান থেকে হাত ধরে টেনে নিয়ে কিছুদূর অগ্রসর হতে-না-হতে মুন্নু দেখল এক জায়গায় রাশীকৃত ভর্তি বস্তা থাকের-পর-থাক উঁচু হয়ে পড়ে আছে। তার ওপর একটা মস্ত বড় তেরপাল ঢাকা দেওয়া হয়েছে। মুন্নুর মাথায় একটা মতলব এসে গেল…এর ওপর তো দিব্য শুয়ে থাকতে পারা যায়! বনবিড়ালের মতো সে বস্তার ওপর পা রেখে ওপরে গিয়ে উঠল এবং হাত বাড়িয়ে তুলসীকেও তুলে নিল। একবার চারদিকে চেয়ে দেখল, না চৌকিদার দেখতে পায় নি।

সেইখানেই শ্রান্ত দেহ কোন রকমে বেঁকিয়ে এলিয়ে দিল।

রাত্রির গুমোট কেটে কখন ধীরে ধীরে উঠেছে উষার মৃদু-মন্দ বাতাস… ঘুমের মধ্যে তা লক্ষ্য না করলেও, সেই ঠাণ্ডা হাওয়ায় ঘুম নিবিড় হয়ে ওঠে… মুন্নু আরামে গমভর্তি বস্তাকেই জড়িয়ে ধরে, যেন বস্তা নয়, নিদ্রাতপ্ত নারীর কোল। বাইরে তখন পাশের তাঁতি-পাড়ায় মোরগেরা নিত্যকর্ম-পদ্ধতি-অনুযায়ী প্রভাতী-বন্দনায় ডাক তুলেছে, দোকানের চালে, গাছের ডালে চড়ুই পাখীরা

শুরু করেছে কিচিরমিচির, প্রভাতের এই প্রাথমিক ঐকতান-বাসরে কাকেরাও হয়েছে জমায়েত। অভ্যাসবশে কুলিরা সেই শব্দে যে-যার মাটির বিছানা ছেড়ে উঠে পড়েছে⋯সেই সঙ্গে খোঁড়া কুকুরটা, গরুর গাড়ির গরুগুলো এবং স্থানীয় ভক্তিমান্ সব হিন্দু আড়তদাররাও জেগে যে-যার কাজ শুরু ক'রে দিয়েছে। জাগতে পারে নি শুধু তুলসী আর মুন্নু।

কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই সূঁচের মতো সকালের তাজা রোদ তাদের দেহে এসে বিঁধতেই, মুন্নু ধড়মড় ক'রে উঠে বসল⋯গলা শুকিয়ে কাঠ⋯ঠাণ্ডায় চোখ গিয়েছে জুড়ে⋯সারা অঙ্গ ব্যথায় ভারী! কোন রকমে হাত দিয়ে সে তুলসীকে ঠেলে তোলে।

চোখ রগড়াতে রগড়াতে তুলসী উঠে বসে।

মুন্নু চারিদিকে চেয়ে দেখে, ভাবে, এখন কি ক'রে শুরু করা যায় কাজ!

আড়তে তখন দিনের কাজ আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। বিস্মিত হয়ে মুন্নু দেখে, এমন বিচিত্র মানুষের সংমিশ্রণ সে এর আগে আর কখনও দেখেনি! হিন্দু কুলি সে অনেক দেখেছে কিন্তু হিন্দু, মুসলমান, শিখ—বিভিন্ন জাতের এবং বিভিন্ন ধর্মের এত লোক, এত কাছাকাছি এমনিভাবে সব একসঙ্গে উঠছে, বসছে, খাচ্ছে, শুচ্ছে—সে ধারণাই করতে পারে না। সকলের চেয়ে তার আশ্চর্য লাগল, কই, কেউ তো জাত গেল বলে কোন প্রতিবাদ করছে না! তাতে মুন্নু মনে মনে খুশীই হয়। এই খুশী হবার পেছনে, একটা ব্যক্তিগত কারণ লুকিয়ে ছিল। রোজ বাজারের পথ দিয়ে যেতে সে দেখত মুসলমান সরাইওয়ালার দোকানে গোস-রুটি দেখে দেখে তার জিভে জল আসত! সেই ফুলো ফুলো মোটা মোটা রুটিগুলো যেন তাকে ডাকত। একদিন লুকিয়ে সে একটা দোকানে ঢুকে পড়ে এবং আকাঙ্ক্ষাকে পরিতৃপ্ত ক'রে যখন বেরিয়ে আসে, তখন সে নিজের মনে আত্মবিচার ক'রে দেখেছিল⋯বিশেষ কোন একটা বিপর্যয় কাণ্ড ঘটে গেল বলে তার মনে কোন বৈলক্ষণ দেখা গেল না⋯শুধু একটা নতুন অভিজ্ঞতা তার হলো, মাংসটা হিন্দুদের চেয়ে মুসলমানেরাই রাঁধে ভালো। তাই আজ যখন সে চোখের সামনে দেখল, একজন রাজপুত হিন্দু-কুলি বিনা দ্বিধায় একজন দাড়িওয়ালা মুসলমান কুলির মুখের হুকো টেনে নিয়ে আরামে ধোঁয়া

বোধ হয় কুলিরা একটা কিছু গোপন কায়দা জানে, সেটা ঠিক লক্ষ্য করে নি, যার জন্যে সে কিছুতেই তুলতে পারছে না ! নিজেই সে চেষ্টা করতে করতে যদি সে-কায়দাটা বেরিয়ে পড়ে। ঘামে তার সারা দেহ ভিজে উঠল কিন্তু কিছুতেই সে কায়দার খোঁজ পেল না। বস্তাও তুলতে পারল না।

একদফা তুলে দিয়ে কুলিরা তখন দোসরা দফার জন্য এসেছে। মুন্নু তখনও প্রাণান্ত চেষ্টা করছে।

তার দুরবস্থা দেখে একজন কুলি বলে উঠল :

'আরে···একি তোর কাজ ? মারা পড়বি···তার চেয়ে তরিতরকারির বাজারে যা···সেখানে হালকা মোট পাবি···বুঝলি ?'

মুন্নুকে রোজগার করতেই হবে···তার মনিব আর মনিবানীর আজ বড় অভাব।

তুলসীকে ডেকে বলে : 'এই, তুই আমার পিঠে বস্তাটা তুলে দেতো একটু !'

তুলসী তাই দেয়।

মোট নিয়ে মুন্নু কাঁপতে কাঁপতে সোজা হয়ে দাঁড়াতে চেষ্টা করে। মনে হয়, ওপর থেকে কে যেন দেহটাকে মাটির দিকে টানছে। শরীরের সমস্ত শক্তি জড় ক'রে সে পা বাড়ায়···এক পা···দু পা···তিন পা। তার পর বোঝার ভারে সে আপনা থেকেই খানিকটা এগিয়ে যায়। দরজার কাছে এসে বাধা পড়ে। দরজাটা ডিঙিয়ে যেতে হবে। ডিঙোতে গিয়ে পায়ে পা জড়িয়ে যায়। মোটসুদ্ধ মুন্নু মাটিতে ছিটকে গিয়ে পড়ে।

সঙ্গে সঙ্গে দোকানের ভেতর থেকে আড়তদার ক্ষেপে ছুটে আসে, মুন্নুর মা এবং বোনের সঙ্গে সকল রকম সম্পর্ক স্থাপন ক'রে সে চিৎকার ক'রে ওঠে : 'ব্যাটার ছেলে, মার পেট থেকে বেরিয়ে এসেই মোট বইতে এসেছে ! কে তোকে বস্তায় হাত দিতে দিল রে হারামজাদা ! বেরো···বেরো এখুনি···নইলে খুন ক'রে ফেলব···'

কোথায় লাগল তা' দেখবার কোন চেষ্টাই না ক'রে কোনরকমে উঠে দাঁড়িয়ে ছুটতে আরম্ভ করে···যার দোকানের সামনে দিয়ে যায়, সেই হই হই ক'রে গালাগাল দিয়ে ওঠে। মুন্নু প্রাণভয়ে ছুটতে আরম্ভ করে।

কিছু দূরে চলে আসবার পর পেছনে ফিরে দেখে সে দাঁড়িয়ে পড়ে। দরদর

ধারায় তখন সারা দেহ থেকে ঘাম ঝরে পড়ছে। সে স্পষ্ট অনুভব করে সারা দেহ দিয়ে যেন আগুন বেরুচ্ছে। একটা বাড়ির ছায়ায় সে বসে পড়ে।

মনে ভাবে তুলসীর বরাত ভালো সে মোট বইছে···চার আনা নিশ্চয়ই সে রোজগার ক'রে বাড়ি নিয়ে যাবে···আর আমি কিছুই নিয়ে যেতে পারব না ?

নিজের দুর্বলতায় নিজের ওপর ভয়ানক রাগ হয়। কবে বড় হবো···দরকার হলে এমনি মোট অনায়াসে বইতে পারব ?

হঠাৎ তার মনে হলো, রাস্তা দিয়ে যারা যাচ্ছে, তারা সবাই যেন তার দিকে চেয়ে চেয়ে দেখছে। লক্ষ্য ক'রে দেখে বুঝল, এটা বাজার যাবারই পথ। সকাল বেলা লোকে বাজারে চলেছে। মনে পড়ল সেই কুলির কথা ঃ 'বাজারে হালকা মোট ব' গিয়ে যা···'

মুন্নু ঠিক করল, বাজারেই সে যাবে···পয়সা না নিয়ে সে বাড়ি ফিরবে না।

বাজারে ঢুকে সে চারদিকে চেয়ে দেখে। ফলের দোকানের সামনে দিয়ে যেতে যেতে দেখে, ঝুড়ি ঝুড়ি সব পাকা আম। পাকা আমের মিষ্টি গন্ধ নাকে এসে লাগে। গাছ-পাকা···তাজা···সোনালী হলদে রঙ মুন্নুর শুকনো জিভ সজল হয়ে আসে···

'আরে···এই···দুটো পয়সা পাবি···এই মোটটা নিয়ে যেতে পারবি ?'

মুন্নু ফিরে দেখে এক ফলওয়ালা একটা ঝুড়ি নিয়ে তাকে ডাকছে।

কিন্তু তার সাড়া দেবার আগেই কোথা থেকে আর পাঁচজন মুটে ছুটে গিয়ে দোকানের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

'আমি যাবো···হুজুর···'

'আমি যাবো···রাজা···'

মুন্নু সোজা গিয়ে ঝুড়িটাকে আঁকড়ে ধরে। ফলওয়ালার হাত থেকে টেনে নিয়ে মাথায় তুলে নেয়। এতে আর কোন হাঙ্গামা নেই···দিব্যি হালকা। কিন্তু মাত্র দুটো পয়সা ! মুন্নু ফলওয়ালাকে অনুসরণ ক'রে চলে। পথ চলতে তার মনে পড়ে, স্কুলে একটা প্রবাদবাক্য সে পড়েছিল ঃ

'হায় ভগবান। তোমার রাজ্যে এক মুঠো অন্ন···সে এমন দুর্মূল্য···আর মানুষের প্রাণ এতই সস্তা !'

প্রতিদিন প্রভাতে মুন্নু ঘুম থেকে উঠেই বাজারে চলে আসে, তুলসী যায়

পথ হাঁটিয়ে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে যখন দেবে তখন আর বাজারে এসে অন্য মোট বইবার সময় থাকবে না।

এইভাবে সারাদিনের পর তুলসী আর সে যে-আনা-আটেক পয়সা রোজগার ক'রে নিয়ে আসত, তাতে সকলের কোন রকমে নুন-ভাত আর শাক-চচ্চড়ি জুটত।

প্রভুদয়ালের গায়ের ব্যথা সারতে এবং জ্বর ছাড়তে কিছু সময় লাগল কিন্তু জ্বর থেকে উঠেই সে আবার বিছানা নিতে বাধ্য হলো। নীলামে একটা একটা ক'রে তার কারখানার সব জিনিস তার চোখের সামনে বিক্রি হয়ে গেল··· তার ফলে তার স্নায়ু একেবারে ভেঙে পড়ল এবং পক্ষাঘাত রোগীর মতোন অবশ হয়ে সে শয্যা নিল।

সম্পূর্ণ অসহায়ভাবে শুয়ে শুয়ে সে যখন ভাবত, তুলসী আর মুন্নু তার জন্যে কুলিগিরি ক'রে পয়সা নিয়ে আসছে—সে আরও অবশ হয়ে পড়ত। নিজের পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে সে জানত, কুলিগিরি করা মানে কি।

ক্রমশ তার অবস্থা দিন-দিন শোচনীয় হয়ে উঠতে লাগল। ডাক্তার যাঁরা আসতেন, ভিজিটের অভাবে তাঁরা আসা বন্ধ ক'রে দিলেন। এবং শেষজন যাবার সময় উপদেশ দিয়ে গেলেন, শহর থেকে বাইরে না নিয়ে গেলে বাঁচার আর কোন আশাই নেই।

বহু কষ্টে প্রভুদয়ালকে গাঁয়ের বাড়িতে যাবার জন্য রাজী করানো হলো। ঠিক হলো তুলসী রেলে পাঠানকোট পর্যন্ত সঙ্গে যাবে···সেখানে গরুর গাড়িতে তুলে দিয়ে সে ফিরে আসবে। মুন্নুও সেই সঙ্গে যেত কিন্তু সকলের রেল-ভাড়া যোগাড় হয়ে উঠল না। পরে সময় মতো মুন্নু তাদের কাছে গিয়ে উঠবে।

বিদায়ের দিন এল অসহ্য বেদনা নিয়ে। পার্বতী আর প্রভুদয়াল শিশুর মতো কেঁদে উঠল।

মুন্নু এসে প্রভুদয়ালকে একদিনও কাঁদতে দেখে নি। যে-মুখ সর্বদাই তার দিকে চেয়ে হেসেছে, আজ রোগে শোকে সেই মুখ ম্লান, শীর্ণ, বিবর্ণ হয়ে গিয়েছে···তাই যখন প্রভুদয়াল বালকের মতোন কাঁদতে লাগল, সে-মুখের বিচিত্র রেখা দেখে মুন্নু স্তম্ভিত হয়ে গেল···তার কাছে পর্যন্ত সে এগুতে পারল না।

কিন্তু যেই পার্বতী বিদায়ের জন্য তার কাছে এসে দাঁড়াল, অমনি সে তার

বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল···মনে হলো তার বুকের ভেতর যেন একটা ছোট্ট ভীরু পাখী ম্লান মসৃণ অন্ধকারে অসহায়ভাবে ডানা ঝাপটা দিয়ে মরছে···মনে পড়ল, যেদিন সে প্রথম এই বাড়িতে এসে দাঁড়িয়েছিল, একটি স্নিগ্ধ সুন্দর মুখ শুধু একটুখানি হেসে তার মনের সব গ্লানি দূর ক'রে দিয়েছিল···বিপুল বিশ্বে সে-হাসিটুকুর মধ্যে নিমেষে সে খুঁজে পেয়েছিল তার নিজের ঘর···আজও সে অনুভব করে তার অসুখের সময়ে সেই উত্তপ্ত স্পর্শ যা···

সহসা সে আত্ম-সচেতন হয়ে ওঠে···নিজেকে বাহুর বন্ধন থেকে ছিন্ন ক'রে নেয় পার্বতী ডুক্‌রে কেঁদে ওঠে।

তুলসী এসে খবর দেয়, একটা গরুর গাড়ি সে ঠিক করেছে···গাড়িটা গলির মোড়েই দাঁড়িয়ে আছে, সেখানে গিয়ে উঠতে হবে।

তুলসী আর মুন্নুর কাঁধের ওপর ভর দিয়ে, প্রভুদয়াল যাবার জন্য উঠে দাঁড়ায়। ঘরের বাইরে পা বাড়াবার আগে, পেছন ফিরে সে একবার দেখে নেয় ঘরখানা, তার সৌভাগ্য-দিনের সব মুহূর্তগুলি কেটেছে যেখানে। সেখান থেকে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে দেখে সামনে একটা কুলি মোট নিয়ে দাঁড়িয়ে···মোট বলতে শুধু একটা বাক্স আর বিছানা। ঠিক এমন একটা বাক্স আর বিছানা নিয়ে একদিন সে এই বাড়িতে ঢুকেছিল। আর আজ এই বাড়ি ছেড়ে চলে যাবার সময়ও, তার সঙ্গে তার যথা সর্বস্ব বলতে সেই দুটি জিনিস। মাঝখানে সে যা কিছু পেয়েছিল, সবই যেন নিরর্থক।

রোগশীর্ণ ম্লান মুখ ঈষৎ বেঁকিয়ে দার্শনিকের মতো সে বলে ওঠে : 'এই ভালো···এমনিধারাই ঠিক···খালি হাতে পৃথিবীতে আমরা আসি···খালি হাতেই সেখান থেকে চলে যেতে হয় একদিন। একটা কুটোও সঙ্গে ক'রে নিয়ে যেতে পাবে না কেউ···পথ চলতে বোঝা যত হালকা হয়, ততই ভালো···

মুন্নু আর তুলসীর কাঁধে ভর ক'রে প্রভুদয়াল রাস্তার দিকে মুখ ক'রে দাঁড়ায় ···ক্লান্ত···পরিশ্রান্ত···পরাজিত। ধীরে অতি ধীরে পা ফেলে এগিয়ে চলে।

মাথায় ঘোমটা দিয়ে পেছনে নত মস্তকে চলে পার্বতী।

পাড়ার ছেলে-মেয়ে সবাই উঠোনে নীরবে দাঁড়িয়ে।

'রাম···রাম···প্রভুদয়াল ভাই···'

'রাম···রাম··

'সব ঠিক হয়ে যাবে ভাই। আমরা বলছি তোমার সব আবার ফিরে আসবে …শরীরটা সারিয়েই তুমি চলে এসো…'

'দেউলের বদনাম দূর ক'রে যদি ফিরে আসতে পারি…তবেই…' বাইরে গাড়োয়ান দেরি দেখে হাঁক দেয়। সে মনে মনে আঁচ করেছিল, নিশ্চয়ই কোন বড় রইস হবে…রীতিমতো দু-পয়সা বখশিশ আদায় করতে পারবে। কিন্তু যখন দেখল একদল কুলির সঙ্গে একজন কুলির মতন লোক মাত্র একটা ছোট্ট বাক্স নিয়ে গাড়িতে উঠল, রাগে তার সর্ব-শরীর জ্বলে উঠল। প্রভুদয়াল সদলে গাড়ীতে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে সে গাড়ি হাঁকিয়ে চলল…কোন রকমে তাড়াতাড়ি স্টেশনে ফেলে দিয়ে নতুন সোওয়ারীর সন্ধান তাকে করতে হবে। চাবুকের তাড়ায় গরু দুটি ক্ষিপ্ত হয়ে ছুটতে আরম্ভ করল এবং রাস্তার গুণে গাড়িতে এমন ঝাঁকুনি শুরু হলো যে আরোহীদের আসনে বসে থাকা দায় হয়ে উঠল। একে এসব গাড়িতে কোন স্প্রিং-এর বন্দোবস্ত থাকে না, তার ওপর অতিরিক্ত জোরে চালানোর জন্যে ঝাঁকুনিতে প্রভুদয়াল রীতিমতো কাতর হয়ে পড়ল। রোগশয্যার দুর্বলতা তখনও তার বিন্দুমাত্র কাটেনি, মনে হচ্ছিল এই বুঝি 'হার্টফেল' করে। কিন্তু মুখে সে কোন কিছুই প্রতিবাদ জানাল না। সব প্রতিবাদকে সে আজ স্বীকার ক'রে নিয়েছে।

কিন্তু মুন্নু স্থির থাকতে পারল না। গায়োয়ানকে খুশী করার জন্যে সে মুখ বাড়িয়ে বলে উঠল : 'শেখ সাহেব…বলি ও শেখ সাহেব…দয়া ক'রে ভাই একটু আস্তে চালাও!'

গাড়োয়ান চাবুক হাঁকাতে হাঁকাতে জবাব দেয় : 'আরে, রাখ্ রাখ্, আমি তোর বাপের চাকর, না? তোর জন্যে বোম্বে মেলের প্যাসেঞ্জার আমি "মিস" করব না?'

মুন্নুর রাগ হয়। কিন্তু নিস্ফল রাগ। মনে মনে ভাবে, তার মনিবের মতোন এমন ভালো লোকের ওপর কি ক'রে এমন নিষ্ঠুর হতে পারে?

স্টেশনে এসে মুন্নু দেখে থার্ড ক্লাসের যাত্রীরা একটা খাঁচার মতন ছোট জায়গায় সবাই গাদাগাদি ক'রে জড় হয়ে আছে। বাক্স, পোঁট্‌লা, মানুষ… সব এমনভাবে সেই ছোট্ট জায়গাটুকুর মধ্যে ঠাসাঠাসি হয়ে আছে যে দেখে মনে হয়, এক্ষুণি বুঝি দম আটকে সবাই মারা যাবে। ট্রেন ছাড়ার মাত্র পাঁচ মিনিট

আগে দরজা খোলা হবে। মনুস্মু দেখল সেই ভিড় ঠেলে ঠেলে যদি প্রভুদয়াল আর পার্বতীকে নিয়ে যেতে হয়, তাহ'লে প্রভুদয়ালকে আর ট্রেনে চড়াতেই হবে না …সেইখানেই তার এবারকার মতো ভবযাত্রা শেষ হয়ে যাবে।

কি ক'রে এই কারাযন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাওয়া যায়, তার সন্ধানে মনুস্মু এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়ায়—যদি কোথাও কোন ছিদ্র-পথ মিলে যায়।

হঠাৎ দেখে সামনে দিয়ে নিকেলের-বোতামওয়ালা সাদা পোশাক পরা একজন টিকিট কলেক্টর যাচ্ছে…সগর্ব পদক্ষেপে তিনি খুঁজে বেড়াচ্ছেন, কোথা থেকে ঘুষ আদায় করতে পারা যায়। মনুস্মুর চোখে চোখ পড়তেই, বহুদিনের অভিজ্ঞতা থেকে তিনি অনায়াসেই বুঝে নিলেন এই ছেলেটি তাঁর খদ্দের।

মনুস্মুর পাশে এসে কানে কানে বলেন: 'দু' আনা…দু' আনা পেলেই তোকে গাড়িতে তুলে দেব…আর একটা দরজা আছে…'

এই ক'দিনের উপার্জন থেকে মনুস্মুর কাছে তখন মাত্র চার আনা পয়সা ছিল। বিরক্তি না ক'রে মনুস্মু দু'আনা লোকটার হাতে গুঁজে দিল কিন্তু দিয়ে ফেলেই তার মনে ভয় হলো, যদি লোকটা কথা না রাখে!

মনুস্মুর বরাত ভালো…লোকটা গরীব ঘুষ নিল বটে…কিন্তু কথার মানুষ। …কথামতো পাশের একটা ছোট্ট দরজা দিয়ে সে মনুস্মুর দলকে প্লাটফর্মে ঢুকিয়ে দিল। গাড়ি তখন দাঁড়িয়েই ছিল।

তাদের দু'জনকে গাড়িতে তুলে দিয়ে মনুস্মু নিচে জানালার কাছে চুপটি ক'রে দাঁড়িয়ে থাকে। অন্ধকারে যেন তার ভেতরটা থমথম করতে থাকে।

এমন সময়ে প্রভুদয়াল জানালার ভেতর দিয়ে ম্লান-পাংশু মুখটি বার ক'রে মনুস্মুকে ডাকে…তার হাতটা টেনে নিয়ে হাতে একটা টাকা গুঁজে দেয়। অশ্রু ভারাক্রান্ত কণ্ঠে বলে: 'এই দিয়ে যত দিন চলে…এ মাসের বাড়ি ভাড়া আমি চুকিয়ে দিয়ে এসেছি…তুই এ কদিন বাড়িতেই শুবি।'

হাত জোড় ক'রে মনুস্মু বলে: 'জয় দেব!'

ট্রেন নড়ে ওঠে।

মনুস্মুর মাথায় হাত রেখে প্রভুদয়াল বলে: 'দীর্ঘজীবী হও!'

হাত সরে যায়। পার্বতী চোখের জল মুছতে মুছতে আশীর্বাদ করে: 'সুখী হও বাছা!'

ট্রেন চলতে আরম্ভ করে। মুখ বাড়িয়ে তুলসী বলে: 'ভাবিস্ না মুন্নু, আমি দু'দিন পরেই ফিরে আসছি!'

ট্রেন প্লাটফর্ম ছেড়ে চলে যায়।

মুন্নু সেখানে দাঁড়িয়ে থাকে। তার স্থির বিশ্বাস, প্রভুদয়ালের মতো এ-রকম ধার্মিক লোক সে আর দেখে নি···কি ক'রে সে এত ধার্মিক হলো? রোজ সে দেখেছে প্রভুদয়াল নিয়মিত মন্দিরে যেত। মন্দিরে গেলে তাহলে মানুষ ধার্মিক হয়···আমিও রোজ সন্ধ্যাবেলায় যাব···ভক্ত হরদাসের মন্দিরে শুনেছি নাকি বিনা পয়সায় খেতেও দেয়···ঠাকুরের প্রাসাদ···ভালোই হবে, পেটও ভরবে···ধর্মও হবে···

ঘুরতে-ঘুরতে সে যখন ভক্ত হরদাসের মন্দিরে গিয়ে পৌঁছল তখন সন্ধ্যে হয়ে এসেছে। খিদেয় পেটের ভেতর জ্বলছে। ধর্মের চেয়ে তখন বেশী টান ধরেছে রুটির···এক টুকরো রুটির। মন্দিরের সামনে একটা পুষ্করিণী, তার ওপারে সান বাঁধানো ভক্ত হরদাসের সমাধি চত্বর। প্রতি সন্ধায় সেখানে গরীব-দুঃখীদের রুটি আর শাক-চচ্চড়ি বিতরণ করা হয়। স্টেশন থেকে বেরুবার সময় ধর্মের ঐকান্তিক আকর্ষণে সে মনে মনে ঠিক করেছিল যে, মন্দিরে ঠাকুরের পায়ে ছড়াবার জন্য দু'এক পয়সার ফুল কিনে নেবে। কিন্তু সন্ধ্যার মুখে ক্ষুধার আগুনে সে ধর্ম-বোধ ধোঁয়া হয়ে মিলিয়ে যায়।

পুকুরের ধারে অবসন্ন দেহে সে বসে পড়ল। জলের দিকে একদৃষ্টিতে চেয়ে থাকতে থাকতে দেখে, মন্দিরের চুড়াগুলো যেন জলে নেমেছে চাঁদের প্রতিবিম্বের সঙ্গে খেলা করতে। সেখান থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে সেই বিরাট মন্দিরের দিকে নির্বাক বিস্ময়ে চেয়ে থাকে···চেয়ে থাকতে থাকতে কি এক অজানা আতঙ্ক তার মনকে পেয়ে বসে···মনে হয় যেন, কে এক বিরাট পুরুষ অদৃশ্যভাবে এই জায়গাটাতে ভর ক'রে রয়েছে···ভয়ে সে উঠে দাঁড়ায়···সেখান থেকে পালিয়ে যেতে পারলে যেন বাঁচে···সমাগত ভক্তদের ভিড় ঠেলে সে দ্রুত অগ্রসর হতে চেষ্টা করে। তবে ভিড় কাটিয়ে কি ক'রে তাড়াতাড়ি সরে পড়তে হয় সে-বিদ্যা সে দৌলতপুরের বাজারে মুটেগিরি করবার সময় ভালোভাবে আয়ত্ত করেছিল।

সেখান থেকে কিছু দূর গিয়ে সে মন্দিরের আর-এক উঠানে এসে পড়ল। সেখানে দেখে, একধারে একজন ব্রাহ্মণ জল বিতরণ করছে। অবশ্য এই জল

বিনা পয়সাতেই দেওয়া হয়, কিন্তু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মুন্নু লক্ষ্য করল, যারাই জল পান করছে, পান শেষে তারা একটা ক'রে পয়সা ঘরের ভেতর ছুঁড়ে দিচ্ছে। অর্থাৎ পরোক্ষভাবে তৃষ্ণার জল একপয়সায় বিক্রি হচ্ছে। তৃষ্ণায় তখন মুন্নুর গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে এসেছিল। সোজা সে ব্রাহ্মণের সামনে গিয়ে জল চাইল এবং সকলের মতো সে-ও জল পেল। কিন্তু ব্রাহ্মণ যখন দেখল যে পয়সা না দিয়ে পথিক চলে যাচ্ছে, মুন্নুর দিকে ফিরে ক্রুদ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রে গালাগাল দিয়ে উঠল : 'দেবস্থানে একটা পয়সাও দিতে পার না···মরে না বেটারা!'

অভিশাপে আর মুন্নু ভয় করে না। এই অল্প সময়ের মধ্যে অভিশাপ শুনতে শুনতে সে স্পষ্ট বুঝে নিয়েছে যে, তার মধ্যে কোন দৈব-শক্তি বা কোন যাদু নেই।

কিন্তু প্রসাদ কোথায় দিচ্ছে···নিশ্চয়ই সেখানে কোন পয়সার বালাই নেই।

এমন সময় দেখে একজন লোক একটা বালতি নিয়ে চলেছে আর তার পেছনে ঝুড়ি নিয়ে চলেছে আর-একজন লোক। প্রথম লোকটি হেঁকে চলেছে : 'ঠাকুরের পেরসাদ!'

হঠাৎ কোথা থেকে রাজ্যের ভিখিরী দেখতে দেখতে লোকটাকে ঘিরে ফেলে। মুন্নু বুঝল; এই সেই ব্যক্তি, যাকে সে খুঁজছে।

ছুটে লোকটির কাছে সে হাত পেতে দাঁড়াল।

'তোর পাতা কই?' লোকটি জিজ্ঞেস করে।

ততক্ষণ তার প্রসারিত হাতের ওপর ঝুড়িওয়ালা লোকটি দু'খানি চাপাটি ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে এবং বালতিওয়ালা বালতি থেকে খানিকটা শাক দিয়েছে। খাবার নিয়ে বেরিয়ে আসতে গিয়ে ক্ষুধার্ত উন্মাদ জনতার ধাক্কায় হাত থেকে তা পড়ে যাবার উপক্রম হলো। বহু কসরত ক'রে কোন রকমে মাটিতে পড়তে না দিয়ে সে ভিড় ঠেলে বাইরে এল। সেখান থেকে বেরিয়ে বাগানের ধারে একটা ফোয়ারা দেখতে পেয়ে সেখানে বসে পড়ল। বাগান থেকে তখন সদ্যফোটা চামেলী-চম্পকের গন্ধ বাতাসে ভেসে আসছিল।

তখন তার একমাত্র দৃষ্টি হাতের সেই দু'খানি চাপাটির দিকে। ক্ষুধা দূর না হলেও দু'খানি চাপাটিতে পেটের সেই জ্বালানিটা বন্ধ হলো। তখন সে চোখ তুলে চারদিকে চেয়ে দেখল।

দেখল, যেখানে সে বসে আছে, তার সামনেই একটা ছোট্ট বাগানবাড়ি, চাঁদের আলোয় তার খানিকটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, আর খানিকটা আবছায়া অন্ধকার। সেখানে বসে মুণ্ডিত মস্তক গৈরিকধারী এক যোগী এক দৃষ্টিতে ঝর্ণার দিকে চেয়ে বসে আছেন। পদ্মাসনে বসে তিনি হাঁটুর ওপর হাতটি অতি সন্তর্পণে রেখেছেন, সামনে নতজানু একজন বৃদ্ধা···বৃদ্ধার পাশে সুসজ্জিতা এক তরুণী। বৃদ্ধা ও তরুণী চুপটি ক'রে বসে আছে, যোগীবরের ধ্যান ভাঙবার অপেক্ষায়। মুন্নু সেখান থেকে গুটি গুটি যোগীর সামনে এগিয়ে আসে।

'কে হে তুমি বালক? এটা হলো যোগীর আশ্রম···এখানে তোমার কি প্রয়োজন? যাও, তোমার সমবয়সীদের সঙ্গে খেলা করো গে···যাও!'

সে-কথার কোন জবাব না দিয়ে উলটে মুন্নু জিজ্ঞেস করে: 'যোগীজী, চোখের পাতা না ফেলে আপনি এ-রকম চুপটি ক'রে বসে থাকেন কেন?'

বৃদ্ধা ধমকে উঠল: 'পালা, পালা, পালা ছোঁড়া!'

যোগীজনসুলভ অমায়িক মাধুর্যে ডান হাতটি তুলে যোগীবর ব'লে উঠলেন: 'শান্তি! শান্তি! আহা···অতি শুভলক্ষণ, অতি শুভলক্ষণ···আপনার পুত্রবধূর যে সন্তান হবে, এই বালক হলো তার অগ্রদূত। ভগবান আমার প্রার্থনা শুনেছেন তাই স্বয়ং বালককে পাঠিয়েছেন···ভগবানের দূত···একে কি তাড়াতে আছে মা?'

মুন্নু অধীরভাবে বলে ওঠে: 'যোগাজী আমিও ভগবানকে খুঁজছি আপনি আমাকে শিখিয়ে দেবেন, কি ক'রে তাঁর দেখা পাওয়া যায়?'

যোগীবর বলেন: 'তুমি এখনও বালক, অপ্রাপ্ত বয়স্ক···তবে তোমার অনুরাগ দেখে মনে হচ্ছে, তুমি পারবে···আমি তোমাকে শিষ্য ক'রে নেব···গুরুর কথা যদি যথাযুক্তভাবে পালন কর, আমি বলছি তুমি কালে একজন সাধুপুরুষ হবে!'

যোগীবরের পাশে স্তূপীকৃত ফল এবং নানাবিধ খাদ্যসম্ভারের দিকে চেয়ে মুন্নু বলে উঠল: 'সত্যি···আমি খুঁজছি একজন গুরু···আমাকে আপনার শিষ্য ক'রে নিন!'

'বেশ···তাই হবে···এই জিনিসগুলো তুলে নিয়ে আমার সঙ্গে সঙ্গে তা'হলে আয়!'

আসন থেকে উঠে দাঁড়িয়ে বৃদ্ধার কানে চুপি চুপি বলেন : 'আজ পূর্ণিমা ···বীজ বপনের আজ উপযুক্ত লগ্ন। তুমি মা তোমার পুত্রবধূকে সঙ্গে নিয়ে এই ছেলেটির পিছু পিছু এস। আমি একটু এগিয়ে যাব। সামনেই আমার আস্তানা। সাবধান, লোকে যেন বুঝতে না পারে যে আমার সঙ্গে আসছ···কার মনে কি আছে কে বলতে পারে? বুঝলে? একটু দূরে দূরে আসবে···'

তারপর মন্নুকে ডেকে আদেশ করেন : 'তুই আমার পিছু পিছু একশো হাত দূরে দূরে আসবি, বুঝলি? ওদের সঙ্গে ক'রে নিয়ে আমার বাড়ির পেছন দিক্কার সিঁড়ি দিয়ে উঠবি···আমি দেখিয়ে দেব'খন। খুব সাবধানে আসবি··· যেন পথ হারিয়ে ফেলিস্ নি!'

যোগীবরের কি উদ্দেশ্য আর কিই বা ঘটছে মন্নু তার কিছুই বুঝতে পারে না, কিন্তু বোঝবার দরকারই বা কি! সে বেরিয়েছে এ্যাডভেঞ্চারের খোঁজে···

তার ওপর তাজা পাকা সব ফল···একেবারে তার হাতের মুঠোর মধ্যে··· তীব্র সুগন্ধ নাকে এসে লাগছে আঙুর, বেদানা, আপেল···তাজা পুরুষ্টু মর্তমান কলা···সুতরাং ভেবে কি লাভ? সাধুবাবার কথা সে অক্ষরে অক্ষরে পালন করবেই।

হঠাৎ গলির বাঁকে এসে মন্নু দেখে, সাধুবাবাকে সে হারিয়ে ফেলেছে···কি সর্বনাশ! এই তো সামনে যাচ্ছিলেন! কোথায় গেলেন? এদিক্ ওদিক্ চোখ ঘুরিয়ে দেখতেই দেখতে পেল, সামনের একটা বাড়ির একতলার জানালা থেকে তিনি হাতছানি দিয়ে ডাকছেন? তখন অনুসরণকারিণীরা পেছনে পড়েছিল··· একটু অপেক্ষা করতেই তারা এসে পড়ল। তাদের সঙ্গে নিয়ে মন্নু হাতছানি লক্ষ্য ক'রে অগ্রসর হলো।

বাড়ির সামনে আসতেই মন্নু দেখে সাধুবাবা নিজে একটা লণ্ঠন নিয়ে তাদের অভ্যর্থনার জন্যে নিচে নেমে এসেছেন। আগে আগে লণ্ঠন ধরে তাদের নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে তিনি ওপরের একটা ঘরে ঢুকলেন। ঘরের চারদিকে তাকিয়ে মন্নুর মনে হলো, যেন কোন বড়লোকের বাড়িতে সে ঢুকেছে। ধবধবে সাদা বিছানা···পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন গদি-আঁটা চেয়ার···মেজেতে ফরাশ পাতা!— চারদিকে লম্বা লম্বা নলওয়ালা আলবোলা।

ঘরে ঢুকেই বুন্ধা সাধুবাবাকে বলে : 'আমি তা'হলে এখন আসি···ভোর না হতেই এসে বৌমাকে নিয়ে যাব, কেমন মোহন্ত মহারাজ ?'

উত্তেজিতভাবে মোহন্ত মহারাজ বলে ওঠেন : 'হাঁ···হাঁ···'

কি বলবে বা কি করবে ঠিক করতে না পেরে মুন্মু ফ্যালফ্যাল ক'রে চেয়ে থাকে।

বুন্ধা চলে যাওয়ায় সঙ্গে সঙ্গে যোগীবর সেই অবগুণ্ঠিতা তরুণীর কাছে এগিয়ে আসে···দু'হাত বাড়িয়ে তাকে বুকে টেনে নেয়···গদ্‌গদ্‌কণ্ঠে বলে উঠে : 'প্রাণেশ্বরী, দয়া ক'রে মুখ থেকে ঘোমটাটা একটু খোল, দুটো কথা বল···শুনে প্রাণ ঠাণ্ডা হোক···'

মুন্মুর মাথায় যেন কে হঠাৎ লাঠি মারে···কাঠ হয়ে সে লোকটার দিকে কটমট ক'রে চায়···এতক্ষণ পরে সে সাধুবাবার আসল রূপ দেখতে পায়···সব তার কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। লজ্জায় তার কাঁপুনি অতি দ্রুত তালে উঠতে নামতে থাকে। কি করবে ঠিক করতে না পেরে সে বাইরে ছুটে বেরিয়ে পড়ে··· বুড়ীটাকে যেমন করেই হোক ধরবে···তাকে জানিয়ে দিতে হবে, সে নিজের চোখে এইমাত্র যা দেখল···যা শুনল···

অপাপবিদ্ধ কৈশরের সহজ বুদ্ধিতে সে মনে করেছিল, এই ঘটনার কথা শুনলে বুড়ি নিশ্চয়ই তারই মতন বিস্ময়ে রাগে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠবে। সে তখনও জানত না, ধনী ব্যবসায়ীর নিঃসন্তান স্ত্রীদের দৈব-পুত্র লাভের ব্যবস্থা এই বুন্ধাদের যোগাযোগে এইভাবেই সংঘটিত হয়—।

॥ সাত ॥

সেদিন রাত্রিতে মুন্মু তাদের গলির কাছে একটা বন্ধ দোকানের বাইরের পাটাতনের ওপর শুয়ে কাটিয়ে দিল···প্রভুদয়ালের শূন্য বাড়িতে গিয়ে শুতে তার সাহসে কুলাল না···খালি বাড়ি, যদি ভূত এসে উপদ্রব করে ? যদি চোর বলে লোকে তাকে সন্দেহ করে ?

ভোর হতেই সে রেল স্টেশনে গিয়ে হাজির হয়···যদি মোট পাওয়া যায়।

স্টেশনে এসে যখন পেঁছল তখন বেশ বেলা হয়ে গিয়েছে। তক্ষুনি প্লাটফর্মে লাহোর থেকে একখানা যাত্রী-ট্রেন এসে পেঁছল। দলে দলে লোক

স্টেশন থেকে বাইরে বেরিয়ে আসছিল। ধনীলোকেরা বাইরে এসেই ফিটন আর টাঙ্গার ওপর বসে পড়ে…মধ্যবিত্ত শ্রেণীর গৃহস্থ লোকেরা শেয়ারে মোষের গাড়ীতে যাবার জন্যে গাড়োয়ানদের সঙ্গে দর কষাকষি শুরু করে…আর যারা দরিদ্র, অধিকাংশই চাষী শ্রেণীর…তারা যে-যার মোট মাথায় তুলে নিয়ে স্ত্রী-পুত্রের হাত ধরে হাঁটতে আরম্ভ ক'রে দেয়।

মুন্নু উৎসুক উৎকণ্ঠায় জনতার মধ্যে প্রত্যেকের মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে ঘুরে বেড়ায়।

'কুলি চাই, লালাজী ?'

'মা-জী…কুলি ?'

কিন্তু কেউ সাড়া দেয় না। মনে-মনে সে একটা মতলব ঠিক ক'রে নেয়, নিতান্ত কৃপণ যারা, তারাই গাড়িতে যেতে চাইবে না…অল্প দরের মুটের মাথায় মোট চাপিয়ে পায়ে হাঁটবে…কিন্তু পরক্ষণেই তার মনে হলো, গাড়িতে তো জন পিছু শেয়ার মাত্র একআনা…সেক্ষেত্রে এমন কে কৃপণ আছে যে পায়ে হেঁটে বাড়ি যাবে ?

এমন সময় দেখে, রেলের নীল জামা গায়ে দু'জন কুলি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চেঁচাচ্ছে : 'কুলি ! কুলি !'

তাদের ডাক শুনে দু'জন লোক তাদের কাছে গিয়ে তাদের ঘাড়ে মোট চাপিয়ে দিল।

দেখাদেখি, মুন্নু ও সেখানে দাঁড়িয়ে চেঁচাতে লাগল : 'কুলি ! কুলি !'

সামনের গাড়ি-বারান্দার ভেতর থেকে কে একজন ডাকল : 'এই…এদিকে আয়।'

মুন্নু ছুটে ওপরে উঠতেই খাঁকি-পোশাকের একজন পাহারাওয়ালা তার ঘাড় ধরে দাঁত খিঁচিয়ে উঠল : 'এই হারামজাদা, মোট নিতে এসেছিস্…দেখি তোর লাইসেন্স ?'

ভয়ে মুন্নুর বুক দ্রুত কাঁপতে আরম্ভ ক'রে দেয়…

'চুপ ক'রে রইলি যে, শুয়ারকা বাচ্চা ! দেখা লাইসেন্স…'

সঙ্গে সঙ্গে হাতের লাঠিটা তুলে ধরে।

মুন্নু কাঁপতে কাঁপতে কোন রকমে বলে : 'সরকার, আমি…আমি…'

আইনের রক্ষক গর্জন ক'রে ওঠে: 'হারামজাদা আমার চোখে ধুলো দিবি? একমাস ধরে দেখছি, তুই দিব্যি মজায় রোজ এখান থেকে মোট বইছিস…'

কাঁদ কাঁদ মুখে মুন্নু বলে: 'না হুজুর…আপনি ভুল দেখেছেন…আমি মাত্তর এই দু'দিন এখানে এসেছি…'

হুজুর আরও ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠেন: 'বেটাচ্ছেলে…আমি মিথ্যে কথা বলছি… একমাস ধরে রোজ দেখছি নিজের চোখে…'

'নিশ্চয়ই আমার মতোন আর কাউকে দেখেছেন হুজুর। কুলিদের দেখতে একরকমই কিনা!'

মুন্নুর হাতটা মুচড়ে ধরে হুজুর গর্জন ক'রে ওঠেন: 'চালাকি পেয়েছিস ব্যাটা…চল ফাঁড়িতে…'

ফাঁড়ির নামের সঙ্গে সঙ্গে মুন্নুর মনে জেগে ওঠে কোতয়ালিতে প্রভুদয়ালের সেই শাস্তির দৃশ্য! ভয়ে আর্তনাদ ক'রে ওঠে: 'না…না…না…'

সজোরে হাতের লাঠির এক ঘা বসিয়ে দিয়ে হুজুর বলে ওঠেন: 'বেরো বেটা…বেরো এখান থেকে…সরকারী হুকুম…বিনা লাইসেন্সে কেউ মাল ওঠাতে পারবে না…' ছাড়া পেয়েই মুন্নু ছুটতে আরম্ভ করে…একদমে খানিকক্ষণ ছোটার পর সে পিছনে ফিরে দেখে…হুজুর খাঁকি-কোর্তাটা টেনে ঠিকঠাক ক'রে নিয়ে ধীর পদক্ষেপে বিচরণ করছেন…

এতক্ষণ পুলিশের ভয়ে যা মনের তলায় চাপা পড়েছিল, নিরাপদ দূরত্বে আসার ফলে, আপনা থেকে তা মনে ভেসে উঠল। এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে তার সমস্ত চেতনা জাগ্রত হয়ে ওঠে। নিজের মনে মনে ভাবে আর রাগে ফুলে ফেঁপে ওঠে,—স্টেশন থেকে আমাকে তাড়িয়ে দেবার ও কে? বদমায়েশ পাজী! খাঁকি জামা গায়ে দিয়েছে বলে নিজেকে মনে করেছে যেন লাটসাহেব …আমার চাচাও তো ইংরেজ সরকারের চাকর…সরকারের কত চাকর…উঁনি ভেবেছেন উঁনিই যেন একমাত্র চাকর…আমি আমার মনিবের মতো নই যে…মুখ বুজে ওর হাতের মার খাব…মরে যাব সে-ও ভালো…নিস্ফল আক্রোশে যাতনা বেড়েই চলে।

হাঁটতে হাঁটতে মুন্নু দেখে সে সাহেব পাড়ার মধ্যে কখন চলে এসেছে।

তারা শহরের যে অংশে থাকে, তার সঙ্গে শহরের এই অংশের পার্থক্য আপনা থেকেই চোখে পড়ে যায়। চারদিকে ফাঁকা ফাঁকা…পথঘাট পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন …রাস্তায় গাড়ি চলে গেলে এখানে ধুলো ওড়ে না…রাস্তার দু'ধারে চমৎকার ছবির মতোন সব বাড়ি…কে যেন লতায় পাতায় আর ফুলে সাজিয়ে রেখেছে।

হঠাৎ একটা বিলিতি দোকানের সামনে সে দেখে, কাঁচের ভেতরে একটা সুন্দর ফোটো কারা টাঙিয়ে রেখেছে…ইংরেজ ছেলেমেয়ের একটি ফোটো…দাঁড়িয়ে সে দেখে…কখন দেখতে দেখতে তার মনের মধ্যে এক দুর্বার লোভ জেগে ওঠে, হায় ঐ রকম পোশাক যদি সে পরতে পারত…ঐ রকম পরিষ্কার জামা… পাৎলুন…মাথায় ঐ রকম টুপি! হঠাৎ নিজের ছিন্নভিন্ন ময়লা পোশাকের দিকে দৃষ্টি পড়তেই দিবাস্বপ্ন ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যায়।

এমন সময় মিহি অথচ চড়া গলায় কে যেন বলে উঠল…পেছন ফিরে দেখে, এক মেমসাহেব…নাক উঁচু ক'রে তাকেই কি যেন বলছে।

মুখের দিকে চেয়ে মুন্নুর বুঝতে এতটুকু কষ্ট হলো না, তার অস্তিত্বের সান্নিধ্য মেমসাহেবের পক্ষে অত্যন্ত পীড়াদায়ক হয়ে উঠেছে; কিন্তু তাতে সে কোন অপমানই বোধ করল না। কারণ শ্যামনগরে থাকার সময়, সে তার নিজের চাচা, বাবু নাথুরামকে দেখেছে, সাহেবদের দেখে কি রকম ভয়ে জড়সড় হয়ে যেত তারা। সেই থেকে শাদা চামড়ার প্রতি একটা অতিরিক্ত শ্রদ্ধা তারও মনে গেঁথে গিয়েছিল। সেইজন্য অপমান বোধ হওয়া দূরে থাক, সে মনে মনে খুশীই হলো যে মেমসাহেব তার সঙ্গে কথা বলছে। যে-রাস্তা দিয়ে মেমসাহেবরা হেঁটে চলে, সেই রাস্তা দিয়ে তাদের পাশাপাশি একদিন যদি সে হেঁটে যেতে পারে! এই গৌরবময় ভবিষ্যতের সম্ভাবনায় ভরপুর হয়ে সে রেলের পোলের দিকে ছুটে চলে।

পোলের মুখে রাস্তার ওপর কুষ্টব্যাধিগ্রস্ত ভিখারীরা তার দৃষ্টি আকর্ষণ করে…রাস্তার দু'ধারে অন্য সব ভিখিরীরাও যাত্রীদের পিছু পিছু ছুটে চলেছে, 'একটা পয়সা মিলে বাবা!' তাদের দেখে সহসা মুন্নুর মনে হয়, অন্তত সে এদের দলে নয়…এদের চেয়ে উচ্চস্তরের জীব সে। নিজের এই আত্মগরিমাবোধকে নিজের কাছেই সুপ্রতিষ্ঠিত করবার জন্যে সে মনে মনে প্রমাণ সংগ্রহ করে,

আমি স্কুলে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত পড়েছি···বাবুদের বাড়িতে কাজ ক'রেছি···যে-সে বাবু নয়, যার বাড়িতে সাহেব পর্যন্ত একদিন এসেছিল···

তার সমস্ত অভিজ্ঞতার মধ্যে মাত্র এই দুটি গৌরবজ্জ্বল ঘটনা, পর্বত-শৃঙ্গের মতো জীবনের কুৎসিৎ অভিজ্ঞতার বহুবিস্তৃত প্রান্তরের ওপর মাথা তুলে থাকে ···এই দুটি আলোকোজ্জ্বল রেখার ওপব হুড়মুড় ক'রে এসে পড়ে জীবনের আর সব বাকি ঘটনার ধুলো-কাদা···যেন ঢেকে মুছে দিতে চায় সেই দুটি সূক্ষ্ম আলোক রেখাকে···কিন্তু মুন্নু আজ কোন মতেই সে দুটি রেখাকে মলিন হতে দেবে না।

আর কিছু দূর এগুতেই, পুরনো সরাইখানার সামনে যে গাড়ির আড্ডা ছিল, সেখানে এসে সে দাঁড়িয়ে পড়ে। চারদিক থেকে বিচিত্র সব আওয়াজ আসছে···যেদিকেই চোখ ফেরায় সেদিকেই বিচিত্র সব মানুষের জনতা···চলন্ত ছবির-পর-ছবি···

পিঠে বোঁচকা নিযে একদল চাষী লরির জন্যে অপেক্ষা ক'রে আছে···রোদে তাদের গায়ের রঙ পুড়ে ঝলসে গিয়েছে ·ময়লা এলোমেলো পোশাক, দীর্ঘকায় একদল পাঠান রাস্তায় ছুরি ছোরা আর গাছ-গাছড়া ফেরি ক'রে বেড়াচ্ছে—ভীমাকৃতি বিরাট চেহারা, দেখলে ভয় করে, মাথায় সযত্নে বাঁধা কাপড়ের পাগড়ী, গায়ে সোনালী-পাড়ওয়ালা লাল ভেলভেটের কোর্তা, পায়ের তলা পর্যন্ত ঝোলান থলের মতো ঝলমলে পা'জামা···পায়ে ইয়া মোটা কাবলী জুতো; কোথাও তৈল-সুচিক্কণ দেহে হিন্দু মিঠাইওয়ালা থাকে থাকে সাজানো মিষ্টান্নের থালার আড়ালে খদ্দেরের সঙ্গে দর কষাকষি করছে; তার মধ্যে সুগভীর আলস্যে কোথাও অর্ধনিমীলিতচক্ষে দুটো গরু শুয়ে জাবর কাটছে, চোখে-মুখে ফেনা উদ্গীরণ করতে করতে ছ্যাকরা-গাড়ির ঘোড়া ধুঁকতে ধুঁকতে এসে দাঁড়াচ্ছে···অতি পরিচিত প্রতিদিনের নিত্য-দেখা সব ছবি। এসব থেকে মুন্নু অতি সহজেই নিজেকে আলাদা ক'রে নেয়। কোন কিছুই বিশেষ ক'রে তার মনে কোন ছাপ ফেলে না। জাতভারতবাসীর সেই হলো মনের বিশেষত্ব। সব কিছুই সে সম্ভব বলে স্বীকার ক'রে নেয়। রাস্তার মধ্যে পাগল হাঁ ক'রে সূর্যের দিকে চেয়ে আছে, কিংবা কল্পিত শত্রুর উদ্দেশ্যে গালাগাল বর্ষণ করছে···অথবা কোথাও সম্পূর্ণ নগ্নদেহে সাধুবাবা প্রকাশ্য-পথে বসে ধ্যান করছেন···

কিংবা সযত্নে তৈরি জ্যামিতিক-রেখায় নিখুঁত পোশাকে আদিম নগ্নতাকে সুসভ্যভাবে ঢেকে ঘাড় উঁচু ক'রে সাহেব চলেছে···কোন কিছুই তার কাছে বিসদৃশ লাগে না। মুন্নুরই বা লাগবে কেন? তবে তার একমাত্র দুঃখ, সে ইংরেজ হয়ে কেন জন্মগ্রহণ করতে পারল না।

কিন্তু একটি প্রশ্ন ধীরে ধীরে তার মনের মধ্যে ডাল-পালা মেলে বেড়ে উঠতে থাকে। কি ক'রে কাজ পাওয়া যায় এবং কোথায় পাওয়া যায়? বাজারে এক পয়সা ক'রে মোট বইতে আর তার ইচ্ছা নেই, প্রভুদয়ালের বাড়িতেও ফিরে যেতে চায় না, অন্তত যতদিন না তুলসী ফিরে আসে। তুলসী তো চালের মোট বয়ে রোজগার করতে পারে, আমি তাও পারি না। কিন্তু একটা কিছু তো করতে হবে? কি করা যায়? শ্যামনগরে চাচার কাছে ফিরে যাবে? না··· দয়ারামের সঙ্গে তার সব সম্পর্ক সে মন থেকে মুছে ফেলে দিয়েছে···তার পৃথিবীতে দয়ারাম নেই···দয়ারামের পৃথিবীতেও সে আর নেই।

ভাবতে ভাবতে সে এগিয়ে চলে···এমন সময়ে হঠাৎ তার কানে এসে লাগে ঢাকের শব্দ···ভুম্···ভুম্···ভুম্···

চেয়ে দেখে, একটা বড় বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে একজন লোক হাত মুখ নেড়ে কি বলছে আর তার আশে-পাশে একদল লোক দাঁড়িয়ে আছে। তাদের প্রত্যেকের গলার ভেতর দিয়ে একটা চৌকো ছবির বাক্সের মতন জিনিস ঝোলানো···কাছে এগিয়ে যেতেই দেখে, সাহেবী পোশাকে একটা মেয়ের ছবি ···মেয়েটার বুকের জামার সঙ্গে অনেকগুলো মেডেল ঝোলানো···আর হাতে একটা মস্ত বড় চাবুক···সেই চাবুক দিয়ে সে এক পাল বাঘ, সিংহ আর হাতিকে যেন ঠাণ্ডা ক'রে রেখেছে···আর-একটা ছবিতে দেখে, সেই মেয়েটাই শুয়ে আছে, আর তার বুকের ওপর একটা মস্ত বড় পাথর; আর-একটা ছবিতে দেখে সেই মেয়েটাই দাঁতে দড়ি দিয়ে মানুষ ভর্তি একটা গাড়ি টেনে নিয়ে চলেছে।

যে লোকটাকে দূর থেকে হাত-মুখ নাড়তে সে দেখেছিল, হঠাৎ সে লোকটা চিৎকার ক'রে বলে উঠল: 'মিস তারাবাঈ! মেয়ে নয়, দানবী···কলিযুগের দানবী···দৌলতপুরে আজ শেষ খেলা হচ্ছে···এমন সার্কাস দল আর কারুর নেই···এমন কসরত সাত-সাত-দুনিয়ায় আর কেউ কখনো দেখায় নি···য়ুরোপের

যত রাজা আর রানী আছে, তাদের সব তাক্ লাগিয়ে দিয়ে সারা গা ভর্তি মেডেল নিয়ে এসেছেন…বনের বাঘ-সিংহীকে বেড়াল বানিয়েছেন…মিস তারাবাঈ…আর্টিস্ট মহলের মহারানী…এই শেষ খেলা দেখতে হয় তো এইবার দেখে নিন…আজ রাতেই দল-বল নিয়ে বোম্বে চলে যাবেন…সেখান থেকে যাবেন বিলেতে…আর ফিরবেন না বহু বছর…এই শেষ সুযোগ…দেখে আসুন …মিস তারাবাঈ…এ দুনিয়ার আশ্চর্য আউরৎ…ডুম্…ডুম্…ডুম্…

বলতে বলতে তারা এগিয়ে চলে। মুন্নুর চোখে মুখে হঠাৎ খুশীর আলো ঝকমকিয়ে ওঠে: 'যেমন ক'রে হোক যাব সার্কাসে…সেখান থেকে যাব বোম্বে…'

ছবিওয়ালা লোকগুলো বিজ্ঞাপনের কাগজ বিলি করতে করতে চলেছিল। মুন্নু একটা কাগজ নিয়ে পড়ে দেখে:

"মদনলালের থিয়েটার বাড়ির বাইরে, হল গেটের সামনে—
মিস তারাবাঈ—মেয়ে হারকুউলিস!
আশ্চর্য! অদ্ভুত! বিস্ময়কর! আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে এমন খেলা আর কেউ দেখায় কি।"

মুন্নু পা চালিয়ে চলতে আরম্ভ করে। তার মগজের মধ্যে ঘড়ির পেণ্ডুলামের দোলানির মতো দুলতে থাকে, বোম্বে…বম্…বম্…বে…সেই শব্দের অনুরণনের সঙ্গে তার মনের মধ্যে জেগে ওঠে বোম্বে সম্বন্ধে যা-কিছু সে শুনেছিল। কিছু দিন আগে বাজারে সে যখন মুটেগিরি করত, সেই সময় এক মুটের কাছে শুনেছিল বোম্বেতে যে-কোন লোক যে-কোন কারখানা থেকে মাস গেলে হেসে-খেলে পনরো থেকে ত্রিশ টাকা রোজগার করতে পারে। সেই মুটেটাই তাকে বলেছিল, মরবার আগে প্রত্যেকের অন্তত একবার সেই আশ্চর্য শহরে যাওয়া উচিত। সেখান থেকেই নাকি সব বড় বড় লোক কালাপানি পার হয়ে সাহেবদের দেশে যায়।

'বোম্বে…বম্…বম্…বে…' মুন্নুর মগজে সমানে বেজে চলে। মনে পড়ে ইস্কুলে প্রাথমিক ভূগোলের বইতে সে পড়েছিল বোম্বের কথা…বোম্বে হলো একটি দ্বীপ হাঁ…হাঁ…আজও মনে আছে, মালাবারের উপকূলে একটি দ্বীপ… বোম্বে বম…বম্…বে…

সার্কাসের সামনে এসে সে দেখল, গেটের গায়ে টিকিটের সব দাম লেখা। সব চেয়ে কম দামের সীট হলো আট আনা। তার কাপড়ের খুঁটে তখনও প্রভুদয়ালের দেওয়া সেই একটি টাকা বাঁধা ছিল। হাত দিয়ে একবার সে অনুভব ক'রে নেয়, টাকাটি যথাস্থানে আছে কিনা। কিন্তু আট আনা পয়সা খরচ ক'রে সার্কাস দেখার বিলাসতা তার মন অনুমোদন করে না। হঠাৎ সে ঠিক ক'রে ফেলে সামনের দরজা দিয়ে নয়, অন্য কোন পথ দিয়ে সে ভেতরে ঢুকবে। সদর দরজা পেরিয়ে তাঁবুর আশে-পাশে ঘুরতে ঘুরতে, এক জায়গায় তাঁবুটা একটু আলগা দেখে, তার তলা দিয়ে সে ঢুকে পড়ল।

ভেতরে ঢুকে কিছুক্ষণ সে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর ডানদিকে ফিরে দেখে, একটা হাতি সামনের একটা তাঁবুর ভেতর থেকে বেরিয়ে আসছে। হাতির ওপর কালো-মতোন একজন মাহুত বসে···হাতির কানের আড়ালে তার পা দেখা যাচ্ছে না। হাতির পেছনে একদল ছেলে হইহই করতে করতে আসছে। ছেলেগুলো বলাবলি করছে : 'জানিস, এই হাতিটা ঠিক মানুষের মতোন সিঁড়ি দিয়ে উঠতে পারে, নাচতে পারে, মাউথ-অর্গান বাজাতে পারে।' সুযোগ বুঝে মুন্নু ছুটে গিয়ে সেই ছেলের দলে ভিড়ে যায়।

এমন সময় হাতিটা কি মনে ক'রে সামনের দুটি পা উঁচু ক'রে তুলতেই ছেলেরা মনে করলো হাতি বোধ হয় রেগে গিয়ে তাদের তাড়া করতে আসছে। হঠাৎ মুন্নু দেখে পাশ থেকে একটা ছেলে তার মাথা থেকে কাপড়ের ফালিটা খুলে নিয়ে হাতির দিকে ছুড়ে দিল। এক টুকরো খড়ের মতো হাতিটা পাগড়ী-টাকে গিলে খেয়ে ফেলল।

তৎক্ষণাৎ সেই ছেলেটির টুপি তার মাথা থেকে তুলে নিয়ে মুন্নু পালটা জবাব দেয়। সঙ্গে সঙ্গে মুন্নু অনুভব করে পেছন দিক থেকে একটা বলিষ্ঠ হাত তার ঘাড়ের উপর এসে পড়েছে···ঘাড়টিকে ধরেছে।

পাতলা দেহটাকে একবার ঝটকা মেরে নিয়ে মুন্নু ফিরে দাঁড়ায় এবং সঙ্গে সঙ্গে পা তুলে আক্রমণকারীকে সজোরে আঘাত করে। লোকটা তাল রাখতে না পেরে সামনের নর্দমার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে যায়।

এক গা কাদা মেখে লোকটা নর্দমা থেকে উঠতেই ছেলের দল হই হই ক'রে হেসে উঠল। হাতির উপর থেকে মাহুত মুন্নুকে গালাগাল দিয়ে শাসিয়ে ওঠে।

মনুমন্ বুঝতে পারে, হঠাৎ ঘোরতর বিপদের মধ্যে সে পড়ে গিয়েছে। তাই নিজে থেকে বলে উঠে : 'ঐ লোকটাই তো আগে শুরু করল…'

ততক্ষণে মাহুত হাতির ওপর থেকে নেমে পড়েছে…কান ধরে মনুমনুকে হাতির শুঁড়ের দিকে টানতে টানতে নিয়ে যায়।

ভয়ে ছেলেগুলো চিৎকার ক'রে ওঠে।

মনুমনুর মনে হলো, সে আর বাঁচবে না…ভয়ে আপনা থেকে তার চোখ বুজে। কিন্তু গজরাজ শুধু সশব্দে তার মাথার ওপর একটা ছোটখাটো দীর্ঘশ্বাস ফেলে বিপুল দেহ নিয়ে এগিয়ে চলে গেল।

মনুমনু কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে বলে ওঠে : 'আমার অত ভয় নেই।

মাহুত হেসে ওঠে : বেশ…বেশ…তাহলে এক কাজ কর দেখি…ঐ যে ঘেসেড়াটা যাচ্ছে ওকে ডেকে নিয়ে আয় আমার কাছে।

মনুমনু মনে মনে খুশীই হয়। সে তো এই সুযোগই খুঁজছিল। সার্কাসের ভেতর ঢোকবার সে বায়না করবে, তার একটা কারণ থাকা তো চাই।'

ছুটে গিয়ে ঘেসেড়াকে ডেকে নিয়ে আসে। মাহুতের কাছ ঘেঁষে মৃদু হেসে আবদার ক'রে বলে : 'আমি তামাশা দেখবো!'

মাহুত সে-কথায় কর্ণপাত না ক'রে বলে ওঠে : 'যা বিদেয় হ!'

মনুমনু নড়ে না। বলে : 'বা রে, আমি যে তোমার হয়ে কাজ ক'রে দিলাম!'

কোন উত্তর না দিয়ে লোকটা এগিয়ে চলে। মনুমনু তার পিছু ছাড়ে না।

'বা রে, আমাকে দিয়ে শুধু-শুধু কাজ করিয়ে নিলে?'

'ফের জ্বালাতন করে! দেখতে হয় তো এই তাঁবুর ফাঁক দিয়ে দেখ্!'

লোকটা আর কোন কথা না বলে অদৃশ্য হয়ে যায়। মনুমনু ঘুরে-ফিরে দেখে, কোথাও তাঁবুর ফাঁক আছে কিনা। সৌভাগ্যবশতঃ এক জায়গায় তাঁবুর গারে একটু ছেঁড়া ছিল। মনুমনু তার ভেতর দিয়ে চোখ বার ক'রে দেয়।

ভেতরে তখন খেলা শুরু হয়ে গিয়েছিল। অর্ধচন্দ্রাকৃতিভাবে থাকের-পর-থাক চেয়ার সাজানো। কোথাও একটা আসন খালি পড়ে নেই। তাঁবুর ওপরে এই সবে মাত্র একদল খেলোয়াড় শুন্যে নানা রকমের লাফালাফির কসরত দেখিয়ে মাটিতে নেমে দর্শকদের অভিবাদন জানাচ্ছিল। উত্তরে দর্শকরা ঘন ঘন করতালি দিয়ে উঠল। হাততালি থামতে-না-থামতে সমস্ত দর্শক আবার

তুমুল আনন্দ-ধ্বনি ক'রে উঠল। এবার স্বয়ং মিস্ তারাবাঈ খেলা দেখাবার জন্যে মঞ্চে ঢুকেছেন। বিপুল দেহ নিয়ে হেলতে দুলতে দুলতে মিস্ তারাবাঈ দর্শকদের সামনে এগিয়ে আসছেন। মুন্নুর দেখে মনে হলো যে হাতিটা তার পাগড়ী গিলে খেয়েছিল, তার কথা।

মিস্ তারাবাঈ মঞ্চের এক জায়গায় এসে শুয়ে পড়লো। কতকগুলো লোক এসে একটা বিরাট পাথর তার পেটের ওপর চাপিয়ে দিল। তার পর প্রত্যেকে এক একটা লোহার হাতুড়ি তুলে সেই পাথরের ওপর সজোরে আঘাত করতে লাগল। মুন্নুর দম বন্ধ হয়ে আসবার মতোন হলো। কিছুক্ষণ পরে মেয়েটা পাথরটাকে সরিয়ে ফেলে দিয়ে সোজা উঠে দাঁড়িয়ে মাথা নীচু ক'রে দর্শকদের অভিবাদন করলো।

বিস্ময়ে মুন্নুর দেহ কাঠ হয়ে আসে!

মিস তারাবাঈ চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একটা শাদা ঘোড়া আসরে এসে দাঁড়াল। সঙ্গে সঙ্গে একটা লোক এসে তার পিঠে লাফিয়ে পড়ল। ঘোড়াটা গোল হয়ে ছুটতে আরম্ভ করল। মুন্নু অবাক হয়ে দেখে, লোকটা লাগাম না ধরে ঘোড়াটার ওপর যখন খুশী উঠছে-বসছে-দাঁড়াচ্ছে।

উত্তেজিত হয়ে মুন্নু ভাবে, আমাকে যদি কেউ শেখায়, আমি এখনি রাজী, আছি···

খেলা চলতে থাকে···মুন্নুর বিস্ময়ও বাড়তে থাকে, এমন সময় দেখে, একটা মস্ত বড় খাঁচার ভেতর সিংহ···

মুন্নু আর দেখা হয় না। পেছন থেকে টান পড়তেই মুন্নু দেখে, সেই মাহুত।

'খুব হয়েছে, আর দেখে না···অনেক দেখেছিস···এবার আমার একটু কাজ ক'রে দে···এই জলের বালতিটা নিয়ে আয় আমার সঙ্গে···'

তাঁবুর গায়ে সেই ছিদ্রপথ তার সমস্ত মনকে আকর্ষণ করতে থাকে কিন্তু যার দয়ায় সে আজ এই অদ্ভুত খেলা দেখবার সৌভাগ্য পেয়েছে, তার আদেশ সে কি ক'রে, অগ্রাহ্য করে? অনিচ্ছা সত্ত্বেও সে লোকটার পিছু পিছু চলে।

একটা কলের কাছে গিয়ে তারা থামে। সেখান থেকে বালতিতে জল ভরে মুন্নু মাহুতকে দেয়, মাহুত হাতির গা ধোয়ায়। তিন বালতি জল তোলার পর

মুন্নু মনে মনে ঠিক করে, এই লোকটাকেই সে ধরবে বিলেত না হোক অন্তত বোম্বে পর্যন্ত নিশ্চয়ই এই লোকটা তাকে নিয়ে যেতে পারে।

সাহসে ভর ক'রে সে হঠাৎ জিজ্ঞেস করে: 'তোমার সাকরেদ ক'রে আমাকে বোম্বে নিয়ে চল না?'

কাজ করতে করতে লোকটি জবাব দেয়: 'সাকরেদ! হাতি চালানো কি খেলা কথা নাকি? অনেকদিন মেহনত ক'রে তবে শিখতে হয়···একি যে-সে পারে? আর শেখাবার আমার সময় কই? আমরা তো বোম্বে থেকে কালাপানির ওপারে চলে যাচ্ছি···তবে তুই আমাদের সঙ্গে ট্রেনে গা ঢাকা দিয়ে বোম্বে পর্যন্ত যেতে পারিস···তোর মতোন বয়সে বিনা টিকিটে আমি বহুত ট্রেনে ট্রেনে ঘুরেছি···'

'সত্য বলছো?'

'তা না তো কি? তুই এখানে থেকে যা···মালপত্তর বাঁধতে গোছাতে আমার সঙ্গে লেগে যা···তার জন্যে তোকে কিছু দেব···তার পর ট্রেনে আমি তোকে লুকিয়ে তুলে নে'বখন!'

কৃতজ্ঞতায় মুন্নুর অন্তর ভরে আসে।

'সত্যি···কি বলে যে তোমাকে ধন্যবাদ জানাব!'

'জানাতে হবে না! চুপ কর, কেউ হয়ত এখনি শুনতে পাবে···যা···ঐখানে থেকে কিছু ঘাস নিয়ে আয়!'

॥ আট ॥

সার্কাস পার্টির স্পেশাল ট্রেন স্টেশন ছাড়বার আগে তীব্র আর্তনাদ ক'রে উঠল একবার···তারপর ধীরে ধীরে প্লাটফরম ছাড়িয়ে দ্রুত-থেকে-দ্রুততর হতে লাগল।

একটা মাল গাড়িতে পার্টির তাঁবু আর নানান সব আসবাব একটার-পর-একটা গাদা করা হয়েছে। তার মধ্যে এক কোণে মুন্নু আশ্রয় নিয়েছে গোপনে। ট্রেন অন্ধকারে হুহু ক'রে এগিয়ে চলে, মুন্নু দেখে, মাথার ওপর সেই সঙ্গে নীল আকাশে তারার দলও এগিয়ে চলে। অন্ধকারে মাঝে মাঝে ট্রেন যখন

আর্তনাদ ক'রে ওঠে মুন্নুর ভয় করে…মনে হয় যেন এ শব্দের সঙ্গে রাতের অধিবাসী অদৃশ্য প্রেতাত্মাদের বুঝি কোন সংযোগ আছে।

সে চলেছে এক সম্পূর্ণ নতুন পৃথিবীতে…কত জনের কাছে কতভাবে সে সেই বিরাট নগরীর কত আশ্চর্য সব কাহিনী শুনেছে…বড় বড় বাড়ি…লম্বা লম্বা রাস্তা…সুন্দর সুন্দর বাগান…মটর গাড়ি…জাহাজ…পথে পথে অলিতে গলিতে কোটিপতি লাখপতি সব ধনীরা আসছে যাচ্ছে…কুলিদের মুঠো মুঠো টাকা ছুঁড়ে ছুঁড়ে দিচ্ছে…

তার মাঝখানে মনের মধ্যে জেগে ওঠে, যে-জগৎ সে ফেলে চলে যাচ্ছে তার স্মৃতি…যে জীবন থেকে সে ছুটে চলেছে তার বেদনাময় শত কুৎসিত অভিজ্ঞতার কথা…জোর ক'রে সে-সব কথা সে মন থেকে তাড়িয়ে দিতে চায় আজ…কিন্তু তার শত চেষ্টা সত্ত্বেও তারা ভেসে উঠছে…তাদের এই আক্রমণ থেকে রক্ষা পাবার জন্য মুন্নু উপুড় হয়ে শুয়ে চোখ বুজে থাকে…ঘুমোতে চেষ্টা করে…শেষ-কালে কখন ঘুমিয়ে পড়ে…

সকাল বেলা যখন ঘুম ভাঙল ট্রেন তখন দিল্লী সেনট্রাল স্টেশনে দাঁড়িয়ে। ট্রেন থেকে নেমে হাত মুখ ধুয়ে সে লুকিয়ে আবার ট্রেনে উঠে বসল। আর একবার ঘুমোবার চেষ্টা করবে সে…

এমন সময় দেখে সেই মাহুত তার গাড়ির কাছে এসে দাঁড়িয়েছে…কোন রকমে ঘাড় কাত ক'রে সে শোনে মাহুত বলছে: 'এই খোলা গাড়িতে দিনের বেলায় থাকতে পারবি না…রোদে পুড়ে মরে যাবি…একটা বন্ধ গাড়িতে তোর ব্যবস্থা করেছি…এই নে খাবার…আয়…'

মুন্নু লাফিয়ে নেমে পড়ে। একটা মালগাড়ির সামনে এসে তারা দাঁড়ায়।

'নে, এই গাড়ীতে উঠে পড়…আমি আবার রাটলামে এসে তোর খবর নেব।'

খাবার হাতে মুন্নু সেই মালগাড়ীর ভেতর ঢুকে পড়ে। রাশীকৃত সব বাঁশ, তার মধ্যে মেঝেতে সে একটু জায়গা ক'রে নেয়। ট্রেন ছেড়ে দেয়। খেতে খেতে সেই মাহুতের দয়ার কথা ভেবে তার মন কৃতজ্ঞতায় ভরে ওঠে। বিস্মিত হয়ে সে ভাবে, কেন একজন লোক এত ভালো, আর একজন এত

খারাপ ? প্রভুদয়াল আর এই মাহুত, এরাও মানুষ, আর গণপত আর সেই পুলিস ইন্‌সপেক্টর, যে অকারণে তার মনিবকে মেরেছিল, তারাও মানুষ···।

হু হু শব্দে ট্রেন এগিয়ে চলে···দিল্লীর উপকণ্ঠে ছবির-পর-ছবি দ্রুত সরে সরে যায়···অতীতের সাক্ষী ভগ্নদুর্গ···জীর্ণ প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ···ইঁটের আর পাথরের কঙ্কাল নির্মেঘ আকাশের তলায় নিষ্করুণ সূর্যকিরণে যেন সব দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পুড়ছে। মুন্নুর মনে শৈশবের ইস্কুলে-পড়া দিনগুলির টুকরো টুকরো স্মৃতি ভেসে ওঠে। ভাবে ইতিহাসে পড়েছে, রাজপুত-রাজারা সব সূর্যের বংশের লোক···মুসলমানেরা এসে তাদের সিংহাসন কেড়ে নেয়···তাই আজ বুঝি সূর্য তাঁর বংশধরদের ওপর সেই অবিচারের প্রতিশোধ নেবার জন্যে তাদের প্রাসাদ, দুর্গ সব আগুনে পুড়িয়ে দিচ্ছে···

তাজা ছবির মতো সরে সরে যায় স্যার এড্‌উইন লুট্‌ইয়েনের গড়া লাল-ইটের নয়া-দিল্লী···থাকের-পর-থাক সাজানো···এদেরও ওপর কি একদিন সূর্য এমনি প্রতিশোধ নেবে ? মুন্নুর মনে সন্দেহ জাগে···না, আংরেজ সরকারের তৈরি এই সব বাড়ি সূর্য পোড়াবে না কারণ, ইতিহাসে তাকে পড়তে হয়েছে বৃটিশ সাম্রাজ্যের ওপর সূর্য কখনও অস্ত যায় না।

দৃশ্য বদলে যায়···

তৃণহীন, বৃক্ষহীন, বালুময় সমতল ভূমি···সামনে রৌদ্রকরে পুড়ছে···মাঝে মাঝে কোথাও সামান্য গুল্ম···মরুভূমির মধ্যে যেন ক্ষুদ্র তৃণোদ্যান···

আতপ্ত প্রান্তরে সহসা জেগে ওঠে ঘূর্ণি হাওয়া···রৌদ্রে ঝলসানো মাঠের বুক থেকে টেনে তোলে ধুলোবালির ঘূর্ণি···ঘুরতে ঘুরতে তারা অদৃশ্য হয়ে যায় কোন্‌ গহ্বরে কে জানে ?

মুন্নু শুনেছে, মৃত ব্যক্তিদের ব্যথিত আত্মা এমনিধারা বিজন প্রান্তরে ঘুরে বেড়ায় ঘূর্ণি মূর্তি ধরে···এমনি ঝড়ো হাওয়ায় কেঁদে মরে তাদের অশরীরী আত্মা। তাই সেই ঘূর্ণির দিকে চেয়ে চেয়ে মুন্নুর মনে হয় যেন রাজপুত-বীরদের অশরীরী আত্মা আজ তার সামনে দিয়ে এমনিভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে···ভয়ে তার গা ছম্‌ছম্‌ ক'রে ওঠে কিন্তু পরমুহূর্তে সে যখন ভাবে সে যেখানে বসে আছে, সেখানে তারা পেঁছুতে পারবে না···তাদের চেয়েও ঢের জোরে ছুটে চলেছে এই আংরেজ সরকারের রেল-গাড়ি···মাটিকে তুচ্ছ ক'রে আকাশকে তুচ্ছ ক'রে···ঐ

সর্বগ্রাসী-অনলবর্ষী সূর্যকেও তুচ্ছ ক'রে। মনে মনে সে বলে ওঠে, আশ্চর্য জিনিস এই রেলগাড়ি···যদি রেলের এঞ্জিন না থাকত তা'হলে তো আজ এমনি অবলীলাক্রমে সে দৌলতপুর থেকে পালাতে পারত না···বোম্বেতেও আসতে পারত না···এতদূর পথ পায়ে হেঁটে আসা কি সম্ভব!

সেই সঙ্গে তার মনে প্রশ্ন জেগে ওঠে: কিন্তু বোম্বে তো যাচ্ছি, সেখানে গিয়ে করব কি? সেখানে কাউকেই আমি চিনি না, জানি না। সেই যে বাজারের মুটে বলেছিল মাস গেলে ত্রিশ টাকা যে-সে রোজগার করতে পারে, তারই বা সন্ধান দেবে কে? বোম্বের রাস্তায় গিয়ে ভিখিরীদের মতো হাত পেতে ভিক্ষে করতে পারব না যে!

বিকালের দিকে গাড়ি কোঠা জংশনে এসে থামল। সেই বন্ধ গাড়িতে সারা দুপুর রোদের তাপে সে একরকম আধ-সিদ্ধ হয়ে গিয়েছিল।

এমন সময় দেখে, মূর্তিমান দয়ার মতো উদ্ধারকর্তা সেই মাহুত।

'এই নে, কিছু মিষ্টি আর দুধ নিয়ে এসেছি, আর এই থলেটা নে—রাত্রিতে পেতে শুবি, খুব সাবধান, বাইরে বেরুবি না!'

পরের দিন ট্রেন বোম্বের ভিক্টোরিয়া স্টেশনের বাইরের দিক্‌কার এক প্লাটফর্মে এসে থামল। ট্রেনটা যতই বোম্বের কাছে এগিয়ে আসছিল, ততই এক অনির্দিষ্ট চাঞ্চল্য মুন্নুকে যেন আচ্ছন্ন ক'রে ফেলছিল। গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে আসতে লাগল···চোখের সামনে সমস্ত দৃশ্য যেন আবছা হয়ে এল···মনে হলো যেন কথা বলবার শক্তি পর্যন্ত নেই। এখন সে কি করবে? এমনি চুপটি ক'রে বসে থাকবে যতক্ষণ না তার উদ্ধারকর্তা এসে তার খবর নেয়? না, সে নিজেই বেরিয়ে পড়বে? মুন্নু অস্থির হয়ে ওঠে।

এমন সময় বাইরে পরিচিত কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

'নেমে পড় ভাই···এই তোর প্রাণের বোম্বে। আমাদের গাড়ি এখান থেকেই বালার্ড পিয়ার-এ চলে যাবে···সেখান থেকে আমরা জাহাজে উঠব···এই নে কিছু খাবার···কাজে লাগবে···এখন আয় তোকে লুকিয়ে একটা গোপন পথ দিয়ে বার ক'রে দি!'

মুন্নু গাড়ি থেকে লাফিয়ে পড়ে।

নীরবে তার উদ্ধারকর্তার পিছন পিছন চলে।

গাড়ির তলা দিয়ে হামাগুঁড়ি দিতে দিতে তারা একটা গুদামের সামনে এসে পড়ে।

মুন্নুকে উপদেশ দিয়ে মাহুত বলে : 'মনে রাখিস ভাই, যত ভারী শহর তত কড়া তার মেজাজ···ইঁট কাঠ যেখানে যত বেশী, মানুষের জায়গা সেখানে তত কম···এখানে মানুষ যে নিশ্বাস নেয়, তারও দাম দিতে হয়···আদায় ক'রে নেয়, ছাড়ে না···তবে তুই খুব কড়া ছেলে ! তুই পারবি।'

মুন্নু কি বলবে ঠিক করতে পারে না।

'যা···সামনের গুদাম দিয়ে সবাই যেমন যাচ্ছে, তেমনি চলে যা···ভগবান তোর ভালো করুন !'

মুন্নু মুখ তুলে লোকটির দিকে চেয়ে দেখে। বসন্তের দাগে ভরা, কালো কুৎসিত মুখ। মুন্নুর মনে হলো, সেটা যেন ছদ্মবেশ। ওর আড়ালে নিশ্চয়ই সুন্দর দিব্য মুখ লুকিয়ে আছে। সময় নেই, সে এগিয়ে চলে। চলতে গিয়ে পদে পদে সে অনুভব করে তার বুকের ভেতরটায় কি যেন ভারী হয়ে উঠছে। এক-দিকে কৃতজ্ঞতা, আর একদিকে ভয়। সে এগিয়ে চলে।

ভিক্‌টোরিয়া স্টেশন থেকে বেরিয়ে মুন্নু অবাক্ হয়ে তার অন্তরের সেই স্বপ্ন-নগরীর দিকে চেয়ে থাকে···সে নড়তে পারে না···।

বহুজাতির আশ্রয়দায়িনী বহুরূপময়ী বিচিত্রা নগরী···এক-পা এক-পা ক'রে সে এগিয়ে চলে···কোন ঠিকানা নেই···কোন লক্ষ্য নেই—চোখের সামনে দিয়ে যা চলে যায়, তাই পরম বিস্ময়ের মতো তার অন্তরকে দোলা দিয়ে যায়···

ঘুরতে ঘুরতে সে ক্লান্ত হয়ে পড়ে···

হঠাৎ একটা বড় দোকানের সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়ে···কাঁচের ভেতর দিয়ে দেখে, থাকের-পর-থাক সোডা আর লেমনেডের বোতল সাজানো··· ভেতরে এক-একটা গোল টেবিলের সঙ্গে অনেকগুলো ক'রে চেয়ার পাতা··· কোন কোন চেয়ারে লোক বসে খাচ্ছে, গল্প করছে। তার মনে পড়ে যায়, দৌলতপুরে একবার বাজারে কি কাজ করতে গিয়ে একটা সোডার বোতল কিনে মিষ্টি জল খেয়েছিল···হঠাৎ তার ইচ্ছা হলো, সেই মিষ্টি জল এখন একটু খেলে হয় না ? দরজার বাইরে থেকে সে দেখল, ঘরের ভেতর চেয়ারে বসে যারা খাচ্ছে, তাদের পোষাক-পরিচ্ছদের সঙ্গে তার অঙ্গ-আবরণের বিশেষ কোন

সামঞ্জস্য নেই। একটা সোডার বোতলের দাম মাত্র এক আনা, তার কাছে এখনও একটা টাকা আছে। নাই বা থাকল তার ভালো পোশাক, তা বলে একটা সোডা সে খেতে পারবে না ?

নিজের মনে শক্তি সঞ্চয় ক'রে নিয়ে দোকানের ভেতর ঢুকতে গিয়ে দরজায় হোঁচট লেগে গেল। কোনরকমে সামলে নিয়ে সে ধীরে ধীরে ভেতরে এগিয়ে চলল। তার মনে হতে লাগল, সবাই যেন তার দিকে চেয়ে আছে। তাই কারুর দিকে না চেয়ে একটা খালি টেবিলের সামনে চেয়ারের ওপর সে বসে পড়ল। বসার সঙ্গে সঙ্গে তার মনে হতে লাগল যেন মহাশূন্যে সে ঝুলছে··· কোন অবলম্বন নেই তার···মাথার ভেতর তার যেন ঝিঁ-ঝিঁ পোকা ডাকছে হঠাৎ এ কি সে ক'রে বসল ? এখন করবে কি সে ? হাত দিয়ে কপালের ঘাম মুছে সুস্থির হবার চেষ্টা করে। মনকে বোঝায়, এমন ভয়ংকর কিছুই সে করে নি, অতএব স্বাভাবিক ভাবেই সে বসে থাকবে। ঐ তো সামনেই লোকে নির্বিবাদে কেটলী থেকে কাপে গরম চা ঢেলে খাচ্ছে। সুতরাং···

'এই ! তুই কে ?···কুলি ?'

মুন্নু ঘাড় ফিরিয়ে দেখে, পাশে এক লম্বা লোক···ধবধবে সাদা পোশাক-পরা···মাথার চুল রীতিমত তেল চকচকে এবং পরিপাটি ক'রে মাঝখানে দু'ভাগ করা···তাকেই প্রশ্ন করছে।

মুন্নুর বুকের ধুক্‌পুকানি যেন থেমে যায়। কি উত্তর দেবে ঠিক করতে না পেরে সত্য কথাই বলে : 'হাঁ···আমি কুলি···'

রীতিমতো বিরক্ত হয়ে তর্জনী আস্ফালন ক'রে লোকটি ব'লে ওঠে : 'চেয়ারে বসা হয়েছে ! নেমে মেঝেতে বোস···'

কোন কথা না বলে মুন্নু আস্তে আস্তে চেয়ার ছেড়ে সিমেণ্টের মেঝের ওপর গিয়ে বসে।

'কি চাই তোর ?'

'একটা মিষ্টি সোডা !'

কাছাকাছি যারা চেয়ারে বসে চা পান করছিলেন, তারা একসঙ্গে সকলে এমনভাবে মুন্নুর দিকে ফিরে তাকালো যেন কুষ্ঠরোগী। যে-বেয়ারাটা চা পরিবেশন করছিল, ভদ্রলোকের সেই নীরব অবজ্ঞার দৃষ্টির অর্থ বুঝতে তার

দেরি হয় না···ঈষৎ ব্যঙ্গের হাসি হেসে বলে ওঠে: 'দেখুন না হুজুর, কুলি ব্যাটার আস্পর্ধা!'

রাগে মুন্নুর সর্বদেহ জ্বলে ওঠে কিন্তু চিরকাল সে শুনে এসেছে ধোপ-দোরস্ত দামী পোশাক-পরা ভদ্রলোকরা উচ্চশ্রেণীর জীব, সর্বদাই তাঁদের মান্য ক'রে চলা উচিত, তাই অসহ্যবোধ হলেও সে মনের রাগ মনেই চেপে রাখে। তার মনে হলো, ঘরসুদ্ধ লোক যেন তার দিকেই চেয়ে আছে, আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়িয়ে সামনের দরজা দিয়ে সে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে।

দরজার বাইরে আসতেই দেখে বেয়ারাটাও তার সঙ্গে সঙ্গে বাইরে এসেছে। 'বার কর্ দু'আনা পয়সা, সোডা দিচ্ছি!'

মুন্নু প্রথমটা চমকে উঠেছিল। তারপর যখনই মনে হলো, লোকগুলো তার দিকে হয়তো এখনও চেয়ে আছে, সে আর কোন কথা না বলে কাপড়ের খুঁট থেকে সেই টাকাটি বার ক'রে তার হাতে দিয়ে দিল।

লোকটা এক গেলাস মিষ্টি সোডা এবং সেই সঙ্গে চোদ্দ আনা ফেরত এনে দিল।

তৃষ্ণায় তখন গলা শুকিয়ে এসেছিল। সেই বহুকাঙ্ক্ষিত মিষ্টি-জলের স্বাদ এক চুমুক নেওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে আপনা থেকে তার চোখ ফেটে লোণা জল বেরিয়ে আসে। এতদিন পরে আবার সেই মিষ্টি জল খাবার সুযোগ তার ঘটেছে··· একটু একটু ক'রে প্রত্যেক চুমুকের স্বাদ নিয়ে ধীরে-সুস্থে বসে সে যদি খেতে পারত! কিন্তু তার কোন সম্ভাবনাই নেই! তাদের জন্যে নিষিদ্ধ ভদ্রলোকদের এই জগতে হঠাৎ ঢুকে পড়ে সে যে ঘোরতর অন্যায় করেছে, তার ধাক্কা সামলাতে সে তখন এত বিব্রত যে, কোনরকমে এক চুমুকে শেষ ক'রে পালাতে পারলে বাঁচে···গেলাস শেষ ক'রে দরজার এক কোণে ভয়ে ভয়ে নামিয়ে রাখে···

'যা ব্যাটা···যা···'

মুন্নু ততক্ষণে ছুটতে আরম্ভ ক'রে দিয়েছে···যেন কে তাকে খুন ক'রতে আসছে।

কিছু দূর গিয়ে সে পেছন ফিরে দেখে সত্যি কেউ পিছু পিছু আসছে কি না···যখন দেখল কেউ আসছে না, তখন সে নিশ্চিন্ত হলো। কিন্তু মনে-মনে নিদারুণ আফসোস হতে লাগল, কি কুক্ষণেই না দোকানে ঢুকেছিল! দু'আনা

পয়সা নষ্ট হয়ে গেল। তার ওপর সেই লোকটার কুৎসিৎ ব্যবহার নিম-তেতোর মতো তার জিভে যেন বিঁধতে লাগল।

পথ চলে আর আপনার মনে ভাবে,—কুলি তা' কি হয়েছে? আমি তো বিনা পয়সায় খেতে যাই নি···আর তা ছাড়া আমি তো অস্পৃশ্য নই! আমি হিন্দু ক্ষত্রিয়···রাজপুত···কুলি হলেও আমার মধ্যে আছে ক্ষত্রিয় রক্ত···

নিজের আহত চিত্তে নিজেই সে প্রলেপ দিতে চেষ্টা করে।

সে যে রাজপুত ক্ষত্রিয়, সে-কথা মনে উদয় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার আত্মলজ্জা দূর হয়ে যায়। যে জাতে সে জন্মগ্রহণ ক'রেছে, তারা বীর, তারা যোদ্ধা, তারা হাসতে হাসতে যুদ্ধে প্রাণ দিতে পারে···তবে কেন সে নিজেকে এত ছোট মনে ক'রে কষ্ট পায়? ধীরে ধীরে তার আত্মসম্বিৎ ফিরে আসে। শ্লথ গতিভঙ্গী বদলে যায়···মাথা উঁচু ক'রে সোজা পা ফেলে সে হাঁটতে আরম্ভ করে। হঠাৎ রাস্তার ধারে সিনেমার একটা বিরাট রঙীন বিজ্ঞাপন দেখে সে দাঁড়িয়ে পড়ে···একদৃষ্টিতে সেই বিজ্ঞাপনের ছবির দিকে চেয়ে থাকে···মার্লিন ডিয়াট্রিচের ছবি···গভীর আয়ত চোখে কামনা আতুর আমন্ত্রণ···দুগ্ধ-শুভ্র দেহের নিরঙ্কুশ নগ্নতা শুধু মুক্তাবর্ণ ক্ষীণ কটি-বাসে ঈষৎ অসম্পূর্ণ—মুগ্ধ দৃষ্টি ফেরাতে পারে না···হঠাৎ তার মনে পড়ে যায়, তার চোখের সামনে এই স্বপ্ন-পুরী হয়তো তার দিকে এইভাবে চেয়ে-থাকা কুলিদের নিষিদ্ধ···জোর ক'রে সে দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয়···আড়-চোখে একবার দেখে, অন্য কেউ তাকে লক্ষ্য করছে কি না! না, কেউ আর নেই সেখানে। তবুও সেখানে দাঁড়িয়ে থাকতে তার ভয় করে কিন্তু ছবিটিকে ছেড়ে দিয়ে একেবারে চলে যেতেও সে পারে না··· একটু দূরে সরে গিয়ে একটা জায়গা বেছে নিয়ে দাঁড়ায়, সেখান থেকে লুকিয়ে ছবিটিকে স্পষ্ট দেখতে পায়···মার্লিন ডিয়াট্রিচের সেই বুভুক্ষিত দৃষ্টি তার দেহ ভেদ ক'রে তার রক্তে তুলেছে তুফান···

এমন সময় হঠাৎ তার পিছন দিক্ থেকে মোটর গাড়ির হর্ন, ট্রামের ঘণ্টা, ফিটনওয়ালাদের গালাগাল···এক সঙ্গে তাকে আক্রমণ ক'রে উঠল। নিজের তন্ময়তায় সে লক্ষ্যই করে নি যে সে রাস্তার মাঝখানে এসে দাঁড়িয়েছে। হঠাৎ সেই সম্মিলিত শব্দের আক্রমণে যখন সে বুঝতে পারল যে পথের মাঝখানে রাস্তা আটকে সে দাঁড়িয়ে আছে, ভয়ে এক নিমেষের মধ্যে তার যেন বুদ্ধি-শুদ্ধি লোপ

পেয়ে গেল। তার মনে হলো, আর রক্ষা নেই, চাপা যদি এখনও না পড়ে থাকে, তবে পড়তে বেশী দেরিও নেই। আত্মরক্ষার স্বাভাবিক প্রেরণায় সে ঘুরে দাঁড়িয়ে ছুটতে আরম্ভ করল। ফুটপাতের কাছে এসে ফিরে দেখে, বিপদের আর কোন সম্ভাবনা নেই, কিন্তু তার সামনে ফুটপাতের ওপর হঠাৎ একজন স্ত্রীলোক চিৎকার ক'রে কেঁদে উঠল···তার সঙ্গে একটি বালক ও একজন বৃদ্ধও হই-হই করে উঠল। মুন্নু তাদের দৃষ্টি অনুসরণ ক'রে দেখে রাস্তার মাঝখানে চলন্ত গাড়ি-ঘোড়ার মধ্যে একটি ছোট্ট মেয়ে বিপন্ন হয়ে পড়েছে···

গাঁয়ের পুনো দুর্দান্ত যে ছেলেটি এতদিনে তার মধ্যে অচেতন হয়ে পড়েছিল, হঠাৎ সেই মুহূর্তে সে জেগে উঠল: কোন দৃক্‌পাত না ক'রে মুন্নু সেই চলমান গাড়ির ভিড়ের মধ্যে থেকে মেয়েটিকে দু'হাত দিয়ে বুকে তুলে নিয়ে ছুটে ফুটপাতে চলে এল।

স্ত্রীলোকটি ছুটে গিয়ে মেয়েটিকে বুকে তুলে নিয়ে মুক্তকণ্ঠে মুন্নুকে আশীর্বাদ করে: 'দীর্ঘজীবী হও বাছা···দীর্ঘজীবী হও···'

তার পর বৃদ্ধের দিকে চেয়ে ঝঙ্কার দিয়ে বলে ওঠে: 'ভাল জায়গায় নিয়ে এসেছ আমাদের!'

তেমনি ঝংকার দিয়ে বৃদ্ধ উত্তরে বলে: 'থাম মাগী, মেয়েটাকে আর-একটু হলে মেরে ফেলেছিলি তো?'

'বটে···আমি মেরে ফেলেছিলাম? তুমি নিজে দিব্যি রাস্তা পেরিয়ে এলে··· মেয়েটাকে হাত ধরে নিয়ে আসতে পার নি? উলেট আমার ওপর চাপ!

মুন্নু দু'জনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে ঝগড়া মিটিয়ে দেবার জন্যে মুরুব্বিয়ানা ক'রে বলে ওঠে: 'থাক গিন্নী মা, থাক···চুপ করুন।'

মুন্নুর পিঠ চাপড়ে, কৃতজ্ঞতায় গদ্‌গদ কণ্ঠে বৃদ্ধ বলে ওঠে: 'তোমার জন্যেই ভাই···নইলে এ ডাইনীর জন্যে বাছা আজ নিশ্চয়ই গাড়ি চাপা পড়ত! তুমিই ওকে বাঁচিয়েছ। মোটর গাড়ি তো নয়···চাকাওয়ালা দৈত্যি!'

বুড়োর হাতে একগাদা জিনিস-পত্র দেখে মুন্নু বলে ওঠে: 'ইস্ এত জিনিসপত্র আপনি বইতে পারবেন কেন? কোথায় যাবেন? দিন্, আমি পেঁাছে দিচ্ছি?'

বৃদ্ধ বলে: 'আমার কথা যদি জিজ্ঞেস করলে ভাই, তবে শোন। দেশে

গিয়েছিলুম…এই এদের নিয়ে আসবার জন্যে…এর আগে স্যারজাবাইট (স্যার জর্জ হোয়াইট) মিলে কাজ করতুম…কাজকর্ম এখন কিছুই নেই, সংসার-পত্র বলতে যা কিছু, সব এই আমাদের সঙ্গেই ! বাড়িঘর দোর তো নেই ! এখন চলেছি শহরের মধ্যে কোথাও কোন দোকানের বাইরে কিংবা ফুটপাতে কোথাও রাত কাটাবার মতো একটু জায়গা খুঁজে যদি পাই…তার পর সকালে উঠে যাব মিলের দিকে, যদি কাজকর্ম মেলে…গরীব…বুঝতেই তো পারছো ভাই…রাম রাম…তাহলে আসি এখন ?'

বৃদ্ধের সহজ আত্মপ্রকাশ মুন্নুর অন্তর স্পর্শ করে। আগ্রহভরে বলে ওঠে : 'আমিও এই শহরে আজ নতুন এসেছি…আমিও যা হোক একটা কাজ খুঁজছি… আপনি যে মিলের কথা বললেন, সেখানে আমার কোন কাজ হতে পারে বলে মনে করেন ? আমরা গাঁয়ের লোক…কুলিগিরি করি।।

'বেশ, বেশ…তা' ভাই রাতটা যদি আমাদের সঙ্গে কাটিয়ে দিতে পার, তাহলে সকালে দু'জনে মিলেই বেরুতুম কাজের সন্ধানে…হেড মিস্ত্রীর সঙ্গে আমার পরিচয় আছে। তার কাছেই তোমাকে নিয়ে যাব তার পর যদি কাজ জুটে যায়, মিলের কাছে একটা কুড়েঘর দু'জনে মিলে ভাড়া নেব, কেমন ?' বৃদ্ধ খুশীই হয়।

মুন্নু যতদূর সম্ভব গম্ভীরভাবে বলে : 'খুব ভালো কথা…আমিও তাই খুঁজছিলাম।' তারা ক্রমশঃ পা-পা এগিয়ে চলে।

পশ্চিম পাড়ার সাহেবদের বড় বড় অফিসের তলা দিয়ে—রাজনগরীর গগন-চুম্বী সব প্রাসাদের ছায়া মাড়িয়ে, একটা মস্ত বড় খেলার মাঠ পেরিয়ে, তারা ক্রমশঃ গিরগাঁওয়ের পাঁচমিশেলী পূর্ব-পাড়ায় এসে ঢোকে।

শহরের সেই জনতার অরণ্যে সহসা এইভাবে মনের মতো সঙ্গী পেয়ে মুন্নুর মনের স্বাভাবিক স্বচ্ছন্দতা ফিরে আসে—বুড়ো আগিয়ে পথ দেখিয়ে চলছিল। মুন্নু ছুটে বুড়োর পাশে গিয়ে জিজ্ঞেস করে : 'তোমার নামটা কি দাদা ?'

'আমার নাম হরি…লোকে ডাকে হরিহর…'

বৃদ্ধ দাঁড়িয়ে পড়ে। মুন্নু বুঝতে পারে ক্লান্তিতে বৃদ্ধ আর চলতে পারছে না। জিজ্ঞেস করে : 'কতদূর আর যেতে হবে ?'

'আর বেশী দূর নেই…এই ভেণ্ডীবাজার হয়ে চৌপাটি যাবো…'

এমন সময় দেখে, স্ত্রীলোকটি বহু পিছনে পড়ে রয়েছে। সেও আর চলতে পারছিল না।

'এখানে একটু বসে জিরিয়ে নাও মতির মা।'

স্ত্রীলোকটি ঘাড় নেড়ে অসম্মতি জানায়। কোমরে যে ছোট্ট টিনের বাক্সটি ছিল, সেটা কোমর বদলে নেয়।

মনুও বিজ্ঞের মতো বলে: 'সন্ধ্যে হয়ে আসছে···ছেলেমেয়ে দুটোও নেতিয়ে পড়েছে···থামা এখন উচিত হবে না।'

'তবে ভগবানের নাম নিয়ে এগিয়েই চল···'

মনু যত এগিয়ে চলে, ততই অবাক হয়ে দেখে, এ যেন আর এক বোম্বে শহর···এ তো তার স্বপ্ন-নগরী নয়! পদে পদে ভিখিরী···পদে পদে ব্যাধিগ্রস্ত দীন-দরিদ্র আর্তলোক···একটা পয়সার জন্যে, এক মুঠি অন্নের জন্যে, কেঁদে কেঁদে বেড়াচ্ছে! আপনা থেকে একটি দীর্ঘশ্বাস পড়ে। মনে মনে ভাবে, তাহলে যা শুনেছি, সব গল্প-কথা—কই, এর পথে পথে তো পয়সা পড়ে নেই···এখানেও সেই ছেঁড়া ময়লা কাপড় আর সেই 'একটি-পয়সা দাও-না-বাবা'!

বাজার এবং বস্তি পেরিয়ে তারা ভদ্রলোকদের পাড়ায় এসে ঢোকে। দু'ধারে বড় বড় বাড়ি।

মনু বলে: 'দাদা, এইখানে কোথাও একটু জায়গা খুঁজে নিলে হয় না?'

হরি উত্তরে জানায়: 'আরে সর্বনাশ! এখানে দেখছ না সব বড় লোকের বাড়ি! এখানে রাত কাটানোর বিষম বিপদ···জানোই তো বড় লোকদের বাড়িতে চুরি-চামারি প্রায়ই হয়। রাতে যদি এই রকম কোন কাণ্ড ঘটে, তাহলে পুলিশের লোক আগে আমাদের ধরবে। আমরা গরীব, চাল-চুলো নেই সুতরাং আমরা চোর···এখানে নয়···আরও একটু এগিয়ে চল···সামনেই দোকানপাট সব আছে। একটু রাত হতেই তারা দোকান বন্ধ ক'রে বাড়ি চলে যায়···তখন সেই সব বন্ধ দোকানের পাটাতনে কোথাও রাত কাটানো যাবে।'

ছেলেটা আর মেয়েটা তখন ঘুমে অচেতন। মনু তাদের দু'জনকে দু'কোলে তুলে নেয়। সেই অবস্থায় আধ-অন্ধকারে নিজের ভার রাখতে না পেরে, কিসের ওপর ধাক্কা খেয়ে মনু পড়ে যায়। দেখে, একরাশ ছেঁড়া কাঁথার ভেতর একজন কুষ্ঠরোগী···ন্যাকড়া দিয়ে তাঁর পায়ের দগদগে ঘা বাঁধছে।

ভয়ে আর ঘৃণায় মুষু আড়ষ্ট হয়ে পড়ে। কোন রকমে শিশু দুটিকে সামলে নিয়ে সে আবার চলতে আরম্ভ করতেই দেখে, কার পায়ের ওপর সে পা দিয়ে ফেলেছে···অন্ধকারে ফুটপাতের ওপর এক ভিখারিণী তার শিশু-পুত্রকে বুকের কাছে আগলে নিয়ে শুয়ে ছিল। সে নড়ল না, কোন আহা-উহুও করল না। শুধু অন্ধকারে তার চোখ দুটো বাঘের চোখের মতো একবার জ্বলে উঠল।

মুষু মনে মনে লজ্জিত এবং সঙ্কুচিত হয়ে পড়েছিল। কিন্তু কোন প্রতিবাদ এল না দেখে, নীরবে এগিয়ে চলতে থাকে।

ঘুরতে ঘুরতে তারা একটা বন্ধ দোকানের সামনে এসে দাঁড়ায়। দোকানের সামনে হাত চারেকের মতোন একটা কাঠের পাটাতন আছে—খালি···এতক্ষণ খোঁজাখুঁজির পর এইটুকু খালি জায়গা চোখে পড়েছে। সেইখানেই কি ক'রে কি ব্যবস্থা করা যায়, তারা দাঁড়িয়ে জল্পনা-কল্পনা করে···

এমন সময় হঠাৎ অন্ধকারে কার যেন দীর্ঘশ্বাস শোনা যায়। মুষু ফিরে চেয়ে দেখে এককোণে অর্ধ-নগ্নদেহে একটি স্ত্রীলোক বসে রয়েছে···দু'হাত দিয়ে মাথাটা এমনভাবে ধরে আছে, দেখলেই মনে হয় যে, কী ভীষণ যন্ত্রণাই না তার হচ্ছে···মানুষের সাড়া পেয়ে স্ত্রীলোকটি সেই অবস্থায় ঘাড় তুলে তাদের দিকে চেয়ে দেখে···একদৃষ্টিতে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকবার পর হঠাৎ সে ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে: 'কাল রাত্তিরে এইখানে আমার সোয়ামী মারা গিয়েছে—'

দীর্ঘশ্বাস ফেলে বৃদ্ধ বলে: 'মরেছে, না বেঁচে গিয়েছে! ভালোই হয়েছে, তার খালি জাগায় আমরা থাকতে পাব।'

সেই অন্ধকারে সেই স্ত্রীলোকটির স্থির-দৃষ্টির দিকে চেয়ে দেখতে দেখতে মুষুর মনে জেগে ওঠে মৃত্যুর আতঙ্ক। একবার দৌলতপুরে এক দোকানে সে একটা ছবি দেখেছিল, যমরাজ তার বিপুল নীলবর্ণ দেহ নিয়ে দণ্ড হাতে রক্ত-সাগরের তীরে দাঁড়িয়ে আছে, আর সেই রক্ত-সাগরে হাবুডুবু খাচ্ছে যত সব পাপীতাপী লোক। আজ সহসা সামনের অন্ধকারে তার মনে হলো যেন সেই নীলবর্ণ অতিকায় পুরুষ ভাঁটার মতো লাল চোখ বার ক'রে দাঁড়িয়ে আছে। ভয়ে তার অঙ্গ হিম হয়ে আসে। কাঁধের ওপর ঘুমন্ত শিশুর তপ্ত শ্বাসে যেন ফিরে পায় জীবনের মহা-আশ্বাস।

হরিহর বলে ওঠে: 'আমি ভুতের ভয় করি না।' স্ত্রীলোকটি তখনও এসে

পেঁছিয় নি। তাই এ-সব কথা সে শুনতে পায় নি। সে এসে পড়তেই হরি বলে : 'লক্ষ্মী, এখানেই আজকের মতো ডেরা গাড়লুম···মালপত্র নামিয়ে পা ছড়িয়ে একটু বোস···'

কোল থেকে টিনের বাক্স আর বোঁচকা নামিয়ে লক্ষ্মী বসে পড়ে।

মুন্নুর কাঁধে হাত রেখে বুড়ো বলে : 'ওদের দু'জনকে ঐ কাঠের ওপর শুইয়ে দাও ভাই···ওদের মার সঙ্গে ওরা ওখানেই শুক···আমরা ফুটপাতের ওপর শোব'খন।'

শিশু দুটিকে কাঠের ওপর শুইয়ে দিয়ে মুন্নু দেয়ালে ঠেস দিয়ে ফুটপাতের ওপর বসে পড়ে। সারাদিনের রোদে পুড়ে ফুটপাতের পাথর তখনও গরম হয়ে আছে। একবার আশে-পাশে চারদিকে চোখ তুলে মুন্নু দেখে তারা নিতান্ত সঙ্গহীন নয়। আশে-পাশে ফুটপাতের ওপর গায়ের কাপড় মুড়ি দিয়ে সারি সারি সব মানুষ শুয়ে আছে। মুন্নু মনে মনে ভাবে, অভ্যেসে সব সয়ে যায়··· আমারও একদিন অভ্যেস হয়ে যাবে···

ক্রমে রাতের অন্ধকার গভীর হয়ে আসে। আশে-পাশে সবাই ঘুমিয়ে পড়ে। মুন্নু একা জেগে থাকে। ঘুম তার আসে না। মনে হয় যেন সে একা, একান্ত একেলা।

হঠাৎ কোথা থেকে একটা গরম হাওয়া আসে···হাওয়ার সঙ্গে অদ্ভুত পচা গন্ধ···ঘি···চন্দন···প্রস্রাব···মাছ···পচা ফল···সব মিলে একটা উৎকট দুর্গন্ধ ···ঘাড় তুলে সে দেখতে চেষ্টা করে কোন্‌দিক থেকে গন্ধ আসছে। কিন্তু কিছুই দেখতে পায় না···তার বদলে একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস, এক টুকরো কান্না তার কানে এসে লাগে। অন্ধকারে কে নড়ে ওঠে···মড়ারা কি পাশ ফেরে? সেদিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে উলটো দিকে চায়···একটা কুলি ছট্‌ফট্‌ করছে আর আপনার মনে কি বকে যাচ্ছে। মুন্নু আবার দৃষ্টি সরিয়ে নেয়। পাশেই হরি ঘুমিয়ে পড়েছে···তার ওধারে সেই সদ্য বিধবা স্ত্রীলোকটি অন্ধকারে তখন ঠিক সেই ভাবে মাথায় হাত দিয়ে বসে আছে···তার ওপাশে সারি সারি সব পড়ে আছে···যেন চাদর চাপা সব মড়া।

সহসা তার মনে আবার আতঙ্ক জেগে ওঠে, নিদ্রাহীন নিশিথের আতঙ্ক··· নিশ্চল নিশ্চুপ দেহের দুর্জ্ঞেয় আতঙ্ক···

জোর ক'রে চোখের পাতা বন্ধ ক'রে সে ঘুমোবার চেষ্টা করে···নিজেকে বোঝাতে চেষ্টা করে আজ রাতে তার আশে-পাশে যারা শুয়ে রয়েছে, তারা তারই মতোন সব মানুষ···মড়াও নয়···ভূতও নয়···কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই দেখে, আপনা থেকে চোখের পাতা খুলে গিয়েছে···অন্ধকারেই একা সে চোখ চেয়ে জেগে আছে। কাতরভাবে সে বলে ওঠে, আয় ঘুম, আয়···পাশে চেয়ে দেখে বুধ্ধ হরি কিভাবে ঘুমুচ্ছে। হয়ত ফুটপাতে ঘুমোবার একটা আলাদা কায়দা আছে··· বুধ্ধ ঠিক যেভাবে শুয়ে ছিল, মুন্নু ঠিক সেভাবে চেষ্টা করে শোয়···কিন্তু তবুও কই ঘুম তো আসে না! চোখ ভারী হয়ে আসে, দেহ ক্লান্তিতে নাড়তে পারে না, তবু চোখে আসে না ঘুম।···গায়ের ঘামে পাথর ভিজে ওঠে। অসহ্য গরম, কোথাও একটুকু কিছু নড়ছে না। মুন্নুর মনে হয়, যেন সে ছুটে চলে যায়, যেখানে একটুখানি বাতাস আছে, এই রাস্তার বাইরে, এই বাড়ি-ঘর-দোর ছাড়িয়ে, খালি মাঠের মধ্যে যেখানে অবাধে বইছে অফুরন্ত হাওয়া। কিন্তু ছুটে যেতে গিয়ে, তার ভয় হয়, পদে পদে সে ঘুমন্ত মানুষদের হয়ত মাড়িয়ে ফেলবে —তখন হয়ত একটা তুমুল গণ্ডগোল বেধে যাবে—জোর ক'রে সে চোখ বন্ধ ক'রে থাকে। উপুড় হয়ে পাথরের ওপর দেহের সমস্ত চাপ দেয়···বায়ুহীন নিশ্ছিদ্র অন্ধকার নিবিড় হয়ে আসে···

ভোরের দিকে রাস্তার ওপর দিয়ে ঠাণ্ডা বাতাস বয়ে যায়।

ছেঁড়া কাপড় আর শতচ্ছিন্ন কাঁথার ফাঁক দিয়ে ভোরের বাতাস অসীম উদারতায় সকলের অঙ্গ স্পর্শ ক'রে যায়···ভিখিরী, কুলি, কুষ্ঠরোগী, অনাথ আতুর—সকলকেই সমানভাবে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যায়।

ঘুমের মধ্যে তারা কুণ্ডলী পাকিয়ে গিয়েছে···সান্নিধ্যের উত্তাপের আকর্ষণে এখন পরস্পর পরস্পরের গা ঘেঁষে চলে এসেছে···শীতের কাঁপুনিতে কেউ কেউ ধনুকের মতো হয়ে গিয়েছে···হাঁটু দুমড়ে মাথায় গিয়ে ঠেকেছে।

এমন সময় জোরে এক ঝট্‌কা বাতাস তাদের কাঁপিয়ে দিয়ে যায়।

নগ্নদেহে কুষ্ঠরোগীটি কেঁপে কেঁপে ওঠে···যে-যার ছেঁড়া কাপড় বা কাঁথা ভালো ক'রে গায়ে জড়িয়ে নেয়···কেউ বা ভোরের ঘুম ভেঙে উঠে অভ্যাসবশত বলে ওঠে: 'রাম···রাম··· হরি···হরি···'

সমুদ্রের ঝড়ো হাওয়া ক্রমশ জল-ভারাসিক্ত হয়ে ওঠে। ফুটপাত-শায়ীদের মুখে রামনাম ঘন ঘন উচ্চারিত হতে থাকে। তারা একে একে জেগে বসে। কেউ কেউ তখনও শুয়ে থাকে। কিন্তু বেশীক্ষণ আর তা সম্ভব হয় না। দেখতে দেখতে সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে আইনের রক্ষণদল লাঠি হাতে ফুটপাথ পরিষ্কার ক'রে চলে।

হরি জেগে উঠে মুন্নুকে ঠেল তুলে বলে : 'চলো ভাই, একবার কারখানার দিকে এগুনো যাক !'

হরি টিনের বাক্সটা ঘাড়ে তুলে নেয়···মুন্নু ছেলেটাকে কোলে করে···লক্ষ্মীর কোলে মেয়েটা ওঠে···যাত্রীরা আবার চলতে শুরু করে।

মহানগরী তখন একটু একটু ক'রে জেগে উঠেছে। রাস্তায় একজন দু'জন ক'রে দেখতে দেখতে লোকে ভরে ওঠে। সাদা লোক, লাল লোক, কালো লোক, আধ-কালো লোক···নানা গাত্রবর্ণের লোকে রাস্তা ভরে যায়। তাদের মধ্য দিয়ে যাত্রীরা আস্তে আস্তে চলে, তখনও তাদের অঙ্গ থেকে ঘুম ছাড়ে নি।

ক্রমশ বোম্বের উচ্চ-শির সব বাড়ির অন্তরাল রেখা থেকে সূর্য মাঝ-আকাশের দিকে এগিয়ে আসে···রোদের তেজ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মুন্নুর মনে হয় যেন তার পেটের ভেতরটাও জ্বলছে···গলা শুকিয়ে আসছে···রোদ দিয়ে সূর্যদেব তার চলার শক্তি যেন শুষে নিচ্ছে।

গোল গোল চোখ দুটো বার ক'রে হরি বলে : 'আরে বেশী দূর নয়··· মাইল খানেক।' বুড়োর কপাল দিয়ে ঘাম ঝরে পড়ছে, প্রত্যেক পা ফেলবার সঙ্গে সঙ্গে যেন তার দম ফুরিয়ে আসছে।

মুচকে হেসে মুন্নু বলে : 'আমাদের উত্তর দেশের মাইল থেকে তোমাদের দখনে দেশের মাইল দেখছি ঢের বড় !'

লক্ষ্মী কেতরে এগিয়ে এসে বলে : 'হাঁ গা, এত যে বড় বড় বাড়ি···এর কোথাও একটা ঘর পাওয়া যায় না ?'

হরি ধমকে ওঠে : 'থামো···কাজ জোটে কিনা আগে তাই দেখো !'

একে এই দীর্ঘ পথের ক্লান্তি···তার ওপর যত পথ এগিয়ে আসছে, হরির মনে ততই ভয় বেড়ে উঠছে, ফোরম্যান সাহেবের সঙ্গে কি ক'রে কথা বলবে ?

কিছুক্ষণ চলার পর, সামনে একটা বিরাট পাঁচিল-ঘেরা বাড়ি তাদের সামনে

দেখা দিল। আঙুল দিয়ে দেখিয়ে হরি বলে : 'ঐ…ঐ হলো স্যারজাবাইট কারখানা…'

হঠাৎ একদল কাকের চিৎকারে মুন্নু দেখে, একদল লোক এই সবে স্নান ক'রে উঠে সূর্যকে প্রণাম করছে। কাছে-ভিতে কোথাও কোন জলের কল দেখতে না পেয়ে মুন্নু ভাবে, এতগুলো লোক স্নান করল কোথায় ? ভালো ক'রে এদিক-ওদিক দেখতে, মুন্নু লক্ষ্য করল, এক সারি ভেঙে-পড়া খোলার ঘরের পাশে—একটা ছোট্ট পাহাড়ী টিপির তলায় খানিকটা ঘোলাটে নীল জল জমা হয়ে রয়েছে। জলের ওপর এক থাক পুরু সর জমে আছে। তার মধ্যে মানুষের সঙ্গে গরু আর মোষ নির্বিবাদে একসঙ্গে স্নান ক'রছে। কতকগুলো মোষ জলের ধারেই ঘাসের ওপর শুয়ে আছে। তাদের ঘাড়ের ওপর দলবেঁধে বসে কাকেরা ঘাড়ের ক্ষতস্থান থেকে খাদ্য সংগ্রহ করছে।

একপাল ছেলে তারই মধ্যে লাফাচ্ছে, ঝাঁপাচ্ছে। তাদের খেলা দেখে মুন্নুর মনে পড়ে যায়, নিজের ফেলে-আসা গ্রাম্য-জীবনের কথা, বিয়াসের জলে কত না খেলা! দুর্দমনীয় লোভ হয়, এই মুহূর্তে, কাপড়টা খুলে রেখে, জলে ঝাঁপিয়ে পড়তে।

সেই নীল জল থেকে যে দুর্গন্ধ উঠছিল, উৎসাহের ঝোঁকে তখন তা' আর তার নাকে লাগে না। আগ্রহ ভরে হরিকে বলে : 'এসো না দাদা, এখানে স্নানটা সেরে নি!'

হরি বাধা দেয় : 'আরে এখন নয়, এখন নয়…এখন সময় নেই…যদি একটা কাজ জোটে, তাহলে এখানেই তো একটা ঘর ভাড়া নিতে হবে, তখন দু'বেলা এখানে তুমি নেয়ো!'

অগত্যা মুন্নু তাই মনকে বোঝায়।

একটু এগিয়ে সামনে মস্ত বড় লোহার গেটের ওপর বড় বড় অক্ষরে লেখা, "স্যার জর্জ হোয়াইট কটন মিল।"

গেট দিয়ে ভেতরে ঢুকতে যাবে, এমন সময় পাঠান দরোয়ান বন্দুক ঠুকে চেঁচিয়ে ওঠে : 'থামো!'

ভয়ে লক্ষ্মীর কোল থেকে ছেলেটা পড়ে যাবার মতোন হয়। তাকে কোন রকমে সামলে নিয়ে ভয়ে সে কাঁপতে থাকে।

সম্ভ্রমটা একটু অতিরিক্ত মাত্রায় দেখিয়ে হরি বলে ওঠে : 'সালাম, খাঁ সাহেব ! আমাকে চিনতে পারছেন না হুজুর ? আমি হরি···চার মাস আগে আমি এখানে কাজ করতাম···দেশে গিয়েছিলুম হুজুর, পরিবার আনতে···একবার ফোরম্যান চিমটা সাহেবের সঙ্গে দেখা করব ।'

'আচ্ছা', বলে পাঠান নাদির খাঁ পাশের টুলে উপবিষ্ট একটা ছোট ছেলেকে হুকুম করে : 'লালকাকা, ভেতরে গিয়ে চিমটা সাহেবকে খবর দে, একজন বুড়ো কুলি কাজের জন্যে দেখা করতে এসেছে !'

লালকাকা ভেতরে অদৃশ্য হয়ে যায় । দরজার বাইরে তারা নীরবে অপেক্ষা ক'রে থাকে । মিনিট কুড়ি অপেক্ষা ক'রে থাকার পর যখন ভেতর থেকে কোন উত্তর আসার লক্ষণ দেখা গেল না, তখন হরি মুন্নুকে আশ্বাস দেবার জন্যই বলে ; 'সাহেব বড় ভালো লোক !'

একজন সাহেবের সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলবার সৌভাগ্য আবার হবে, এই আশাতে মুন্নুর বুকের ভেতর তখন দুলেছিল । শ্যামনগরে তার মনিবের বাড়িতে প্রথম তার সে সৌভাগ্য দেখা দেয়···এখনও স্পষ্ট মনে পড়ে মিঃ ইংলণ্ডের সেই ছোট্ট লাল মুখখানা···তার ওপর প্রভুদয়ালের বাড়িতে যখন পুলিসের ইন্‌স্‌পেক্টর সাহেব আসে···মুন্নু ইংরাজীতে তাঁকে অভিবাদন জানিয়েছিল । মনে মনে অতীতের সেই সৌভাগ্যের সঙ্গে আজকের সম্ভাবনাকে সে মধুরভাবে জুড়তে চেষ্টা করে ।

লক্ষ্মীরও মনের ভেতর অনুরূপ একটা তীব্র আকাঙ্ক্ষা বুকের ধুকপুকুনিকে বাড়িয়ে চলেছিল । এতদিন ঘোমটার দূরত্বের ভেতর দিয়ে কদাচিৎ কখন যে লালমুখ সে দেখেছিল, আজ সামনাসামনি তা' দেখার সৌভাগ্য হবে । এ আনন্দ বহু কষ্টে সে চেপে রেখে চুপটি ক'রে আছে । ছেলেটা আর মেয়েটা কোল থেকে নেমে রাস্তায় নুড়ি নিয়ে খেলা করছে । হয়ত তাতে তারা খিদের কথা ভুলে আছে···

এমন সময় নাদির খাঁ বন্দুক তুলে গর্জন ক'রে উঠল : 'এই খবরদার···ঢিল ছুঁড়ো মত্‌ !'

ভয়ে তারা ছুটে লক্ষ্মীর পেছনে এসে কাপড় ধরে দাঁড়ায় । লক্ষ্মী তাদের কোলের কাছে টেনে নিয়ে জড়িয়ে ধরে ।

এমন সময় দরজার ভেতরে এসে উপস্থিত হলো জিমি টমাস। একদা ল্যাঙ্কাসায়ারের কোন মিলে মিস্ত্রীর কাজ করতো; এখন ভারতবর্ষের অন্যতম বৃহৎ এক মিলের ফোরম্যান সে। বিরাট দেহ…মুখটা বুল ডগের মতোন বড় আর চ্যাপটা…টকটক্ করছে লাল।

কপালে হাত ঠেকিয়ে মাথা নিচু ক'রে হরি অভিবাদন জানায়ঃ 'সালাম হুজুর…সালাম চিমটা সাহেব…'

চিমটা সাহেব চোখ তুলে একবার দেখে নিয়ে ইংরেজী-হিন্দুস্থানীতে বলেঃ 'টোম হারি? ফির আয়া?'

উল্লসিত হয়ে হরি বলে ওঠেঃ 'জী হুজুর!' তার পর হাত জোড়ক'রে বলেঃ 'হুজুর মা-বাপ…আমি শুধু একা আসি নি…আমার বউ আর ছেলেদেরও নিয়ে এসেছি…একটা ছোঁড়াও এনেছি…সবাই আমরা কাজ করবো হুজুর!'

'বলি তোর সব গাঁয়ের লোককে নিয়ে আসতে পারিস্ নি হারামজাদা!'

হতভাগ্য হরি সাহেবের বিদ্রূপ বুঝতে পারে না। আনন্দে বলে ওঠেঃ 'হুজর যদি ভরসা দেন, তাহলে এখুনি চিঠি লিখে গাঁয়ের কয়েকজনকে আনিয়ে নিতে পারি।'

এবার আর সাহেবের ধৈর্য থাকে না। গলা চড়িয়ে তর্জন ক'রে ওঠেঃ 'উল্লুক কাঁহাকার…চাকরি নিয়ে বসে আছি, না? ভাগো!'

হঠাৎ মুন্নুর দিকে নজর পড়তে, সাহেব হেসে বলে ওঠেঃ 'ঐ ছোঁড়াটার জন্যে হয়ত কিছু হতে পারে!'

যুক্তকরে সাহেবের দিকে এগিয়ে গিয়ে হরি কেঁদে ফেলেঃ 'হুজুর…গরীবের অন্নদাতা…মা-বাপ…দয়া ক'রে আমাদেরও একটু ব্যবস্থা ক'রে দিন!'

'আচ্ছা…আচ্ছা…সবসুদ্ধ মাসে ত্রিশ টাকা…তোর দশ টাকা…ঐ ছোঁড়াটার দশ টাকা…ঐ মেয়ে লোকটা পাঁচ টাকা…আর আড়াই টাকা ক'রে ঐ দুটো বাচ্ছা…'

হরি এবার সাহেবের বুটের কাছে এগিয়ে যায়। গরুর চামড়ার বুটে কপাল ঠেকিয়ে হরি আকুল মিনতি জানায়ঃ 'হুজুর, আর একটু মেহেরবানি করুন! ভেবে দেখুন হুজুর…ঘর ভাড়া…এতগুলো লোকের খাওয়া…জিনিস-পত্তর এত মাগ্‌গি…'

'তা' আমি কি করব ? আমার জন্যে কি করেছিস যে আমি তোর জন্যে করব ? গাঁ থেকে ব্যাটা এলি, মেমসাহেবের জন্য এনেছিস্ কিছু ? একবারও ব্যাটা মেমসাহেবকে কি আমাকে ভেট দিয়েছিস ? যদি ঐ টাকাতে থাকতে পারিস তো থাক···নইলে গেট আউট।'

'দেখবেন হুজুর, আপনাকে খুশী ক'রে দেব·· একটু ভেবে দেখুন আপনি, আগে এইখানেই আমি পনেরো টাকা পেতাম !'

সাহেব হেড়ে ওঠে : 'মজা, পেয়েছিস্ না ? যখন খুশী চলে যাবি আর যখন খুশী আসবি···আর সেই মাইনেই তোকে দিতে হবে ? আবদার, না ? বড় সাহেবের হুকুম, যে কুলি কাজ ছেড়ে চলে যাবে, তাকে আর কাজ দেওয়া হবে না। আর তোর মতোন বুড়ো অকেজো লোককে নেওয়াই বারণ···তবু তো শালা তোকে আমি বহুত মেহেরবানি ক'রছি।'

হরি দমে না : 'দোহাই হুজুর, এই বাচ্ছাদের মুখের দিকে চেয়ে দয়া করুন।'

সাহেব ঠোঁট বেঁকিয়ে বলে ওঠে : 'তুই ব্যাটা মজা ক'রে শুয়োরের মতো ছেলে-মেয়ের জন্ম দিবি···আর আর তাদের খোরাক যোগাব, না ? যত সব কালা আদমী···'

আর থাকতে না পেরে মুন্নু বলে ওঠে : 'হুজুর সাহেব ! দৌলতপুরে আমি শুনেছি এখানে কুলিদের সব চেয়ে কম মাইনে হলো ত্রিশ টাকা !'

সাহেব গর্জন ও'ঠে : 'ঝুটা বাত !'

হয়ত সাহেব রাগে ফেটে পড়ত কিন্তু লালকাকা ঠিক সেই মুহূর্তে সাহেবের সই-এর জন্যে একটা খাতা এনে ধরল।

হরিকে কনু-এর গুঁতো দিয়ে ইশারা ক'রে মুন্নু কানে কানে বলে : 'দাদা, চল অন্য জায়গায় চেষ্টা দেখি !'

হরি ভালোরকমই জানত অন্য জায়গায় গিয়ে বিশেষ কোন সুবিধা হবে না। দেখতে-শুনতে আর বাকি ছিল না তার কিছু।

গোঁফে মোচড় দিয়ে সাহেব শেষ কথা বলে ওঠে : 'বল্ কাজ করবি কি না ? কোথাও আর কাজ মিলছে না ! এমনি হাজার হাজার কুলি বোম্বেতে বেকার

ঘুরে বেড়াচ্ছে···আমি যে তোদের নিতে চাইছি, তার কারণ, তুই এখানে কাজ ক'রে গিয়েছিস···আর এ-ছোঁড়াটাকে মনে হচ্ছে চটপটে···'

'হুজুর, আমরা কোথাও যেতে চাই না···আপনার আশ্রয়েই কাজ ক'রতে চাই ···একবার ভেবে দেখুন হুজুর···চাল কত মাগ্‌গি হয়ে গিয়েছে···' হরি হাত জোড় ক'রে জানায়।

'আচ্ছা···আচ্ছা···তোকে আর ঐ ছোঁড়াটাকে পনেরো টাকা ক'রেই দেব··· মনে রাখিস ব্যাটা, এবারের মতো মাফ করলুম···কিন্তু সেবারে আমাকে কিছুই ঠেকাও নি, এবার তা' চলবে না, বলে রাখছি আগে থেকে।'

হঠাৎ কি মনে ক'রে, একটু থেমে, কণ্ঠস্বর একটু নামিয়ে সাহেব বলে ওঠে: 'হাঁ, এখন নিশ্চয়ই কাছে টাকা-পয়সা কিছুই নেই? সে আমি জানি। আচ্ছা, তার জন্যে ভাবনা নেই···আমি দশ টাকা আগাম দিচ্ছি ··কিন্তু মনে থাকে যেন, টাকা পিছু চার আনা সুদ···আর মাসে মাসে মাইনে পেলে আমার কমিশন··· কেমন, রাজী তো? দাঁড়া, আমি টাকা এনে দিচ্ছি।'

সাহেব চলে যেতেই বিরস মুখে নাদির খাঁ বলে ওঠে: 'আরে টাকা ধার নিবি তো আমার কাছে নিলি না কেন? আমি খুব কম সুদ নি···মাত্র টাকায় দু আনা।'

হরি বিব্রত হয়ে পড়ে, পাছে নাদির খাঁ আবার অসন্তুষ্ট হয়।

কাতরভাবে বলে ওঠে: 'কি করবো খাঁ সাহেব, সাহেবকে কথা দিয়ে ফেলেছি।'

নাদির খাঁ কোন কথা না বলে কি দরকারে গুমটি ঘরের ভেতর চলে যায়। সেই ফাঁকে মুন্নু বলে: 'একি কাণ্ড! ফোরম্যানকে মাসে মাসে কমিশন দেব কেন?' আর তা ছাড়া এত চড়া সুদে টাকা ধার করলে কেন?'

মুখ বেঁকিয়ে হরি জবাব দেয়: 'সব জায়গায় এই···ফোরম্যানকে কমিশন দেওয়া মানে চাকরি বজায় রাখা···বলতে গেলে ফোরম্যানই হলো কারখানার সব···'

মুন্নু মনে মনে ভাবে, তা' হয়ত হবে···তবে সাহেবটার পোশাক এত ময়লা কেন? সাহেবদের পোশাক সম্বন্ধে একটা স্বতন্ত্র ধারণা ছিল। হায়, মুন্নু তখনও পর্যন্ত জানত না যে, ঐ ময়লা-পোশাক-পরা ফোরম্যানই হলো

কারখানার ভাগ্যবিধাতা। কারখানার সব ব্যাপারের সঙ্গেই সে জড়ানো। সে জানত না যে মালিকের পক্ষ থেকে তারই একমাত্র অধিকার—লোকজন নেওয়া …এবং তারই প্রসন্নতার ওপর নির্ভর করে চাকরি থাকা না-থাকা…মুন্সু; জানত না যে কুলিদের কাজকর্ম তদারক করার ভার তারই ওপর, এবং শুধু কুলি কেন, কারখানার যে সব যন্ত্রপাতি চলছে সেগুলোকেও সচল রাখার দায়িত্ব তারই। মালিক আর কুলিদের মধ্যে সেই হলো যোগসূত্র…কারণ কুলিদের কোন কিছু হুকুম ক'রতে হলে মালিকরা তারই মারফত সে-কাজ ক'রে থাকে। তাই প্রত্যেক কুলিকেই কাজ পাওয়ার জন্যে তাকে একটা মূল্য দিতে হয় এবং কাজের চাহিদার চেয়ে লোকের চাহিদা যখন বেড়ে যায়, তখন স্বভাবতই সে-মূল্যের হারও বেড়ে যায়। এত কাজ ক'রেও আর-একটা কাজ তাকে করতেই হয়…মহাজনী কারবার। সে-ও এই কুলিদের জন্যেই। এবং এই কুলিদের জন্যেই সে প্রায় শ'-খানেক চালাঘরও তৈরি করেছে, যখন কুলিরা ঘুরে ফিরে অন্য কোথাও জায়গা পায় না, তখন বাধ্য হয়েই বেশী ভাড়া দিয়ে তার ঘর ভাড়া নিতে হয়।

টাকা নিয়ে যখন সাহেব ফিরে এল, তখন সে আর ফোরম্যান নয়, বাড়িওয়ালা।

'সাহেবের গলিতে আমার একটা চালা-ঘর আছে…ভাড়া মাসে পাঁচ টাকা মাত্র! এখন ঘরটা খালিই আছে। যা, এখুনি সেখানে গিয়ে ঢুকে পড়্—নইলে কে আবার ভাড়া নিয়ে নেবে, বুঝলি? যা, আমি তোর জন্যে কমিয়ে তিন টাকা ক'রে দিলাম।'

করতল দিয়ে কপাল স্পর্শ ক'রে হরি বলে ওঠে: 'হুজুরের দয়ার প্রাণ… আমার মা-বাপ আপনি!'

গম্ভীরভাবে গোঁফ মোচড় দিতে দিতে জিমি টমাস সাহেব নিজের উদারতায় যেন নিজেই মুগ্ধ হয়ে যায়, বলে: 'খুব হয়েছে…যা এখন, কাল ভোরবেলা পয়লা সিটি বাজতে-না-বাজতে হাজির হওয়া চাই। যা…'

যাত্রীর দল ফিরে চলে।

একপাশে খোলা পচা নর্দমা…আর তার ধারে ধারে বহুদিনের সঞ্চিত আবর্জনার স্তূপ…

গলির মুখে দাঁড়িয়ে হরি বলে : 'এই হলো সাহেবের গলি ! ঐ বোধ হয় আমাদের ঘর···' এই বলে সারি সারি কতকগুলি চালাঘরের একপাশে একটা ঘরের দিকে আঙুল তুলে দেখায়। লম্বা-প্রায় ছ'ফিট হবে, আর চাওড়ায় পাঁচ !

তারা সদলবলে সেই দিকে এগিয়ে চলে···ঘরের সামনে এসে দেখে দরজায় একটা ছেঁড়া চট পর্দার মতো ঝুলছে। চট সরিয়ে বুধ ঘরের মধ্যে উঁকি মেরে দেখে···ঘর নয়, একটা অন্ধকার গর্ত···

পুরনো চালা ঘুণ-ধরা বাঁশের আশ্রয় অবজ্ঞা ক'রে মাটির দিকে ঝুলে পড়েছে —মুন্নুর বা লক্ষ্মীর দাঁড়াতে গেলেই মাথায় লাগে। সেদিক থেকে হরির বরাত ভালো ছিল, কারণ বয়স তাকে আগে থাকতেই কুঁজো ক'রে দিয়েছিল ! ঘরের মেঝে বাইরের রাস্তার চেয়ে আধ হাত নিচু···তার ওপর ফুটো চাল থেকে বৃষ্টির জল পড়ে দিব্যি ঘাস জন্মেছে। দেয়ালে মাটির ফাটল ছাড়া কোথাও আর-একটু ফাঁক নেই যে আলো-বাতাস আসতে পারে কিংবা ঘরের ভেতরের ধোঁয়া বাইরে যেতে পারে। তবে চিমটা সাহেব অন্য ঘরগুলোর চেয়ে এই ঘরটির একটি স্বতন্ত্র গর্বের জিনিস ছিল, দরজায় চটের পর্দা···ঘরের আবরু তো রক্ষা হবে !

হরির কাছে এ-সব কিছু নতুন লাগে না। তাই ঘরে ঢুকে সহজভাবেই সে বলে : 'যাক্, এবার একটু হাত-পা মেলে বসা যাক।'

স্ত্রীকে ডেকে বলে : 'লক্ষ্মী, খাবার যা আছে, ভাগ ক'রে সকলকে দাও···'

সেই অন্ধকার ঘরের ভেতর মুন্নু স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে···সোজাভাবে নয়···একটু নুয়ে। চারদিক থেকে সেই অন্ধকারে একটা ভ্যাপসা পচা গন্ধ তার নাকে এসে লাগে···সব স্বপ্ন তার ভেঙে চুরমার হয়ে যায়।

হঠাৎ দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে তার মনে হলো ঘামে সারা মুখ ভিজে উঠেছে···মাথাটা লাট্টুর মতো ঘুরছে। ক্রমশ চোখের সামনে অন্ধকার আরও নিবিড় হয়ে ওঠে। নিঃশ্বাস নিতে গিয়ে দম আটকে আসে। ম্লান হেসে সে মাটির ওপর বসে পড়ে···নইলে সে মূর্ছিত হয়ে পড়েই যেত।

লক্ষ্মী তখন প্যাটরার ভেতর থেকে বাসি মিষ্টি-ফুলুরী বার করছিল। হঠাৎ মুন্নুকে অসাড় হয়ে বসে পড়তে দেখে ছুটে পাশে গিয়ে বসল।

কিছুক্ষণ পরে মুমু নিজেই উঠে দাঁড়ায়—হরির সঙ্গে বাজার করতে বেরোয়। কুলি-পাড়ার বাজার, নামেই বাজার।

বাজারে ঢুকতেই দু'একজন চেনা লোকের সঙ্গে হরির দেখা হয়···আগে এই বাজার থেকেই হরি জিনিস-পত্র কিনত। সেই সূত্রে সেখানকার কুলিদের সঙ্গে তার আলাপ ছিল।

একটা দোকানের সামনে একদল কুলি বসে ছিল···দোকানী একজন শিখ। তার সামনে সাদা উর্দি'পরা একজন লোক একটা চাদর বিছিয়ে চাল কিনছিল। দোকানী গুনে গুনে ওজন ক'রে ঢেলে দিচ্ছিল: 'একা···দুয়া···একা···দুয়া···'

হঠাৎ হরিকে দেখে কুলিদের মধ্যে একজন বলে ওঠে: 'আরে, এই যে হরি ভাই, কবে এলে?'

হাত-জোড় ক'রে অভিবাদন জানিয়ে হরি বলে: 'এই ভাই পরশু এসেছি···'

'তোমার বউ-ছেলেপুলে সব ভালো তো?'

'হাঁ ভালোই আছে একরকম···তাদের এবার সঙ্গে ক'রে নিয়ে এসেছি।'

'তাই নাকি! বেশ···বেশ···'

এমন সময় দোকানী পাল্লা নামিয়ে রেখে চিৎকার ক'রে ওঠে: 'বলি, এটা দোকান, না তোমাদের আড্ডাঘর···? কাজের সময় যত সব ঝামেলা···দূর হ···হাঁ···একা···দুয়া···তিয়া···'

দোকানী আবার পাল্লা তুলে নিয়ে মাপতে শুরু করে।

কুলিরা চুপটি ক'রে বসে থাকে।

চাল ওজন করা শেষ হয়ে গেলে দোকানী ক্রেতাকে জিজ্ঞেস করে: 'বলো হে, চিমটা সাহেবের আর কি কি দরকার?'

চিমটা সাহেবের বেয়ারা উত্তরে জানায়: 'দুটো ডবল রুটি···এক ডজন ডিম···আর দুটো মুরগী···'

দোকানের ভেতর থেকে দুটো বড় পাউরুটি এনে ধরে দেয়। মুমু চেয়ে চেয়ে দেখে, হাঁ এই রকম সাদা পাউরুটি সাহেবেরাই খায় বটে!

'আর কি? এক ডজন ডিম, না? এই নাও···এক···দুই···তিন···এই এক ডজন···হাঁ···দুটো মুরগী···না!'

এই বলে সেখান থেকে উঠে কুলিদের একপাশে একজন চাষী দাঁড়িয়ে ছিল, তার কাছে এগিয়ে যায়। চাষীটার বগলে দুটো মুরগী।

'বলি এই শম্ভু···হুতুম প্যাঁচার বাচ্চা···বল্···বল্ জলদি বল্···এ দুটো কততে নিবি ?'

একটা মুরগী দোকানীর হাতে তুলে দিয়ে শম্ভু সগর্বে বলে : 'একবার মুরগীটাকে টিপে দেখো···তার পর দাম বলব !'

মুরগীটার মুণ্ড ধরে এ-দিক ও-দিক ঘুরিয়ে দোকানী বলে ওঠে : 'দূর বেটা, কোথা থেকে একটা বুড়ো মুরগী নিয়ে এসেছিস···ওটা তো দেখছি তেমনি শোলার মতো হালকা···একটুও মাংস নেই গায়ে···শুধুই···হাড়···বল্···বল্··· কি দিতে হবে ?

শম্ভু কাতরভাবে বলে : 'কি আর বলব হুজুর ! হুজুর মা-বাপ ! ভেবে-চিন্তে উচিত যা দাম বিবেচনা করেন, দিন্···নিজেরা না খেয়ে, এই দুটোকে খাইয়েছি !'

তার সঙ্গে আর কোন কথাবার্তা না বলে, মুরগী দুটোকে নিয়ে এসে চিমটা সাহেবের বেয়ারার হাতে তুলে দেয় : 'এই নাও···বদরুদ্দীন সাহেব···'

কি দামে বেচছে, সেটা যাতে, যার কাছ থেকে এখুনি কিনল, তার সামনে আলোচিত না হয়—সেই জন্যে তাড়াতাড়ি বলে ওঠে : 'দাম এখন থাক··· সাহেবের নামে খাতায় লিখে রাখলাম।'

তার পর দোকানের ভেতর গিয়ে একটা কাঁচের বোতল থেকে কতকগুলো চক্‌লেট-জাতীয় জিনিস নিয়ে এসে বদরুদ্দীনের হাতে দিয়ে বলে : 'আমার নাম ক'রে মেমসাহেবকে দিও···আর তোমার পাওনা···একদিন দুপুরে সময় ক'রে এসো···হিসাব ক'রে যা হোক বন্দোবস্ত করব !'

মুরগী দুটোকে বগলে ক'রে চিমটা সাহেবের বেয়ারা বদরুদ্দীন গা দুলিয়ে চলতে শুরু করে···সাদা সাহেবের কালা চাকরেরা ঠিক যেমনভাবে চলে।

বদরুদ্দীন দৃষ্টি-সীমার বাইরে চলে গেলে শিখ দোকানী শম্ভুকে ডাকে : 'মুরগীর দামের বদলে চাল নিবে না পয়সা নিবে ?'

শম্ভু দীনভাবে জানায় : 'কিছু পয়সা দিন, আর কিছু চাল-ডাল দিন !'

'আচ্ছা, এই নে চারআনা পয়সা আর আঁচল পাত···একসের চাল দিচ্ছি, !

শম্ভু ছুটে গিয়ে দোকানীর হাঁটু জড়িয়ে ধরে : 'কি বলছ সর্দারজী ! এক-একটা মুরগীর দাম যে এক-এক টাকা। বাড়িতে আমার বউ এ দুটোকে যা খাইয়েছে, তাতে আমাদের অন্তত এক হপ্তার খোরাকী চলে গিয়েছে ! আমি তো বলেছিলাম, বেচব না। কিন্তু কি করব, নগদ পয়সা যে একটাও নেই, সর্দারজী ! হক দাম যা, তাই দাও !'

সর্দার এবার রেগে ওঠে।

'কি ! আমি তোকে ঠকাচ্ছি ? হক দাম, মানে ? মুরগি দুটো থেকে ভেবেছিস আমি বুঝি খুব লাভ করলাম ? আরে ব্যাটা, ও দুটো আমাকে এমনি বকশিশ্ দিতে হলো সাহেবকে ! ঘুষ না দিলে সাহেব এখান থেকে মাল নেবে কেন ? ও-থেকে এক পয়সাও আমি লাভ করছি না।'

হাত জোড় ক'রে শম্ভু বলে : 'হুজুর, তুমিও মনিব, সাহেবও মনিব···তোমরা দু'জনেই বড়লোক···তোমরা ইচ্ছে করলে যা খুশী তাই বকশিশ্ করতে পার। আমিও পরে একদিন হুজুরকে একটা মুরগী বকশিশ ক'রে যাব। তবে দোহাই সর্দারজী, এখন এই দুটো মুরগী ছাড়া আমার আর কিছু নেই। বাড়িতে একটা দানা নেই যে বউ-ছেলের মুখে দি ? এক সের চালে এক দিনও যাবে না···আর চারআনা পয়সায়, বোম্বের মতো শহরে কি কিনব বলো ? বিচার ক'রে একটা কথা বল ! অন্যায় করো না সর্দারজী !'

সর্দারজীর গলা সপ্তমে চড়ে যায়।

'কি ! আমি অন্যায় করছি ? ঠকাচ্ছি তোকে ? জানিস্ গুরুগ্রন্থ রোজ পুজো করি আমি ! কাকে কি বলতে হয়, ভেবে-চিন্তে বলবি হারামজাদা ! যা, আর দু'আনা বেশী দেব···আর গোলমাল করবি না···তোকে নিয়ে পড়ে থাকলেই তো চলবে না···অন্য খদ্দের দেখতে হবে।'

শম্ভুর চোখ আপনা থেকে জলে ভিজে আসে। হাত জোর ক'রে বলে : 'হুজুর আমি তো বেশী চাইছি না ! যা ন্যায্য দাম, আমাকে তাই দিন !'

দোকানীর হাতের কাছে একটা হাতা ছিল। সেটা তুলে সজোরে শম্ভুর কাঁধে এক ঘা বসিয়ে দেয় : 'যা ব্যাটা পাজী। দূর হয়ে যা আমার সামনে থেকে। ব্যাটাদের যতই দাও। ততই নাকে কান্না !'

আহত হয়ে শম্ভু সরে আসে। ছোট ছেলের মতোন অসহায়ভাবে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে।

মুন্নু সামনেই বসে ছিল। যেন মাটির সঙ্গে কে তাকে গেঁথে দিয়েছে। সামনে যে কি হচ্ছে, তা সে শুনেও শোনে না, দেখেও যেন দেখে না।

মার খেয়ে শম্ভু বসে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে কুলীরা তার কাছে গিয়ে তার হাত ধরে টেনে তোলে: 'কাঁদিস না···চুপ কর···ব্যাটা ছেলে কাঁদছিস কি রে?'

কুলিরা প্রকাশ্যে তার বেশী সহানুভূতি দেখাতে পারে না, কারণ সর্দারজীর দয়ার ওপর তাদের জীবিকা নির্ভর করছে।

সর্দারজী বিরক্ত হয়ে বলে ওঠে: 'এই নে আর-এক আনা···আর এই এক সের চাল···তোর শুয়ারের পেট ভরাগে যা।'

মুখ দিয়ে তখন রক্ত গড়িয়ে পড়ছিল। এক হাত দিয়ে রক্ত মুছতে মুছতে আর এক হাতে সালাম জানিয়ে, শম্ভু অগত্যা সেই পয়সা আর চাল তুলে নেয়। চলে যাবার জন্যে পা বাড়াতে গিয়ে ফিরে দাঁড়িয়ে অশ্রু-ভারাক্রান্ত কণ্ঠে কেঁদে বলে ওঠে: 'দোহাই সর্দারজী···অপরাধ নিয়ো না···মাফ করো আমায়···মাফ করো সর্দারজী!'

সন্ধ্যার ঘনায়মান অন্ধকারে ধীরে ধীরে সে অদৃশ্য হয়ে যায়।

কুলিদের দিকে ফিরে তখন সর্দারজী জিজ্ঞেস করে: 'কি চাই তোদের?'

'সওদা কিছু চাই না হুজুর!'

'তবে?'

'যদি কোন মোট থাকে···'

'না···না···আজ কোন মোট নেই···'

তার পর হঠাৎ মুন্নুর দিকে দৃষ্টি পড়তে, জিজ্ঞেস করে: 'কি চাই রে তোর?'

হরি এগিয়ে গিয়ে বলে: 'ও আমার সঙ্গে এসেছে সর্দারজী। মিলে কাজে ঢুকেছে···ওর ইচ্ছে, আপনার দোকান কেকেই কিছু মাল খাতায় লিখে যদি পায়···অবিশ্যি বরাবর আপনার সঙ্গেই লেনদেন চলবে···আমাকে তো চিনতে পারছেন হুজুর? আমি হরি···গত বছর এইখানেই কাজ করতুম···'

সর্দারজী বলে ওঠে: 'এ বছর আমি সুদের হার চড়িয়ে দিয়েছি···'

'আমি টাকা ধার নিতে আসি নি হুজুর···আমি বলছিলাম কি, যদি

দু'টাকার চাল আর এক টাকার ডাল ধারে দেন···আপনার কেনা গোলাম হয়ে থাকব···আর যা দরকার, তা' না হয় নগদেই কিনব !'

সর্দারজী জানিয়ে দেয় ধারে মাল নিলে, টাকা-পিছু একআনা ক'রে সুদ দিতে হবে।

হরি কৃতার্থ হয়ে বলে : 'তা' হুজুরের যা ইচ্ছে···আমি না বলব না।'

'তা' হলে কাপড় পাত্ত···আর কি কি জিনিস দরকার ?'

সর্দারজী নামতা পড়ার মতো তাড়াতাড়ি যেন মুখস্থ বলে যায় : 'ময়দা টাকা টাকা সের, চাল আট আনা, ঘি পাঁচ টাকা, খাঁটি সর্ষের তেল এক টাকা ···গুড় চার আনা···ইংরেজী চিনি আট আনা···নাও···জলদি বল কি কি চাই। অন্য খদ্দের দাঁড়িয়ে আছে !'

উল্লসিত মনে হরি ফর্দ বলে চলে : 'দশ সের ময়দা, পনেরো সের চাল, পাঁচ সের ডাল, এক সের তেল, এক সের দিশি চিনি···'

মাসের শেষে এই ফর্দের দরুন তাকে কত যে দিতে হবে, সে-বিষয়ে সে একটুও ভাবে না, কারণ কততে কত হয়, সে-ধারণা তার ছিল না।

কত টাকা যে খরচ হচ্ছে, মুন্নু তা' জানতেও চায় না···কারণ মাসের শেষে পনেরো টাকা সে পাবে, সেই ঐশ্বর্যের সম্ভাবনা ইতিমধ্যেই তাকে বেপরোয়া ক'রে তুলেছে।

॥ নয় ॥

ভোরের অন্ধকারে তখন ঘুম-পাড়ানীয়া হাওয়া বইছে, সেই সময় পাতলা আকাশ চিরে হঠাৎ বেজে উঠল কারখানার বাঁশী। তীব্র দীর্ঘ শব্দ।

তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে উঠেই লক্ষ্মী একরকম বেসামাল কাপড়-চোপড়ে হাঁড়ি থেকে বাসি ভাত আর ডাল বার ক'রে সকলের সামনে ধরে। মাটির হাঁড়ি থেকে খুঁটে খুঁটে শেষ ভাতটি বার করতে করতে, কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম আপনা থেকে ফুটে ওঠে। কিন্তু সেই বন্ধ ঘরের পচা গরমে যে তার কোন অসুবিধা হচ্ছে, তা' দেখলে মনে হয় না। লক্ষ্মীর মুখ দেখলে মনে হয় না যে সে দুই ছেলেরা মা···পল্লীর মুক্ত জীবন তার সহজ যৌবন-শ্রীকে এখন অটুট রেখে দিয়েছে। হয়ত প্রতিদিনের জীবনের তিক্ততা সম্বন্ধে সে সম্পূর্ণ উদাসীন···

নয়তো পরিপূর্ণ স্বাস্থ্যের আভ্যন্তরিণ জ্যোতিতে বাইরের ময়লার কোন ছাপ পড়তে পায় নি…তার দুটি ঘন কালো চোখে এখনও আলো ঝিকমিক করে… গালের দু'ধারে দুই গণ্ড এখনও তামাটে লাল। ঈষৎ-মুক্ত দুই ওষ্ঠে ভয়হীন, কুণ্ঠাহীন সদ্যবিকশিত সহজ হাসি…সে-হাসি নিজেকেও জানে না…জগৎকেও চেনে না।

বনের মধ্যে হঠাৎ যখন হরিণী শোনে সিংহের গর্জ্জন…ভেতর থেকে কি যেন তখন তাকে চঞ্চল ক'রে তোলে। যেন কোন দূর আশঙ্কার হিম-শিহরণ তার পেটের ভেতর থেকে উঠে সমস্ত শরীরে ছড়িয়ে পড়ে…তার ধাক্কা সামলাতে গিয়ে অকারণে হেসে ওঠে। সে অস্বস্তি সহ্য করতে না পেরে স্বামীর কাছে ছুটে আসে …ছোট ছেলে যেমন বিপদে পড়লে মা-বাপের কোলে ছুটে গিয়ে পড়ে। ডান-পায়ের বুড়ো আঙুলটা নেড়ে স্বামীকে জাগাতে চেষ্টা করে…জোরে নাড়তে গিয়েও বেশী জোর দিতে পারে না, পাছে কিছু অসম্ভ্রম দেখায়।

'উঁ…হুঁ…হুঁ…

চোখ চেয়ে নানারকম অনুনাসিক শব্দ করতে করতে হরি উঠে পড়ে।

চাপা গলায় লক্ষ্মী বলে: 'কাজে যাবার সময় হয়েছে…কারখানার বাঁশী বেজে উঠেছে।'

তার পর ছেলেদের কাছে গিয়ে লক্ষ্মী তাদের ঠেলে ঠেলে তোলে, কাপড়ের খুঁট দিয়ে চোখের পিছুটি মুছিয়ে দেয়।

মুন্নুকে ধাক্কা দিয়ে হরি ডাকে: 'ওঠো হে ভায়া!'

মুন্নু আস্তে আস্তে চোখ খুলে চায়, দু'একবার পাশ মোড়া দিয়ে নেয়, তার পর সোজা উঠে বসে সামনে চাইতেই দেখে, লক্ষ্মীর অনবগুণ্ঠিত সম্পূর্ণ মুখ। নারী, অমনি দেহ-সৌষ্ঠব, অমনি তাম্রাভ তপ্ত রঙ। দৃষ্টি-সীমার মধ্যে সুন্দরী বিয়াস নদীর তীরে বহুদিন বহুপ্রভাতে সে দেখেছে, লক্ষ্মীরই মতোন যুবতী সব নারীর অস্তিত্বের আনন্দে তার অজ্ঞাতে তার সর্বদেহ পুলকিত হয়ে ওঠে।

লক্ষ্মীকে সামনাসামনি না ডেকে অথচ তাকেই উদ্দেশ্য ক'রে সে বলে: 'মুখ ধোবার জল একটু পেতে পারি।'

মুন্নুর দিকে চেয়ে লক্ষ্মী এক মুখ হেসে ওঠে, তার পর চোখ ঘুরিয়ে নিয়ে মাটির কলসী থেকে এক গেলাস জল নিয়ে দরজার ধারে রেখে আসে।

'না, কাল বাঁশী বাজবার আগেই উঠতে হবে···নইলে দেরি হয়ে যাবে···' বলেই হরি সোজা উঠে দাঁড়িয়ে সেই অবস্থায় বেরিয়ে পড়ে।

মুমুর কোন রকমে কাপড় দিয়ে মুখটা মুছে নিয়ে তাকে অনুসরণ করে।

ছেলেমেয়েদের খাইয়ে গোছ-গাছ ক'রে ঘরের এটা-সেটা ক'রতে লক্ষ্মীর দেরি হয়ে যায়।

বাইরে থেকে অধৈর্য হয়ে হরি রেগে চিৎকার ক'রে ওঠে: 'বেরিয়ে আয় মাগী! তোর জন্যে সকলের দেরি হয়ে যাবে···'

ছেলেমেয়েদের টানতে টানতে লক্ষ্মী বেরিয়ে পড়ে।

পথে পুকুরের ধারে এসে, তারা যে-যার প্রাতঃকৃত্য সেরে নেবার জন্যে আলাদা আলাদা জায়গায় পুকুরের পাড়ে আশেপাশে বসে পড়ে। চারদিকে তখন তাদেরই মতোন আরও অনেকে প্রকৃতির আহ্বানে সাড়া দিতে বসে গিয়েছে। অসহায় দৈন্য তাদের প্রাথমিক লজ্জাবোধ কেড়ে নিয়েছে কখন, তা তারা নিজেরাই জানে না।

এমন সময়ে কারখানার দ্বিতীয় বাঁশী বেজে ওঠে।

তাড়াতাড়ি পুকুরে হাত-মুখ সব ধুয়ে তারা চলতে আরম্ভ করে। কারখানার দরজার কয়েক গজের মধ্যে যখন এসে পড়েছে তখন শেষ বাঁশী বেজে উঠল। দলে দলে অন্য সব কুলিরাও তখন ভিড় ক'রে দরজার দিকে এগিয়ে চলেছে। তারা সেই দলে মিশে যায়। ভোরের শিশিরে শুকিয়ে যাওয়া কাদা আবার ভিজে উঠেছে। খালি-পায়ে কাদা-চটকানোর শব্দ উঠতে থাকে। নিদ্রাগ্রস্ত অনিশ্চিত ক্লান্ত পদে তারা এগিয়ে চলে। কারুর কোন কথা নেই। প্রত্যেকের কপালে ভয় যেন চিরকালের মতো দাগ কেটে চলে গিয়েছে···দুশ্চিন্তার গুরু-ভারে প্রত্যেকের মাথা আপনা থেকে নিচের দিকে ঝুঁকে পড়েছে। হঠাৎ কেউ পা পিছলে গিয়ে, বা অসাবধানতার রাস্তার গর্তের মধ্যে জমা কাদা-জলে পড়ে গিয়ে, গালাগাল দিয়ে ওঠে। হয়ত বা কোন বুড়ো কুলি পরিচিত অন্য কোন সহকর্মীকে দেখে অভিবাদন জানায়: 'রাম···রাম···ভাই।' ছেলে-ছোকরাদের মধ্যে কেউ হয়ত সামনের শ্লথ-যাত্রীকে হাত দিয়ে ধাক্কা মেরে দ্রুত চলবার ইঙ্গিত করে। সমবেতভাবে তার এগিয়ে চলে, কিন্তু তাদের গতিমাত্রা অতি ধীর, অতি শান্ত।

মন্মু দরজায় ঢুকতেই দেখে, কারখানার ঘড়িতে ছোট কাঁটাটা ছ'টার ঘরে গিয়ে সব দাঁড়িয়েছে।

কারখানার ঘরে ঢোকবার সেডের মুখে জিমি টমাস সাহেব দাঁড়িয়ে আছে। দু'পা ফাঁক ক'রে দীর্ঘ গোঁফের সূক্ষ্ম প্রান্ত দুটি হাত দিয়ে মোচড়াতে মোচড়াতে অগ্রসরমান জনতার দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে আছে। যারা সামনে এসে পড়ে, কলের পুতুলের মতোন তাদের হাত কপালে উঠে যায়, সেলাম জানায়, তার পর ছায়াভয়-ভীত শাবকের মতো দৌড়ে কারখানার সেডে ঢুকে পড়ে।

চিমটা সাহেব গর্জন ক'রে ওঠে: 'হারামজাদারা দেরি ক'রে আসবে আর এখানে এসে ছুটবে! অসভ্য বাঁদরের দল! এক-একজন ক'রে আস্তে আস্তে…'

সকলের পিছনে আসে হরি…চিমটা সাহেবের সামনে পড়ে সসম্ভ্রমে অভিবাদন জানায়: 'সালাম সাহেব!'

সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না ক'রে মুন্নুদের দিকে চেয়ে চিমটা সাহেব বলে ওঠে: 'এই নতুন কুলিগুলো…তোরা আমার সঙ্গে আয়…তোদের কি করতে হবে দেখিয়ে দিচ্ছি!'

লক্ষ্মী আর তার ছোট ছেলে-মেয়েদের একটা ঘরে ঢুকিয়ে দিয়ে চিমটা সাহেব মুন্নুর ঘাড় ধরে টানতে টানতে তাকে হরি আর একজন আধাবয়সী লোকের মাঝখানে একটা খালি কাঠের টুলের ওপর বসিয়ে দিয়ে বলে: 'এইখানে তুই ওদের কাছে কাজ শিখবি!'

মুন্নু ঘাড় ফিরিয়ে দেখে, চিমটা সাহেব অসংখ্য যন্ত্রপাতির মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস আপনা থেকে বেরিয়ে এল।

গরমে মুন্নু ঘেমে উঠেছিল। এইবার সে আত্মস্থ হয়ে তার নতুন পারিপার্শ্বিক চারদিকে চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখে। সামনে বহু কুলি কাজ করছিল। মুন্নু তাদের মুখের দিকে বিস্ময়ে চেয়ে দেখে, শুষ্ক বিবর্ণ মুখে কোন ভাবের অভিব্যক্তি নেই। সেখান থেকে চোখ তুলে যন্ত্রপাতির দিকে চায়, গোল, লম্বা, ত্রিভঙ্গ, নানা আকারের নানা ধরনের সব যন্ত্র। প্রথমটা মন্দ লাগে না। হঠাৎ যন্ত্রগুলো সব একসঙ্গে চলতে আরম্ভ করে। তাদের অসংখ্য উত্থান-পতনের উন্মাদ গর্জন হঠাৎ কানে তালা লাগিয়ে দেয়। দেখতে-দেখতে

তার মনে হলো যেন সে একটা খাঁচায় বন্ধ হয়ে আছে। সেই চিন্তার সঙ্গে-সঙ্গে তার যেন দম আটকে আসতে থাকে। বহু চেষ্টা ক'রে মন থেকে সেই ধারণা দূর করতে চেষ্টা করে। সমস্ত দেয়াল তুলোর আঁশে আর কালিতে কালো হয়ে গিয়েছে···সে বিচিত্র কালো যেন চোখে এসে বেঁধে। সেখান থেকে দৃষ্টি তুলে দেখে, মাথার ওপরে দেওয়ালের এক ফাঁকে একটুখানি ছিদ্র-পথ দিয়ে দু'একফালি সূর্যের আলো যেন লুকিয়ে চুরি ক'রে এসে পড়েছে। যত বেলা বাড়ে ততই ভেতরকার হাওয়া গরম হতে থাকে। তেল আর তুলোয় মিলে একটা ভারী গন্ধ নিঃশ্বাস আটকে দেয়। ঘামে গায়ের জামা ভিজে যায়। মনে হয়, সে যেন একা, সকলের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন। ঐ একঘেয়ে শব্দ বোধ হয় ওকে পাগল ক'রে দেবে।

হরি বলে ওঠে: 'মুন্নু, এই দেখ, আমি ডান হাত দিয়ে যেমন ঘুরুচ্ছি, এই হ্যাণ্ডেলটা তেমনি ক'রে এখানে দাঁড়িয়ে ঘোরাও···যখনি সুতো ছিঁড়ে যাবে তাড়াতাড়ি গেরো দিয়ে নেবে।'

মুন্নু মনে মনে আশ্বস্ত হয়, অন্তত এ কাজটা খুব সোজা। কিন্তু হ্যাণ্ডেল ঘোরাতে গিয়ে প্রথম তার ভয় করে, সে অতি সন্তর্পণে ঘোরাতে থাকে।

'আর একটু জোরে ঘোরাও, ভায়া!' হরি বলে ওঠে।

জোরে ঘোরাতে গিয়ে সুতো ছিঁড়ে যায়। কি ক'রে গেরো দেবে মুন্নু ঠিক করতে পারে না। পাশের লোকটি এসে দেখিয়ে দেয়। তার পর আর কোন অসুবিধা হয় না। সুতো ছিঁড়ে গেলে মুন্নু নিজেই জোড়া দিয়ে নেয়।

একটা নতুন কাজ সে শিখেছে, সেই আনন্দে খানিকটা তার মনের অবসাদ কেটে যায়। কিন্তু এ কাজে দেহের পরিশ্রমের চেয়ে, সে বুঝলো বেশী দরকার সজাগ দৃষ্টি। সর্বদাই একদৃষ্টিতে চেয়ে থাকতে হবে সুতোর দিকে। তার ফলে, কিছুক্ষণ পরেই মাথা ধরে যায়। চারদিক থেকে যন্ত্রের আওয়াজ··· কোনটা টিক্-টিক্ করছে, কোনটা গুম্-গুম্ করছে···নানা যন্ত্রের নানা শব্দ··· অবিরাম, অবিচ্ছেদ···তার সঙ্গে তাদের বিচিত্র গতি···কোনটা উপর-নিচে চলেছে, কোনটা গোল হয়ে ঘুরে-ঘুরে আসছে···সেই সঙ্গে তেল আর নতুন তুলোর গন্ধ···সব মিলে তার মনকে যেন অবসন্ন ক'রে ফেলে···কিছুক্ষণ পরে সে স্পষ্ট অনুভব করে, এক ঘন-কৃষ্ণ-ছায়া যেন তার অদৃশ্য লোহার আঙুল দিয়ে

তার গলা আঁকড়ে ধরছে। মন্মর মনে পড়ে, আরো ছেলেবেলায়, তাদের গাঁয়ে, তাঁতিদের ভাঙা তাঁতশালায়, কলুদের অন্ধকার ঘানি-গাছের আশেপাশে, যেখানে চোখ বেঁধে বলদেরা হয়ত আজও ঘুরে বেড়াচ্ছে···এমনিধারা কি এক অস্পষ্ট ছায়ামূর্তি সে মাঝে-মাঝে দেখতে পেত!

টিফিনের ঘণ্টা বাজবার সঙ্গে-সঙ্গে কুলিরা কাজ ফেলে উঠে দাঁড়ায়। মন্মুও তাদের সঙ্গে-সঙ্গে উঠে পড়ে···বাইরে যাবার জন্যে উদ্‌গ্রীব হয়ে ওঠে। ঘামে সমস্ত জামাটা ভিজে গিয়েছিল। চলতে-চলতে জামাটা তাই খুলে ফেলে। এমন সময় পাশের এক যন্ত্রের ঘূরন্ত চাকায় লেগে জামাটা তার হাত থেকে মুহূর্তের মধ্যে সরে যায়···দেখতে দেখতে জামাটা চাকায় টুকরো টুকরো হয়ে গেল। জামাটা হাত থেকে আচমকা সরে যেতেই মন্মু সেটাকে বাঁচাবার জন্যে তক্ষুণি দু'হাত বার ক'রে সেই ঘূরন্ত চাকার দিকে বাড়ায়···অমনি একজন কুলি চিৎকার ক'রে ওঠে: 'হাত দিস্ নি···দিস নি, হারামজাদা···'

মন্মু ভয়ে থম্‌কে দাঁড়ায়!

'বেটার মাথা খারাপ নাকি! চাকায় হাত ঠেকলে আর পৈত্রিক প্রাণটি ফিরে পেতে না বাছাধন!'

হরি তাড়াতাড়ি ছুটে এসে মন্মুকে ঘর থেকে বাইরে টেনে নিয়ে যায়। যেতে-যেতে পেছন ফিরে সেই দুরন্ত চাকার দিকে মন্মু একবার চেয়ে দেখে। মনে মনে ভাবে: 'বহু-বাহু, আর বহু-শির যন্ত্র-দেবতা আজ তার মতো দরিদ্র লোকের ময়লা জামাটি কেড়ে নিয়ে একি রসিকতা করল!'

মন্মুর কানে কানে হরি বলে: 'টিফিন টাইম!'

এই দু'টি ইংরেজী কথা সে কারখানা থেকে শিখেছে।

সারা কারখানার মধ্যে কুলিদের হাত-মুখ ধোবার কোন ব্যবস্থাই নেই। পেছনের দিকে, রাশিকৃত টিনের ক্যানেস্তারা আর তেলের ড্রামের মধ্যে এক পাশে একটা পাম্প···সেখানেই শ'খানেক কুলি একসঙ্গে জড় হয়েছে, এক আঁচলা জল খাবার জন্যে!

টিফিন!

কিন্তু টিফিন খেতে পারে এমন কোন ব্যবস্থাই নেই···কোন হোটেল নয়, কোন খাবারের দোকান নয়···কোন খাবারওয়ালা নয়···শুধু কারখানার গেটের

বাইরে একজন ফেরিওয়ালা দ্'ঝুড়ি সস্তা তেলেভাজা আর গজা জাতীয় জিনিস আর মুড়ি নিয়ে বসে আছে।

কিন্তু কুলিদের স্ত্রীরা যে যার আপনার লোকের জন্যে বাড়ি থেকে খাবার নিয়ে এসেছে···ভাত আর ডাল। একটা গাছতলায় বসে গোগ্রাসে তাই তারা শেষ ক'রে ফেলে।

অপরের স্ত্রী-ভাগ্যের প্রত্যক্ষ নিদর্শন সামনে দেখে হঠাৎ হরির নিজের স্ত্রীর কথা মনে পড়ে যায়।

কই। সে তো এখনও এল না? কি হলো তার? হরি কারখানার ভেতর ছুটে যায় দেখবার জন্যে।

এমন সময় কারখানার বাঁশী বেজে উঠল, টিফিন শেষ।

দলে দলে আবার সেডের ভেতর গিয়ে যে যার জায়গায় বসে পড়ল।

মুন্নু ভেতরে তার জায়গায় গিয়ে দেখে হরি তখনও আসে নি। কিছুক্ষণ পরে দেখে হরির জায়গায় অন্য আর-একজন লোক এসে কাজ করছে। হরির কি হলো? দেখতে দেখতে বিকেল হয়ে এল কিন্তু তখনও হরির দেখা নেই।

কিছুক্ষণ পরে হাঁফাতে হাঁফাতে হরি এল, ভয়ে যেন তার মুখ শুকিয়ে গিয়েছে।

মুন্নুর দিকে চেয়ে কাঁদ-কাঁদ কণ্ঠে বলে উঠল, ছোট ছেলেটার ডান হাতটা কলে ভেঙে গিয়েছে···বেচারা জানে না তো কিছু···ভুল ক'রে একটা ঘুরন্ত বেল্টে হাত দিতে গিয়ে তার এই দুর্দশা।

শুনে মুন্নুর মনে তীব্র কষ্ট হয় কিন্তু সে-কষ্ট সে বোঝাতে পারে না। নিরর্থক ভাবে শুধু হরির মুখের দিকে চেয়ে থাকে···মুখ দিয়ে একটাও সহানুভূতির কথা বেরোয় না···ভেতর থেকে তার বুক টনটন ক'রতে থাকে।

পাশের একজন কুলি জিজ্ঞেস করে: 'ডাগতার দেখিয়েছ?'

কাঁদতে-কাঁদতে হরি বলে: 'না, ভাই। মিলে তো কোন ডাগতার নেই। তবে চিমটা সাহেব আমাকে ছুটি দিয়েছে, ছেলেটাকে শহরের হাসপাতালে নিয়ে যাবার জন্যে, কিন্তু আমার চাকরি বোধ হয় আর থাকবে না···পয়লা দিনই পুরো কাজ করলুম না···সাহেব তো খুব রেগে গিয়েছে!'

এই দ্বিধা-বিভক্ত কর্তব্যের মধ্যে কোন্‌টি তার পক্ষে শ্রেয় হবে, ঠিক করতে

না-পেয়ে হতাশ হয়ে সে বসে পড়ে, মনে হয়, এত লোকজনের মধ্যেও সে যেন একলা। কিছুক্ষণ পরেই সে আবার উঠে দাঁড়ায়। না, ছেলেটাকে নিয়ে যেতেই হবে। কয়েক পা গিয়ে আবার ফিরে আসে, যেন কি ফেলে গিয়েছে। মুন্নুর কাছে এসে বলে : 'ভাই, বাড়ি ফেরবার সময়, ছেলের মাকে তুমি সঙ্গে ক'রে নিয়ে যেও···সে-বেচারা পথঘাট তো কিছুই জানে না !'

হরি চলে যাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে মুন্নুর মনে হয়, এমনি তার বসে থাকা উচিত হয় নি। এই কারখানা থেকে শহরের দূরপথে এই রোদে ছেলেটাকে কোলে ক'রে নিয়ে যেতে বুড়ো মানুষের খুব কষ্ট হবে···সে তো খানিকটা কষ্ট লাঘব করতে পারত, ছেলেটাকে বয়ে নিয়ে গিয়ে। মুন্নু যেন দেখতে পায় পথ দিয়ে টলতে-টলতে হরি চলেছে···এ-রাস্তা—সে-রাস্তা দিয়ে, পুকুর-পাড় দিয়ে, এতক্ষণে সে সেই শহরের ধারে গিয়ে পেঁাচেছে···সেখান থেকে শহরের লোকের ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে যায়···মুন্নু আর দেখতে পায় না···হঠাৎ মনে জাগে, যদি ছেলেটা কাঁধে মারা পড়ে ? সে-ক্ষেত্রে হরির সঙ্গে একত্র বাস করা তার আর চলবে না, কারণ তারা নিশ্চয়ই ভাববে, তারই জন্যে তাদের এই দুর্ভাগ্য ঘটেছে। সে অপয়া—তবু তো আজও পর্যন্ত তারা জানে না, তার মা-বাপ কেউ নেই, সে অনাথ। জানলে হয়ত অপয়া বলে আগে থাকতেই তারা তাড়িয়ে দিত।

কে যেন মনের মধ্যে জিজ্ঞেস ক'রে ওঠে : সত্যি কি আমি অলক্ষণে, অপয়া ? জন্মানোর সঙ্গে সঙ্গে বাপকে খেয়েছি···তার পর মাকে হারিয়েছি···আমার জন্যেই প্রভুদয়াল ভিটে ছেড়ে চলে গিয়েছে···এখানে এলাম···এখানেও হরির এই দুর্ভাগ্য ! তাহলে নিশ্চয়ই আমি অলক্ষুণে ! যদি অলক্ষুণে তবে বেঁচে থাকি কেন ? আমার মৃত্যুতে অন্তত জগৎ থেকে একজন খারাপ লোক সরে যাবে···

হরি তার পাশে নেই···তার মনো হলো, কারখানার মধ্যে তার কেউ নেই। এখানে কারুর সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই। তার ওপর যন্ত্রের সেই কানে তালা-লাগা একঘেয়ে গর্জন···সে অস্থির হয়ে ওঠে। খিদেতে তার পাঁজরার ভেতর জ্বালা ক'রতে থাকে···যেন একটা ইঁদুর, মস্ত বড় ইঁদুর, তার পেটের ভেতর ঢুকে—ভেতর থেকে তাকে কুরে-কুরে খাচ্ছে। তরঙ্গের-পর-তরঙ্গের সংঘাতে যেমন ফেনা জেগে ওঠে, তেমনি ভেতর আর বাইরের আক্রমণে তার মগজের মধ্যে ভাবনাগুলো যেন সব ফেনার মতো একাকার হয়ে যায়···আর সেই

ফেনার মধ্যে তার ছোট প্রাণটুকু কোনরকমে ডুবে না-গিয়ে ভেসে চলে, কিন্তু কোথা থেকে ঝড় উঠে তাকে আর ভেসে থাকতেও দেয় না···বুঝি ডুবে যাবে এবার একেবারে।

তবুও সে প্রাণপণ চেষ্টা করে নিজেকে তুলে ধরতে। শহরে ঢোকবার সময় যে-সব বড়-বড় বাড়ি সে দেখেছে, রাস্তার দামী দামী পোশাকে যে-সব সাহেব আর ধনী রইসদের সে লক্ষ্য করেছে, দোকানে থাকে-থাকে সাজানো হরেক রকমের যে-সব আনন্দের উপকরণ তার নজরে পড়েছে, প্রত্যেকটি তার অজ্ঞানে তার অন্তরের গভীর গহনে অদৃশ্য এক বৈচিত্র্যময় জীবনের ভোগ-স্পৃহাকে জাগিয়ে দিয়েছিল···জীবনের কুৎসিত বাস্তবতার আড়ালে তার মনে মধুর স্বপ্নের ছোঁয়া দিয়ে গিয়েছিল। তার পর যখন সে কারখানায় এসে চিমটা সাহেবের মুখে তার মাইনের কথা শুনল···এত টাকা একসঙ্গে সে আর কখনো হাতে পায় নি···সেই অনাগত রজত-খণ্ডগুলির কথা ভাবতে-ভাবতে তার সে-স্বপ্ন আরো প্রগাঢ় হয়ে ওঠে···সেই অর্থ নিয়ে সে যেসব অমূল্য জিনিস কিনবে, আগে থাকতেই তাদের স্পর্শ সে রোজ মনে-মনে অনুভব করে···কালো চকচকে বুট, বুকের কাছে টিক-টিক করা ঘড়ি, ঘড়ির চেন, পোলো-টুপি, রেশমের পোশাক··· সাহেবিয়ানার যাবতীয় উপকরণ। অন্তরের অন্তরতম স্থলে অতি সযত্নে সে লালন ক'রে আসছে এই সংগোপন বাসনাকে···বাইরে প্রকাশ ক'রে তার মাধুর্য নষ্ট করতে পর্যন্ত সে শঙ্কিত হয়ে ওঠে।

পাছে এই স্বপ্নের ধন বুঝি নষ্ট হয়ে যায়, মাঝে-মাঝে তাই সে নড়ে-চড়ে দেখে। নাড়তে-চাড়তে কখন আবার মনের মধ্যে জেগে ওঠে বাঁচবার আশা, আলোর আকাঙ্ক্ষা···সেই আকাঙ্ক্ষার আলোয় মানস নয়নে সে যেন স্পষ্ট দেখতে পায়, বিচিত্র হরফে-লেখা জীবনের আনন্দ বেদ···নিজেকে উৎসাহ দেবার জন্যে নিজেই বলে ওঠে, আমি বাঁচতে চাই, আমি জানতে চাই, কাজ ক'রতে চাই···

এতক্ষণ পর্যন্ত সহকর্মী যে কুলিটিকে সে ভালো ক'রে দেখে নি···আধা-বয়সী ···পালোয়ানের মতো চেহারা···তাকে বেন ভালো লাগে···

লোকটি আপনা থেকে আলাপ শুরু করে: 'আমার নাম রতন। পাঞ্জাবে বাড়ি। তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে, পাহাড়ী, না?'

মনুসুদ খুশী হয়ে উত্তর দেয় : 'ঠিক তাই। তবে এর আগে আমি শ্যামনগর আর দৌলতপুরে কাজ ক'রে এসেছি।'

'বেশ···বেশ···তোমার নামটি ?'

'মনুসুদ।'

মনুসুদের ভালো লাগে, লোকটের আলাপ করবার ধরন, সহজ আন্তরিকতা। এতক্ষণ পরে তার মনে হয়, সে একা নয়।'

এমন সময় ছুটির বাঁশী বেজে উঠল। হাঁপাতে-হাঁপাতে, শেষ দম ছেড়ে, কর্কশ শব্দে, কাঁপতে-কাঁপতে যন্ত্রগুলো থেমে গেল। কুলিরা কাজ ছেড়ে লাফিয়ে উঠল, যেন বনের বাঘ অদূরে কোথাও কাঁচা মাংসের গন্ধ পেয়েছে।

ফেরার মুখে তাঁতশালার ভেতর দিয়ে আসবার সময় মনুসুদ দেখে কারখানার কামিনরা কারো পিঠের সঙ্গে ছেলে বাঁধা···কারো বা কালে···কেউ বা মাটিতে ছেড়ে রেখে দিয়েছে···সেইখানেই ধুলোতে পিস্টন, রড আর সিলিন্ডারের লোহার খাবার মুখে গড়াগড়ি দিচ্ছে।

মনুসুদ অবাক হয়ে ভাবে, ছেলেগুলো অক্ষত আছে কি ক'রে···কোন মেশিনই তার দিয়ে ঘেরা নয়! তাদের হাত-পা বা মাথাগুলো এখানে আস্ত আছে কি ক'রে!

লক্ষ্মী এক কোণে বসে আপনার মনে কাঁদছিল, এমন সময় মনুসুদ খুঁজে গিয়ে উপস্থিত হলো। মনুসুদের সঙ্গে সঙ্গে সে বেরিয়ে এল। মনুসুদেরও কান্না পাচ্ছিল, কিন্তু তবুও তার চোখে জল এল না। নীরবে দু'জনে পাশাপাশি চলে।

গেটে নাদির খাঁর গুমটি-ঘরের ঘড়ির দিকে চেয়ে মনুসুদ হিসেব ক'রে দেখে, এগারো ঘণ্টা আগে তারা এইখান দিয়ে কারখানায় ঢুকেছিল।

মাথার ওপর থেকে সূর্য নেমে গিয়েছে···আস্তে আস্তে সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে আসছে যেন কে একটা বিরাট ময়লা পর্দা আকাশ থেকে ঝুলিয়ে দিচ্ছে।

॥ দশ ॥

শনিবার কুলিরাও আধবেলা ছুটি পায়। লক্ষ্মীর বড় সাধ, শহরের দোকান দেখবে। মনুসুদেরও আগ্রহ কম ছিল না···যে-সব উপকরণ দিয়ে সাহেবদের জগৎ গড়ে উঠেছে, সেগুলো তার মনকে যেন দাঁড় দিয়ে টানতে থাকে।

বিকেলের দিকে দিকে দলবেঁধে তারা বেরিয়ে পড়ে। প্রথমে হাসপাতাল। ছোট ছেলের ঘা তখনও সারে নি। রোজ গিয়ে ধুইয়ে আসতে হয়। সেখানে ডাক্তার এবং নার্সের অনুগ্রহ দৃষ্টির জন্য অপেক্ষা ক'রে থাকতে-থাকতে যথেষ্ট দেরি হয়ে গেল।

হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে রাস্তায় নেমে কয়েক পা অগ্রসর হতে-না-হতে, হঠাৎ মাথার উপর মহাগর্জনে আকাশ ফেটে পড়ল···যেন একসঙ্গে একদল সিংহ গর্জন করতে করতে মত্তকরীদের ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ল। শূন্যের মহারণ্য সহসা জেগে উঠল আর্তনাদে। সঙ্গেসঙ্গে দুর্দম বেগে ক্ষিপ্ত অশ্বের দল উন্মাদ হ্রেষারবে ছুটে চলে ···তাদের পায়ের লৌহ পাদুকার সংঘর্ষণে মেঘ-প্রস্তরে ঠিকরে ওঠে বিদ্যুৎবহ্নি···আরোহীর হস্ত-নিক্ষিপ্ত সুতীক্ষ্ন বর্ষা ভেদ ক'রে পলাতক শিকারের বক্ষ···ভিন্ন বক্ষ থেকে হিম-রক্তের মতো ঝ'রে পড়ে বৃষ্টির বিন্দু··· অজস্র ধারায়···দীর্ঘ সরল রেখায়···

সুবিপুল সেই বৃষ্টিধারায় সহসা পরিপ্লুত হয়ে ওঠে ধরণী। বহুদিনের নিরুদ্ধ বাষ্প আজ বন্ধন-হারা বৃষ্টি-ধারায় স্নিগ্ধ ক'রে দেয় মাটির তৃষিত বক্ষ। নিরুদ্ধ ঘরে, অন্ধকার গর্তে, মানব ও পশু সভয়ে অপেক্ষা ক'রে থাকে।

দু'ঘণ্টা পরে, বৃষ্টি-ধারা কথঞ্চিত প্রশমিত হলে, হরি ভিজে ভিজেই অনুচরদের নিয়ে বস্তির দিকে রওনা হলো। রাস্তা আর নয়, নদী—শহরের বাইরে শুষ্ক প্রান্তর আজ সম্পূর্ণ জলমগ্ন···বস্তির ধারের পুকুর কুল ছাপিয়ে চারধারের ভাঙা কুঁড়ে ঘরগুলিকে ভেঙ্গে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছে।

জলে গায়ের চামড়ার ভেতরটা পর্যন্ত যেন ভিজে গিয়েছে···অনাবৃত দেহে কাঁপুনি লাগে। চারদিকে বৃষ্টির রিমঝিম আওয়াজ···মাঝে মাঝে হঠাৎ বজ্রের গর্জন···সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুতের ঝলসানো নীল আলো···পায়ের তলায় মাটিতে পা রাখলে পা আপনা থেকে পিছলে যায়···ভয়ে জড়সড় হয়ে তারা একটা কলাবাগানের তলায় আশ্রয় নেয়। ভেজা অন্ধকারে আস্তে আস্তে চারপাশ থেকে দলে-দলে অন্য সব কুলিরা এসে জড় হয়, তাদেরও ঘর ভেসে গিয়েছে।

আপনার মনে হরি বলে ওঠে: 'রাম! রাম!'

কলাবাগান ছাড়িয়ে তারা এগিয়ে চলে। আশ্রয় তো চাই। মুদ্দ চুপটি

ক'রে পিছু পিছু চলে। বিদ্যুতের চমকানির সঙ্গে-সঙ্গে লক্ষ্মী চমকে ওঠে। ছেলেমেয়েগুলো ভিজে বেড়াল ছানার মতো গোঙাতে থাকে।

মুন্নু হরির ছোট মেয়েটাকে কোলে ক'রে নিয়ে চলেছে। এমন সময় অন্ধকারে ভাঙা কর্কশ গলায় তার নাম ধরে কে যেন ডেকে উঠল। মুন্নু তখন মনে-মনে ভাবছিল, ছেলেবেলায় এমনি যখন তায়ের গাঁয়ে বৃষ্টি নেমে আসত, তার মা সেদিন পিঠে তৈরি ক'রতে বসত···

এমন সময় কণ্ঠস্বর আবার হেঁকে উঠল: 'ওহে মুনজু বলি মুনজু হে···'

মুন্নুর মনে হয় যেন পরিচিত কণ্ঠ। অন্ধকারে চারদিকে চেয়ে দেখে।

এমন সময় কণ্ঠস্বর খুব নিকটে ধ্বনিত হয়ে উঠল: সুমধুর আহবান ক'রে কে যেন বলে উঠল: 'এই শালা···বুঝেছি···ঘর ভেসে গিয়েছে তো···'

মুন্নু এবার চিনতে পারে। কারখানায় পালোয়ানের মতো যে লোকটির সঙ্গে তার আলাপ হয়েছিল, রতন।

হরিকে ডেকে বলে: 'হরিভাই, রতন ডাকছে···'

ততক্ষণে রতন সামনে এসে পড়েছে। হরি চেয়ে দেখে তার চোখ দুটো যেন জ্বলছে, মুখে একগাল হাসি···মদের গন্ধ মেশানো। ভয় হয় বুঝি রতন এই সুযোগে তাদের নিয়ে রঙ্গরস করে। কেননা কারখানায় তার সে-সুনাম আছে। দিলটা তার দরাজ তাই সকলের সঙ্গে সে মজা করে।

মুন্নুর কাঁধ ধরে বেপরোয়াভাবে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে রতন বলে ওঠে: 'চল্ আমাদের চাউলে···চল্ রে শালা—জানি আমি, কোথাও আর তার জায়গা নেই যাবার!'

মুন্নু সংকুচিত হয়ে বলে: 'কিন্তু আমার সঙ্গে হরিভাই আর তার পরিবার রয়েছে যে।'

রতন আজ মহা উদার!

'তাতে হয়েছে কি! সবাই চল্! যাবি নাতো কিরে ভিখিরীর বাচ্চা? সারাদিন মাথার ঘাম পায়ে ফেলে খাটো···আর রাত্তিরে মাথা গোঁজবার একটা গর্তও নেই। হাঁ যাবার জায়গা আছে···তাড়ির দোকান!'

আপনার মনে সে অট্টহাস্য ক'রে ওঠে: মুন্নুকে ইতস্তত করতে দেখে তার পৌরুষে যেন আঘাত লাগে। হুঙ্কার দিয়ে ওঠে: 'কি ভাবছিস রে ব্যাটা?

আমি রতন···হিন্দুস্থানের রুস্তম, ইচ্ছে করলে তোদের সকলকে জায়গা দিতে পারি! আমার চেয়ে বড় পালোয়ান কোন্ শালা আছে? আমার কাছে থাকবি ভয় কি!'

নিজের উক্তিতে নিজেই সমর্থন করবার জন্য যেই দু'হাত দিয়ে বুক চাপড়াতে যাবে, অমনি পিছল মাটিতে পা রাখতে না পেরে টলে পড়ে যায়। তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়িয়ে ওপরের দিকে চেয়ে অদৃশ্য প্রতিদ্বন্দ্বীকে লক্ষ্য ক'রে গালাগাল দিয়ে ওঠে: 'এই শালা বৃষ্টি···ভগবান বেটা জল ছাড়ছে··· বুঝোছস?'

হঠাৎ হেঁচকি উঠতে আরম্ভ করায় বিব্রত হয়ে পড়ে। মনে পড়ে যায়, হয়ত কথাবার্তাগুলো ঠিক স্থানকালোচিত হচ্ছে না। হাতজোড় ক'রে হরিকে ডেকে বলে: 'কিছু মনে করো না ভাই। বুড়ো রতনকে আজ ক্ষমা ক'রে দিও একটু আনন্দ করেছি কিনা? তবে ভয় করো না, আমি ঠিক আছি··· বিলকুল ঠিক আছি···নির্ভাবনায় আমার সঙ্গে চলে এসো···আমি রাজার হালে তোমাদের রেখে দেবো···আমি হিন্দুস্থানের রুস্তম, লোকের দায়ে-অদায়ে কেউ না থাকুক, আমি আছি···চলে এসো···'

রতন বড় বড় পা ফেলে এগিয়ে চলে। হরিভাই-এর দল সভয়ে তাকে অনুসরণ করে।

রতন তাদের নিয়ে যে চাউলে গিয়ে উঠল, সেটা একটা তিনতলা বাড়ি। কোনোরকমে কতকগুলো ঘর একটার-পর-একটা গেঁথে তোলা হয়েছে। তার চারদিকে ঠিক তেমনি সব বাড়ি। মাঝখানে এক গজও জায়গা ফাঁকা নেই।

একটা ঘোরানো লোহার সিঁড়ি দিয়ে তেতলার যে ঘরের সামনে গিয়ে তারা দাঁড়াল, আয়তনে সেটা পনেরো ফিট লম্বা এবং দশ ফিট চওড়া হবে।

ঘরের ভেতরে এত ধোঁয়া যে ভেতরে কি আছে না-আছে তা ভালো ক'রে দেখা যায় না। কিছুক্ষণ ভালো ক'রে দেখে মুমু বুঝল, সেই ধোঁয়ার ভেতর একজন কঙ্কালসার পুরুষ যেন নড়ছে আর মেঝেতে একটি ছোট ছেলেকে কাছে নিয়ে একটি শীর্ণ, ম্লান মেয়ে জড়সড় হয়ে বসে আছে।

মুমু দেখল, ঘরের ভেতর যারা ছিল, তারা সুগম্ভীর নীরবতায় তাদের আবির্ভাবকে গ্রহণ করল। এই ধরনের নীরব আপ্যায়নে প্রথম প্রথম মুমু

ভীত হয়ে উঠল কিন্তু কুলিদের সঙ্গে মিশতে মিশতে ক্রমশ সে লক্ষ্য করেছিল, ওটা ওদের স্বভাবে পরিণত হয়ে গিয়েছে। পরস্পরকে জানবার কোন আগ্রহ বা কৌতূহল তাদের নেই। এক গঞ্জের মধ্যে ঘোরাফেরা করলেও তারা কেউ কাউকে জানতে চায় না।

রতন গৃহস্বামীকে ডেকে বলে: 'তুই আধখানা ঘর ভাড়া দিবি বলেছিলি না শিবু? আমি একটা দলকে নিয়ে এসেছি…সাহেব পাড়ার গলিতে এদের ঘর ভেসে গিয়েছে।'

হুঁকোতে টান দিতে দিতে শিবু বলে: 'আচ্ছা।'

দরজার কাছ থেকে ঘাড় নিচু ক'রে হরিভাই তার দলবল নিয়ে ঘরে ঢোকে।

'তোমার ঐ কুঁড়ে ঘরের চেয়ে এ ঘর ঢের ভালো।' রতন বলে।

হরি উত্তর দেবার আগেই মুন্নু বলে ওঠে: 'নিশ্চয়ই! গোড়ায় যদি এখানে এসে উঠতাম, তা' হলে জিনিস-পত্তরগুলো আর নষ্ট হ'তো না!'

হরিভাই এবার কথা বলে: 'কিন্তু আমি ভাবছি…চিমটা সাহেবের কথা। তার ঘর ছেড়ে দিয়েছি বলে নিশ্চয়ই রাগ ক'রবে…গোটা মাসের ভাড়া তো নিশ্চয়ই আদায় ক'রে নেবে!' রতন তখন একটু ধাতস্থ হয়েছে। জিজ্ঞেস করে: 'সেখানে কত ভাড়া দিতে?'

'তিন টাকা!'

'এখানে আর মাত্র দু ট্যাকা বেশী দিতে হবে।' রতন জানায়।

হরি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে জবাব দেয়: 'চিমটা সাহেব তো দশ টাকা এমনি পাবেই…ধার দিয়েছে…এখন দেখছি, ঘটি-বাটি কেনবার জন্যে আরও কিছু ধার করতে হবে…দেখি, কাল সকালে গিয়ে যদি কিছু উদ্ধার করতে পারি বিধি বাদ সাধলে মানুষ আর কি ক'রবে?'

'ও সব কথা ছাড়ান্ দাও ভাই!' শিবু আশ্বাস দেয়। তার ঘরের ভাড়া পাঁচ টাকা কমে গেল, এই সুখে সে উদার হয়ে ওঠে: 'ও সব কথা এখন থাক। কিছু তো খেতে হবে। আমার বউ কিছু চাপাটি তৈরি করেছিল…এখন তাই ভাগ ক'রে খাওয়া যাক্। তার পর ও ভাত চড়িয়ে দিয়েছে…খেয়ে-দেয়ে শুয়ে পড়ো! সকাল বেলা বৃষ্টি থামলে, আমরা সবাই মিলে যাবো'খন, দেখি তোমার জিনিস-পত্তর কিছু উদ্ধার হয় কি না!'

হরি কুণ্ঠিত হয়ে বলে : 'বড় মেহেরবাণী···তোমার ভাই এত বড় সংসার··· আবার আমাদের জন্যে রান্নাবান্না !'

শিবু বাধা দিয়ে বলে : 'থাক, থাক, ওসব কথা···না হয় আমরা গরীব, এখন বোম্বে শহরে আছি···তবু আমরা সবাই পাহাড়ী গেঁয়ো লোক···সে-কথা ভুললে চলবে কেন ? এই নাও চটটা···এটা পেতে নাও ।'

হরি হাতজোড় ক'রে বলে : 'দেখ তো, অকারণে তোমাদের কত কষ্ট দিলাম !'

শিবু উত্তেজিতকণ্ঠে ব'লে ওঠে : 'সে কি কথা ! বাপের বেটা যে হবে, সে মানুষকে দেখবে ! চল্লিশ বছর ধরে এই সংসারের উঠতি-পড়তির মধ্যে ভাই শুধু এই একটা কথা শিখেছি, যদি এমন একটা কোনও কাজ ক'রে যেতে পারো, যা দিয়ে মানুষ তোমাকে ভালোবেসে মনে রাখবে, তাহলেই এই মানব-জনম সার্থক !'

রাত্রিবেলা মনের মধ্যে যে শান্তি নিয়ে মুন্নু ঘুমিয়ে পড়েছিল, সকালবেলা ঘুম ভাঙতেই দেখে সে-শান্তি কিসের এক তীব্র বদ-গন্ধে যেন উড়ে যাচ্ছে । এত কাছে কোথা থেকে আসছে এ-রকম তীব্র বদ-গন্ধ ?

রতনও ঘুম ভেঙে উঠে একটা হুঁকো নিয়ে বসে ছিল । মুন্নু তাকে গিয়ে জিজ্ঞেস করাতে, অন্যমনস্কভাবে সে উত্তর দিল : 'কি জানি, বোধ হয়, ঐ গলির কাছে কোথা থেকে আসছে ।'

নাকে কাপড় গুঁজে জানালার কাছে গিয়ে গলির দিকে উঁকি মেরে দেখে··· বাড়ির নিচেই একটা খোলা ড্রেন···ময়লা ভরে গিয়ে উপচে উঠছে ।

মুন্নু চিৎকার ক'রে ওঠে : 'রতন ভাই এতো গলি নয়···এ যে পচা খাল···'

অবিচলিতভাবে রতন জানায় : 'তা' হবে ! এই বাড়িতে প্রায় দুশো লোক আছে···তাদের জন্যে নিচে ঐ গলিতে মাত্র সাতটা পায়খানা আছে··· মেথর বলতে একজন আছে, সে দয়া ক'রে যখন পরিষ্কার করে, তখনই কিছু-ক্ষণের জন্যে পরিষ্কার থাকে । তোমার যখন পায়খানা যাবার দরকার হবে, মেথরকে ডেকে এক আনা পয়সা দিয়ে বলো, আলাদা যে পায়খানা আছে, সেটা যেন তোমাকে ব্যবহার করতে দেয়···বুঝলে ? আমি এখনই যাচ্ছি··· এসো···তোমাকে দেখিয়ে দিই !'

নীরবে বারান্দা দিয়ে, স্তূপীকৃত জঞ্জাল, ছেঁড়া ন্যাক্‌ড়া, ভাঙা কলসী, ভাঙা খেলনা পেরিয়ে, মুন্নু নিচের দিকে চলে। নিচে হাঁটু পর্যন্ত কাপড় তুলে মেথর বসেছিল। দুর্গন্ধে মুন্নুর গা ঝিম্‌ঝিম্‌ ক'রে উঠতে থাকে।

রতন তার কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করে: 'পায়খানা ঠিক আছে তো?'

মাথা নত ক'রে অভিবাদন জানিয়ে মেথর বলে: 'হাঁ, পালোয়ানজী?'

মুন্নুর দিকে চেয়ে রতন বলে ওঠে: 'তুমিই আগে যাও···'

তার পর মেথরকে ডেকে জানিয়ে দেয়: 'এই ছেলেটি আমাদের দেশ-অঞ্চল থেকে এসেছে · এর জন্যে রোজ পায়খানা সাফ ক'রে দিবি!'

'জো হুকুম!' বলে মেথর মুন্নুকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলে।

কিছুক্ষণ পরে মুন্নু ফিরে এল, রতন তাকে কল-তলায় নিয়ে যায়।

'সারা বাড়িতে এই একটা কল-তলা···সেই জন্যে হয়ত মাঝে-মাঝে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে একটু···'

কল-তলায় হাত-মুখ ধুয়ে যখন সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠছে, সেই সময় দেখে হরিভাই নেমে আসছে।

'যাই দেখি, জিনিস-পত্তর কিছু উদ্ধার ক'রতে পারি কি না!'

মুন্নু বলে: 'বেশ···চল···আমিও যাব···পুকুরে স্নানটা সেরে আসব!'

॥ এগার ॥

পরের দিন সেডে ঢোকবার মুখে জিমি টমাস সাহেব, দু'হাত দিয়ে মোম দিয়ে সূচের মতোন-সরু-করা গোঁফের দুই প্রান্ত পাকাতে পাকাতে, দু'পা ফাঁক ক'রে, বিরাট প্রস্তরমূর্তির মতো স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। কষাই-এর দোকানে সদ্যকাটা কাঁচা মাংসের মতো মুখের রং—হুইস্কীর প্রাসাদে তাতে চাপ-চাপ রক্ত জমা হয়ে আছে···তার মধ্যে নীল শিরাগুলো এঁকেবেঁকে চলে গিয়েছে···ভুরু পর্যন্ত।

দূর থেকে সাহেবকে দেখে, সেইখান থেকেই সাহেবকে সেলাম জানাবার জন্যে সে নিজেকে তৈরি ক'রে নিতে চেষ্টা করে···সাহেব বন্ধুকে সালাম জানাতে গেলেই মুন্নুর রীতিমতো তোড়জোড় করতে হয়···কেন যে তা' হয়, সে তা' বুঝতে পারে না। কিছুদূর অগ্রসর হতে-না-হতে তার কারণটা যেন সে বুঝতে

পারে। দরজার মুখে যেই কুলিরা ঢুকছে, অধিকাংশই পাশ কাটিয়ে পালিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়বার চেষ্টা করছে, কিন্তু অনেকেই সাহেবের স-বুট লাথির আঘাতে ছিটকে পড়ছে···আঘাত সামলে সাহেবের ক্রোধ-রক্তিম মুখের দিকে চেয়ে হামাগুড়ি দিয়ে তারা আবার ঢুকছে।

মুন্নুর বুক ধড়াস ক'রে উঠল···সে দেখে, হরিভাই সাহেবের লাথিতে পড়ে গিয়েছে···কোনরকমে কাঁপতে-কাঁপতে উঠে দাঁড়িয়ে হাত জোড় ক'রে হরিভাই সাহেবের করুণা ভিক্ষা করছে।

'শুয়োরকা বাচ্চা! হারামজাদা। ঘর ছেড়ে দিবি তো আগে আমাকে জানালি না কেন!'

মুন্নু শুধু শুনতে পায়, আহত অসহায় শিশুদের মতো, কুলিরা একসঙ্গে সবাই কেঁদে উঠে বলছে: 'দোহাই হুজুর, দোহাই হুজুর!'

কাঁদতে-কাঁদতে হরি বলে: 'হুজুর, ঘরের ছাদ একেবারে ভেঙে গিয়েছিল— তার উপর বৃষ্টিতে—'

পা তুলে আঘাত করবার ভঙ্গীতে গর্জন ক'রে ওঠে: 'মিথ্যে কথা! আমি কাল নিজে গিয়ে দেখে এসেছি, কোথাও জল নেই!'

হরির কণ্ঠস্বরে আর কান্না নেই। সে সোজা প্রতিবাদ ক'রে জানায়: 'কাল জল হয়েছিল, আমার সমস্ত জিনিস-পত্তর তাতে ভেসে যায়···বহুকষ্টে পরে তার মধ্যে থেকে কিছু কিছু উদ্ধার ক'রে আনি!'

সাহেবের সামনে দাঁড়িয়ে সাহেবের কথার ওপর কথা বলতে শুনে মুন্নু হরিভাই-এর ওপর শ্রদ্ধান্বিত হয়ে ওঠে · আপনার মন বলে ওঠে: 'সাবাস, হরিভাই, সাবাস!'

তখন হরির পশ্চাতে সজোরে একটা লাথি মেরে সাহেব রেগে তেড়ে উঠেছেন: 'তবে রে হারামজাদা, আমি মিথ্যে বলছি!'

মুন্নু উত্তেজনায় নিজেকে ধরে রাখতে পারে না। সেইখানে দাঁড়িয়েই বলে উঠে: 'সাহেব, হরিভাই সত্যিকথাই বলছে, আমি দেখেছি, জলে ওর ঘর ভেসে গিয়েছিল। আমি ওর সঙ্গে ছিলাম।'

মুন্নুকে তেড়ে মারতে গিয়ে সাহেব বলে ওঠে: 'চুপ রও কুত্তাকা বাচ্চা!'

অন্য সব কুলি-রমণীদের সঙ্গে লক্ষ্মী ছেলেমেয়েদের নিয়ে চুপটি ক'রে দাঁড়িয়ে ছিল। মুন্নুকে তেড়ে আসতে দেখে সে কেঁদে উঠল।

মুন্নু দু'পায়ে সোজা দাঁড়িয়ে বলে : 'মিথ্যে নয় সাহেব, আমি সত্যি কথা বলছি!'

সাহেব যেই মুন্নুকে আঘাত করবার জন্যে হাত তুলেছে, অমনি রতন গম্ভীর-ভাবে সাহেবের সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়ে।

'ছেড়ে দাও, সাহেব! মেরো না!'

রতনের বিরাট দেহে চাঞ্চল্যের কোন লক্ষণ নেই···তাকে চঞ্চল ক'রে তুলতে হলে বুঝি অনেক কাঠ-খড় লাগে। তবে সেই বিরাট শক্তিপুঞ্জের মধ্যে কোন অনিশ্চয়তাও নেই।

সংযত গাম্ভীর্যে সে জানায় : 'শনিবার রাত্তিরে আমি যখন ওদের দেখতে পাই, জলে ওরা তখন ন্যাতা হয়ে গিয়েছে···সমস্ত মাঠ ভেসে গিয়েছিল···আর ওদের ঘরের ছাদ যে ভাঙা ছিল, আমি আগেই দেখেছি···বুঝেছ? আমাকে মিথ্যেবাদী বলতে যেও না, তাহলে জীবনের মতো শিক্ষা দিয়ে দেবো!'

শেষ কথাগুলো বলবার সময় সে রীতিমতো জোর গলা ক'রেই বলল···চোখ দুটো জ্বলে উঠল···সাহেব শুনতে পেল, তার দাঁতের ওপর দাঁতের চাপে রীতি-মতো আওয়াজ হচ্ছে।

একবার আপাদমস্তক রতনের বিরাট দেহটিকে দেখে নিয়ে চিমটা সাহেব দু'পা পিছিয়ে বলে উঠল : 'যা, যা, নিজের কাজে যা! এখানে দাঁড়িয়ে বদমায়েশী করবি তো লাথি মেরে ঠিক ক'রে দেবো! আমার ঘর আমি ওদের ভাড়া দিয়েছি ···তোর কি? তুই বেটা এর মধ্যে কেন কথা বলছিস্?'

রতন গর্জন ক'রে উঠল : 'বেশ করবো···বলব! ওরা আমার লোক! ভালো চাও তো সাহেব তোমার বাংলোও ফিরে যাও, নইলে মাথা গুঁড়িয়ে দেব!'

কুলির দল চিৎকার ক'রে ওঠে : 'রতন···রতন···দোহাই সাহেব!'

'বলি তোর মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি? জানিস আমি তোর উপর-ওয়ালা? ওপরওয়ালা সাহেবকে অপমান করা?' চিমটা সাহেব গর্জে ওঠে।

'সাহেবই হও আর যেই হও···তুমি ফোরম্যান আছো তা' হয়েছে কি? তা' বলে তুমি কারখানার কুলিদের লাথি মারবে?'

নিষ্ফল আক্রোশে চিমটা সাহেব প্রত্যাবর্তন করাই যুক্তিসঙ্গত বিবেচনা করে। কিন্তু ফেরবার মুখে হরিকে শাসিয়ে যায়ঃ 'আমি কিন্তু ছাড়ব না, পুরো মাসের ভাড়া দিতে হবে···দাঁড়িয়ে দেখছিস্ কি? যা, যে যার কাজে যা!'

সাহেব আর পিছন ফিরে তাকায় না।

রতন সাহেবকে শুনিয়ে বলেঃ 'তা' না হয় তুমি যেমন ক'রে পার আদায় ক'রে নিও। কিন্তু ওদের কারুর গায়ে হাত দিয়েছ কি তোমার একদিন না-হয় আমারই একদিন।'

এই সময় পাঠান দারোয়ান নাদির খান এসে রতনকে টেনে সেডের ভেতর নিয়ে যায়। 'আচ্ছা, আচ্ছা, খুব হয়েছে পালোয়ানজী!'

কুলিরা ভয়ে জড়সড় হয়ে সেডের ভেতর ঢুকে পড়ে।

মুম্নু নিজের জায়গায় যাবার সময় দূর থেকে হাতের ইঙ্গিতে রতনকে অভিবাদন জানায়।

সেডের ভেতর রতনের পাশে একজন কুলি রতনের কানে কানে বলেঃ খুব সাবধানে থাকবি···সাহেব তোকে ভুলছে না···ঠিক একসময় প্রতিশোধ নেবে!'

অবজ্ঞার হাসি হেসে রতন ব'লে ওঠেঃ 'ওর মতোন অনেককে দেখেছি আমি···রেখে দে, রেখে দে! বহুত মেহনত ক'রে পালোয়ান হ'তে হয়েছে··· অমনি নাকি?'

কাজ-কর্ম শুরু হয়ে গেলে মুম্নু রতনের কাছে এসে বলেঃ 'রতনভাই, কি ভয়ঙ্কর ব্যাপার আর একটু হ'লে কি হয়ে যেত বলতো!'

'আরে ভয় পাচ্ছিস্ নাকি? ওর মতোন ঢের ঢের লোক আমি দেখেছি! তখন আমি জামসেদপুরে টাটার কারখানায় কাজ করি···সেখানে সকসঙ্গে পঞ্চাশ হাজার লোক কাজ করে···একবার আমাদের মাইনে কেটেছিল ব'লে আমরা ধর্মঘট করি···কোম্পানী কিছুতেই নুইবে না···শেষকালে···এই শর্মার জন্যেই কোম্পানীকে নুইতে হলো···'

বলেই নিজেকে বাহবা দেবার জন্যে নিজের বুক নিজেই চাপড়ায়।

একটা ছেঁড়া সুতোয় গেরো দিতে দিতে মুম্নু জিজ্ঞেস করেঃ 'তা'হলে টাটার কারখানা ছেড়ে এলে কেন?'

সে আর একবার ধর্মঘট হ'লো···বেশী ঘণ্টা কাজ করিয়ে নেয়···কুলিদের সঙ্গে মন্দ ব্যবহার করে···থাকবার জায়গা জোটে না···এই সবের দরুন। ধর্মঘটের যারা নেতা ছিল, কোম্পানী তাদের ভয় দেখিয়ে, কাউকে বা উঁচু চাকরি দিয়ে হাত ক'রে নিল। বিশ্বাসঘাতকদের মধ্যে একজনকে আমি ধরলাম এবং বেশ উত্তম মধ্যম দু'ঘা দিয়ে দিলাম। তার পর বুঝলে কি না, চাকরি ছেড়ে পালিয়ে এলাম···ধর্মঘট তবুও চলতো কিন্তু সেবার ধর্মঘট যারা করেছিল, তারা মস্ত একটা ভুল করে বসলো। একটা ধর্মঘট ভালোভাবে উৎরে যাওয়ায় অত কাছাকাছি আবার ধর্মঘট করতে নেই। তা'ছাড়া, সেখানকার কাজটাও আমার মনের মতো ছিল না···বড় বেশী খাটতে হতো।'

মুন্নু অবাক হয়ে শোনে। বলে: 'লোহার কারখানায় আমার কিন্তু কাজ করতে বড্ড ইচ্ছে যায়। সেখানে তোমরা বড় বড় লাইন তৈরি করতে? রেলের লাইনের মতো? বড় বড় উনুন, না? তার ধারে বসে থাকতে কি মজা? এখানে, শুধু বসে বসে সুতো টানো আর গেরো দাও!'

মুন্নুর কথায় রতনের পূর্ব-স্মৃতি জেগে ওঠে। বলে: 'তখন আমার আঠারো বছর বয়স···সেই কারখানায় যখন গিয়ে ঢুকি। অবশ্য তার আগে আগুন নিয়ে কাজ করেছিলাম, দৌলতপুরে···আমাদের জাত-ব্যবসাই হলো তামার কাজ। কিন্তু জামসেদপুরে গিয়ে বুঝলুম সে-সব আগুন হলো ঠাণ্ডা বাতাস। জামসেদপুরের কারখানায় আগুনের আঁচ, সে যে কি ভয়ংকর তা' তোকে কথা দিয়ে কি বোঝাব···সদাই জ্বলছে···এক মুহূর্ত রেহাই নেই। চোখের সামনে যেন আগুনের ঢেউ ঘুরছে, ফিরছে, নামছে—চোখ ঝলসে যায় দিনেও যেমন রাত্রিতেও তেমন···গ্রীষ্মকালেও যেমন শীতকালেও তেমন··· যখন বৃষ্টি আসত, গরম ছাউনিতে পড়বার সঙ্গে সঙ্গে সে-সব উবে যেত···আর হিস্ হিস্ শব্দে ধোঁয়া উঠতে থাকত।'

মুন্নু মনে মনে ভাবে যদি কোনরকমে সেখানে একবার ঢোকা যায়! জিজ্ঞেস করে: 'সেখানে কাজ পেয়েছিলে কি ক'রে?'

'কাজের দরকার, তাই কাজ পেয়েছিলাম। দরজায় গিয়ে দারোয়ানকে ধরতে, দারোয়ান বললে, ফোরম্যানের সঙ্গে দেখা করতে। আমার তো বিশ্বাসই হয় না! তখন কোথায় যেন মস্ত বড় যুদ্ধ বেধেছিল, তাই কারখানায় বড় বড়

রেল তৈরি হচ্ছিল। বিস্তর কাজ অথচ তেমন লোক পাওয়া যাচ্ছিল না। তার কারণ, যত সব কুলি ছিল তাড়াতাড়ি মরবার জন্যে পাগলের মতো ছুটছিল সৈন্য হতে। যুদ্ধে মরার মধ্যে একটা 'গৌরব আছে তো ?'

'কারখানার কাজ কি খুব শক্ত ?'

'কি বললি ? শক্ত! ভোর ছ'টা থেকে সন্ধ্যা ছ'টা···হপ্তায় সাতদিন। বিরাট খোলা উনুনে···রাতদিন জ্বলছে···তার ওপর বড় বড় চৌবাচ্ছার মতো কড়ায় জলের মতো পাতলা গরম গলানো ইস্পাত টগবগ ক'রে ফুটছে। আমার মাথার ওপর চেনম্যান কপি-কলে সেই জলন্ত কড়া তুলে, বাঁ হাতে মুখ ঢেকে চিৎকার ক'রে উঠত···সাবধান···গরম লোহা! গরম বটে! মেঘের ফাঁকে সূর্য ডোবার সময় আকাশ যে-রকম লাল হয়, ঠিক সেই রকম লাল···আধ ঘণ্টার পর একটু-একটু ক'রে রঙ বদলে কালো হতো। যখন কাল হয়ে যেত, তখন যদি ভুল করে বা আচমকা তাতে হাত পড়ত, যেখানটায় ঠেকত, সেখানটা জ্বলে যেত। অনেক দিন আবার ডবল কাজ করতে হতো···চব্বিশ ঘণ্টা। একদিন আমার বদলি যে লোকটা ছিল, সে এল না, আমাকেই এক নাগাড়ে ছত্রিশ ঘণ্টা কাজ করতে হলো।'

অবাক হয়ে মুন্নু বলে ওঠে: 'বল কি। ছত্রিশ ঘণ্টা। ঘুম পেত না।'

'অবশ্য ছত্রিশ ঘণ্টাই সমান কাজ করতে হয় নি। ছত্রিশ ঘণ্টার মধ্যে সব-সুদ্ধ বত্রিশ ঘণ্টা কাজ করেছি···বাকি চার ঘণ্টা রাত্রির বেলা কোম্পানীকে ফাঁকি দিয়ে ঘুমিয়ে নিয়েছি। তবু তাও একসঙ্গে চার ঘণ্টা নয়···দশ পনেরো মিনিট ক'রে যখনই সুযোগ পেয়েছি···একটা কাঠ পড়ে থাকত তার ওপর ইঁট মাথায় দিয়ে শুয়ে পড়তাম। পাশেই টাইম-কিপারের ঘাঁটি ছিল। ব্যাটা আফিং-খোর···ঝিমুতো···তা ছাড়া তার বিশ্বাস ছিল যে আগুন-ঘরে কেউ ঘুমুতে পারে না।'

শুনতে-শুনতে বিস্ময়ে মুন্নুর দুটো চোখ ভাঁটার মতো বড় হয়ে ওঠে।

মুন্নুর মুখের দিকে চেয়ে রতন বুঝতে পারে, ছোকরার ভালো লেগেছে। তাই সে বলে চলে: 'তা' বলে তুমি জামসেদপুর যাবার কথা মনে ঠাঁই দিয়ো না। এখানে যেমন সুতোর কাঠি ঘোরাচ্ছ তেমনি ঘোরাও। সেখানে একটু যদি অসাবধান হয়েছ, অমনি একটা কিছু বিপদ ঘটে গিয়েছে, মাথার ওপর দিয়ে

কাঁপকলে অনবরত চলছে ইয়া ভারী-ভারী ইস্পাত···এক-একটার ওজন যে কত টন তা' কে জানে···যদি একবার একটা কোনরকমে পড়ে যায়···ব্যাস···'

এমন সময় দরজার ফাঁকে দেখা যায় চিমটা সাহেবের মুখ···চিৎকার ক'রে সকলকে শাসিয়ে যায় : 'আড্ডা না মেরে যে-সার কাজ জলদি সারো।'

রতনের কানে-কানে মুন্নু চাপা গলায় বলে : 'ব্যাটা, আমাদের বাগে পেলে কিছুতেই ছাড়বে না।'

ছাড়েও নি। তবে তার পরের দিন নয়, তার পরের সপ্তাহেও নয়, পরের মাসেও নয়···এক মাস পনেরো দিন পরে···যেদিন মাসের পাওনা মাইনে কুলিদের দেওয়া হচ্ছিল।

শনিবার বিকেল বেলা। বর্ষা-অন্তে নিষ্করুণ সূর্য তখন কারখানার খোলা মাঠে সমবেত নগ্নদেহ কুলিদের কালো চামড়ায় বার্নিশ দিচ্ছিল আর বারাণ্ডার তলায় উপবিষ্ট চিমটা সাহেবের লাল মুখকে আরও লালচে ক'রে তুলছিল। তেলকালি মাখা ময়লা প্যাণ্টে আর শার্টে চিমটা সাহেব বারাণ্ডার এক ধারে বসে···পাশে দেহরক্ষী রূপে দাঁড়িয়ে পাঠান নাদির খাঁ।

কতকগুলো অসভ্য মাছি সাহেবের পোশাকে তেল কালির গন্ধে আর গোঁফের মোমের আকর্ষণে তখন অনবরত সাহেবকে বিরক্ত ক'রে তুলছিল দু'হাত দিয়ে তাদের তাড়াতে-তাড়াতে সাহেব হেঁকে উঠল : 'হ্যারি !'

হরি তখন একমনে দেখছিল, রতন আর মুন্নু মাটিতে ঘর কেটে বাঘবন্দী খেলছে। তার নাম যে সাহেবের মুখে হ্যারিতে রূপান্তরিত হয়েছে, সে তা' ঠিক ক'রে উঠতে পারেনি। তাই সে চুপ ক'রে খেলা দেখতেই লাগল।

অধীর হয়ে অসহিষ্ণুতায় সাহেব আবার হেঁকে উঠল : 'হ্যারি !'

কোন উত্তর নেই। অন্য কুলিরা এদিক-ওদিক চাইছে। পাছে দেরি হ'লে সাহেব আবার রেগে যায়। রেগে গেলে কার ওপর যে সে-রাগের ঝাঁঝ পড়বে, তার তো ঠিক নেই !

আসন থেকে উঠে দাঁড়িয়ে সাহেব গর্জে উঠল : 'হ্যারি !'

মুন্নুর কানে আওয়াজ যেতেই সে চমকে উঠে হরিকে ঠেলে বলে উঠল : 'হরি ভাই। আরে যাও, সাহেব তোমাকে কে ডাকছে !'

তৎক্ষণাৎ হরি লাফিয়ে উঠল।

হরিকে আসতে দেখে সাহেব চিৎকার ক'রে উঠল : 'জলদি! জলদি! আমি কি ব্যাটা তোর বাপের চাকর যে, হুজুরের হাতে মাইনে তুলে দেবো বলে এখানে সারাদিন দাঁড়িয়ে থাকবো? দেখি বুড়ো আঙুল।'

'মাই বাপ!' বলে কপালে হাত ঠেকিয়ে কাঁপতে-কাঁপতে হাতের বুড়ো আঙুলে কালির প্যাড থেকে কালি মাখিয়ে নেয়। তারপর কাঁপতে কাঁপতে হাতটা বাড়িয়ে দেয়।

চিমটা সাহেব কোনরকমে তাচ্ছিল্যভরে হাতটা নিজের হাতে তুলে ধরে যেন কুষ্ঠরোগীর অঙ্গ স্পর্শ করতে হচ্ছে। আঙুল ধরে খাতায় টিপসই দিয়ে নিয়ে ছেড়ে দেয়। তার পর গুনে দু'খানা পাঁচ টাকার নোট আর একটা দশ টাকার নোট তার হাতে তুলে দেয়।

'দাঁড়া···দশ টাকা ধার শোধ···এক টাকা সুদ···এক মাসের ঘর ভাড়া তিন টাকা···ঘর মেরামতের দরুন এক টাকা···কারখানার কাপড় নষ্ট করার দরুন পাঁচ টাকা ক'রে কাটান···বুঝলি? বাকি এই কুড়ি টাকা···তোর হাতে দিচ্ছি···তোর, মুন্নুর, তোর বউএর আর বাচ্চা দুটোর মাইনে···'

নগদ···সুদ···কাটান···ভাড়া···দীর্ঘ অভিজ্ঞতা থেকে হরির এ-সব শব্দ-গুলোর অর্থ জানা। মনে মনে কষ্টও হলো, বাইরে কোন কথা উচ্চারণ করবার মতো সাহস তার ছিল না। নিঃশব্দে সেই কুড়ি টাকা নিয়ে, সাহেবকে সালাম জানিয়ে, পিছু হটতে-হটতে চলে আসে।

মুন্নুর কাছে এসে দাঁড়াতে তার দু'চোখ দিয়ে টসটস ক'রে জল ঝরে পড়ে।

অব্যক্ত যন্ত্রণায় শীর্ণ মুখ যেন দড়ির মতো পাক খেয়ে খেয়ে ওঠে।

মুন্নু জিজ্ঞেস করে : 'কি হলো হরিভাই?'

রুদ্ধকণ্ঠে হরি বলে : 'কিছু না। কিছু না!' কাপড় নষ্ট করার দরুন পাঁচ টাকা ক'রে কেটে নিয়েছে···তার ওপর ধারের টাকা···সুদ···বাড়ি-ভাড়া ···সবসুদ্ধ মিলিয়ে আমাদের প'য়তাল্লিশ টাকা থেকে এই মাত্র কুড়ি টাকা পেলুম! এই নাও তোমার দশ টাকা!'

মুন্নু বাধা দিয়ে বলে : 'না···ও টাকা তো আমি নিতে পারি না। আমার খাওয়া থাকা বাবদ ও তোমার প্রাপ্য।'

হরি তবুও বলে : 'তা' হয় না। আমার জন্যে তুমি কেন কষ্ট পাবে? তোমার মাইনে তুমি নাও!'

আপোষ নিষ্পত্তি স্বরূপ রতন বলে : 'বেশ, হাত-খরচের জন্যে পাঁচ টাকা ওকে দে!'

এই সময় ডাক আসে : 'রটন।'

রতন অঙ্গ দুলিয়ে চিমটা সাহেবের সামনে মাইনের টেবিলে গিয়ে হাজির হলো। চিমটা সাহেব বলবার আগেই সে বলে উঠল : 'কাপড় নষ্ট করার দরুন কাটান-ছাটান আমার নেই···সুদ নেই···আমি অমন ধারও করি না।'

চিমটা সাহেব টাকা গুনে বলে ওঠে : 'উনিশ টাকা···দেরি ক'রে আসার দরুন এক টাকা ফাইন।'

দেহের সমস্ত শক্তি একত্র ক'রে নিয়ে, পালোয়ান চিৎকার ক'রে ওঠে : 'কুড়ি টাকা···তার এক আধলা কম নয়!'

চিমটা সাহেব মুখ তুলে রতনের চোখের দিকে চেয়ে দেখে। সেখানে তখন আগুন জবলে উঠেছে। আপনা থেকে সাহেবের হাত গোঁপে উঠে যায়···লাল মুখ আরও লাল হয়ে ওঠে।

নিজের মর্যাদা বজায় রাখার জন্যে বলে ওঠে : 'আচ্ছা! এবার মাপ করলুম···দেখি আঙুল!'

রতন গম্ভীরভাবে বলে ওঠে : 'আমি লিখতে জানি!'

কলমটা এগিয়ে দিয়ে, সাহেব দু'খানা দশ টাকার নোট এগিয়ে রেখে দেয়। লোকটা বিদেয় হলে যেন বাঁচে।

রতন ধীরে-সুস্থে হিন্দুস্থানীতে গোটা গোটা ক'রে তার নাম সই করে···তার পর টাকাটা ভালো ক'রে দেখে নেয়।

'মেহেরবাণী সাহেব!' বলে সোজা সাহেবের সামনে পেছন-ফিরে ঘুরে দাঁড়িয়ে চলে আসে। এভাবে পৃষ্ঠ-প্রদর্শন ক'রে সাহেবের সামনে দিয়ে চলে আসা কুলিদের রীতি-বিরুদ্ধ।

রতন ফিরে দেখে মুন্নু আর হরি নেই। ভাবল, নিশ্চয়ই বাড়ি চলে গিয়েছে। সেও বেরিয়ে পড়ে।

কারখানায় বাইরে মাঠের সামনে দেখে, একটা লম্বা পাঠান হরিকে

ঘাড় ধরে টানছে। আর-একটা বে'টে লোক রাইফেলের বাঁট তুলে তাকে শাসাচ্ছে। কাছে-ভিতে মনুষ্য নেই।

হরিকে ঘাড় ধরে চেপে পাঠানটা বলছে: 'ব্যাটা চোখে ধুলো দিয়ে পালাবি ভেবেছিলি? ভেবেছিলি পায়ে-পায়ে লুকিয়ে থাকলে আর দেখতে পাবো না? দে ব্যাটা, নাদির খাঁর টাকা শোধ ক'রে দে···সে এখানে নাইবা রইল···আমরা তো আছি!'

হরি কাপড়ের খুঁট থেকে খুলে একটা পাঁচ টাকার নোট পাঠানটার হাতে দিতেই পাঠানটা এক লাথি মেরে তাকে মাটিতে ফেলে দিল। কাপড় ছিঁড়ে, দাঁতে দাঁত লেগে হরি মাটিতে পড়ে গেল।

'পাঁচ টাকা! পাঁচ টাকা তো শুধু সুদ! আসল টাকা কই! ব্যাটা খোল কাপড়···কাপড়ের ভেতর নিশ্চয়ই ব্যাটা লুকিয়ে রেখেছিস···'

হাত জোড় ক'রে তার ভেতর অন্য নোটখানা লুকিয়ে রেখে হরি বলে: 'দোহাই খাঁ সাহেব। এমাসে সব কেটে নিয়েছে···সামনের মাসে নিশ্চয়ই দিয়ে দেবো···এ মাসে আর দিতে পারবো না···'

হাত ধরে টানতেই হাতের নোটটা পড়ে গেল। পাঠানটার বে'টে সাথীটা সেটা তুলে নিয়ে যেই লাথি মারবার জন্যে পা তুলেছে অমনি রতন পেছন দিক্ থেকে এসে তার গলার জামা টেনে ধরল।

'ছেড়ে দে ওকে···বদমায়েশের দল!'

পাঠানটা বিরক্ত হয়ে বলে: 'এর সঙ্গে তোমার কি আছে পালোয়ান?'

'সব কিছু আছে, হারামীর বাচ্চা! তোমাদের টাকা তো দিয়ে দিয়েছে··· আবার কি? একটা বুড়ো মানুষের ওপর জোর ফলাতে লজ্জা করে না ব্যাটা? আয় না, কত তাগত আছে···আয় আমার সঙ্গে!'

পাঠানটা ততক্ষণে হরিকে ছেড়ে দিয়েছে।

'আচ্ছা! আচ্ছা! বাকি যা রইল তা' নগদের সঙ্গে খাতায় জুড়ে দেবো··· যা···আজ যা!'

ছাড়া পেয়েই হরি ভয়ে ছুটতে আরম্ভ ক'রে দিল। কিন্তু দুর্বল শরীর নিয়ে ছুটতে গিয়ে সে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল।

রতন ছুটে এসে তাকে তুলে ধরে। 'ভয় নেই হরি···আমি রতন!'

হরির তখন মনে হচ্ছিল যেন পাঠান দুটো তার পেছনে আসছে।

কোন কথা না বলে তারা দু'জনে ঘরে ফিরে এল।

সিঁড়ির সামনে মুন্নু আর চৌকিদার দাঁড়িয়ে।

তাদের দেখে মুন্নু এগিয়ে এসে জানায়ঃ 'চৌকিদার ভাড়ার জন্যে এসেছে ...আমি বলেছি, শিবুর কাছ থেকে নিতে!'

কাপড়ের খুঁট থেকে তিনটি টাকা বার ক'রে হরি বলেঃ তুমি আর দুটো টাকা দাও...তার পর শিবুর সঙ্গে আমরা বোঝাপড়া ক'রে নেবো'খন!'

মুন্নু দুটো টাকা দিয়ে দেয়।

রতনও দুটো টাকা চৌকিদারের হাতে দেয়ঃ 'আমার ভাড়া!'

হরি কোনরকমে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে ঘরে পেঁছয়। ঘরে ঢুকেই দীর্ঘ-শ্বাস ফেলে মেঝের ওপর বসে পড়ে। লক্ষ্মী তাড়াতাড়ি তার কাছে এসে তার পা টিপতে আরম্ভ করে।

রতন বাইরে একটা বিড়ি ধরায়। মুন্নুর সাধ যায়। কিন্তু টানতে গিয়েই গলায় ধোঁয়া আটকে যায়। কাশতে আরম্ভ করে। রতন হো হো ক'রে হেসে ওঠে।

শিবু সেই সময় ঘরে এসে ঢোকে।

'আমারও মাইনে থেকে পাঁচ টাকা কেটে নিয়েছে, কাপড় নষ্ট করার দরুন... হাসতে হবে না আর...এসময় ভালো লাগে না হাসি!'

রতন হাসি থামিয়ে বলেঃ 'কই, আমার মাইনে থেকে তো ও-সব বাজে অজুহাতে কাটতে সাহস করে না! তোমরা ভয় পাও...তাই ওরা অত্যাচার করে। আমার মতো বুক ফুলিয়ে দাঁড়াতে পার না? তা' যদি না পার, আমার সঙ্গে চলো, য়ুনিয়নে নাম লেখাবে চলো...অমন কুঁড়ে হলে কি চলে?'

মুন্নু লাফিয়ে ওঠেঃ 'আমি য়ুনিয়নে নাম লেখাব! বল, কোথায় যেতে হবে?'

রতন বলেঃ 'বেশ চলো...আমি নিয়ে যাবে...দেরি করলে চলবে না!'

লক্ষ্মীর সেবার ফলে হরি ততক্ষণে কথঞ্চিৎ সুস্থ হয়ে উঠেছিল। উঠে দাঁড়িয়ে সে-ও বলেঃ 'আমিও যাবো...আমিও নাম লেখাব!'

'আমিও যাব...' —শিবু বলে।

সকলকে নিয়ে রতন বেরিয়ে পড়ে, সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে হেসে বলে : 'নাম লেখার পর, তাড়িখানায় গিয়ে সবাই মিলে এক পাত্র খেয়ে ফিরবো কেমন ?'

॥ বারো ॥

দেখতে দেখতে মুন্নু আর রতনের মধ্যে প্রগাঢ় বন্ধুত্ব জমে ওঠে···সহজ-সরল, তাজা দু'জন পঞ্জাবীর মধ্যে যে-রকম বন্ধুত্ব গড়ে ওঠা সম্ভব। যেমন তাড়াতাড়ি এই বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল, তেমনি তা' গভীরও হয়ে উঠছিল···যেন তারা—যাকে বলে ন্যাংটো বেলাকার বন্ধু।

যে পারিপার্শ্বিকতার মধ্যে তারা দু'জনে এসে পড়েছিল তাতে ক'রে আপনা থেকে এই বন্ধন আরও সুগভীর হয়ে ওঠে। সেই প্রাণহীন শব্দ-সঙ্কুল কারখানার মধ্যে, কিংবা বাড়িতে সেই বন্ধুহীন জনতার মধ্যে, জীবনের তিক্ততা যেখানে পায়ে-পায়ে কাঁটার মতো ফুটত, সেখানে একমাত্র অন্তরের তাগিদেই এই ভ্রাতৃত্ব-সম্বন্ধ গড়ে উঠেছিল। দিনে বারো ঘণ্টা যদি খাটতে হয় লোহাও ক্ষয়ে যায়··· মানুষের জীবন তো অতি ক্ষণভঙ্গুর ! আর যদি পনের ফিট লম্বা আর দশ ফিট চওড়া একটা ঘরে বাক্স-বন্দী হয়ে বাস করতে হয়, যদি ধোঁয়া আর রান্না আর ময়লা আর পায়খানার গন্ধে একঘরে, এককলে, এক-সিঁড়িতে, এক-উঠানে, একই ছেঁড়া বালিশ আর ময়লা চটে দু'বেলা জীবনকে বহন করতে হয়, আপনা থেকেই তা' এনে দেয়, মৈত্রী-স্পৃহা সঙ্গ-তৃষ্ণা···

তাই এই নরকের বাইরে, যে-কয়েক ঘণ্টা তারা ছুটি পেত, সেইটুকুই ছিল তাদের মন-লেন-দেনের আসল আনন্দ।

সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠতে মুন্নুর রীতিমতো কষ্ট হতো। কারখানায় হেঁটে যেতেই হয় এবং বাড়ি থেকে কারখানায় যেতে কমপক্ষে এক ঘণ্টা সময় লাগে। তার মধ্যেই প্রাতঃকৃত্য স্নান ইত্যাদি সেরে নিতে হয়। তা'হলে বিছানা থেকে উঠতে হয় ভোর সাড়ে-চারটে কিংবা বড় জোর পাঁচটার সময়।

সন্ধ্যাবেলা আবার যখন ছ'টার বাঁশী বেজে উঠত, তখন আবার সেই বাড়ি ফিরে আসা। মেয়েরা সারাদিন কারখানায় খেটে আসার পর, বাড়িতে রান্না করতে বসত। রান্না সারতে ন'টা বেজে যেত। সুতরাং আট ঘণ্টা যদি ঘুমুতে

হয়, তৎক্ষণাৎ বিছানায় শুয়ে পড়তে হয়। অবশ্য শুয়ে পড়লেই এদের ঘুম এসে যায়। এদের একমাত্র সৌভাগ্য ঘুম আনবার জন্যে কোন নিদ্রাকর্ষক ওষুধ খেতে হয় না। দিনে বারো ঘণ্টা খাটুনীই ঘুমের সব চেয়ে বড় ওষুধ।

কিন্তু মুন্নুর মতো ছেলে ন'টার সময় বিছানায় কিছুতেই শুতে যায় না। যেদিন থেকে রতন তাকে বাইরের জগতের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছে, সেইদিন থেকে তাকে নিত্য টানে, বাইরের খোলা মাঠ, তাড়ির দোকান শহরের রঙমশাল। তাই অধিকাংশ দিনই শয্যা নিতে মধ্যরাত্রি হয়ে যেত।

কিন্তু রাত্রির এই ক'টা ঘণ্টা, চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে সেইটুকুই শুধু বেঁচে থাকা! পাঁচজন লোকের সঙ্গে মিশে, পাঁচজন লোকের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা ক'রে, সেইটুকু সময় সে যেন বেঁচে থাকবার একটা মানে খুঁজে পেত। সেই সময়টাতে সে স্পষ্ট বুঝতে পারত, শৈশবের অর্থহীন অসহায়তা থেকে ক্রমশ সে বড় হয়ে উঠেছে। এবং একদিন হয়তো সে সম্পূর্ণ বড় হয়ে উঠবে। তাই এই ক'ঘণ্টার বাইরের জীবনের মধ্যে সে যা কিছু বলত, শুনত, করত, তাই তার কাছে মহামূল্যবান বোধ হতো।

তাই ছুটির দিন সে আনন্দে ফেটে পড়ত। দলে-দলে কুলিরা তখন শহরে বেড়াতে বেরুত, তাদের সঙ্গে সে-ও ভিড়ে যেত। শহরের মধ্যে তাকে সব চেয়ে বেশী টানত, বড়-বড় দোকানে সাজানো জীবনের নানা বিচিত্র সব উপকরণ। দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে সে দেখত, কল্পনায় তাদের স্পর্শ-সুখ অনুভব করত···সেই সঙ্গে মনে জেগে উঠত তীব্র আশা, অদূর ভবিষ্যতে একদা সেই সব উপকরণ দিয়ে সত্যি-সত্যি সে সাজিয়ে তুলবে তার জীবনকে।

সাধারণতঃ শনিবার বিকেলে মুন্নু আর রতন একসঙ্গেই বেরুত।

তাদের বাড়ির কাছ দিয়ে যে-রাস্তা মাঠের ভেতর দিয়ে বোম্বে শহরে গিয়ে পেঁচিছে, কুলিদের পায়ে-পায়ে তার মরা ধুলো তখনকার মতো যেন বেঁচে উঠত। কোথাও কাঁচা চামড়া তৈরি হচ্ছে, তার পচা গন্ধ, পথের ধারে কোথাও দু'দিনের মরা কুকুর পড়ে আছে···আঁস্তাকুড়ের ওপর কোথাও বেড়ালে ঝগড়া করছে···মানুষ, গরু, ঘোড়া, ছাগলের পরিত্যক্ত দেহ-মল মাঠের ফাটলে, রাস্তার গর্তে পড়ে-পড়ে শুকোচ্ছে···ক্রমশ সে-দৃশ্য সে-গন্ধ পেছনে পড়ে যায়। তার পরিবর্তে দেখা যায় পামু-ঘেরা ছায়া-বীথি···স্নিগ্ধ শ্যামল লতায়-পাতায়

ঢাকা মনোরম অঙ্গন···গোলাপে আর চামেলীতে ছাওয়া লতা-বিতান। ক্রমশ চোখের সামনে মাথা তুলে ওঠে মেঘ-চুম্বী প্রাসাদ, কৃষ্ণচূড়ার সোনালী ফুলে ছাওয়া ভ্রমণ-উদ্যান। শীর্ণ-দেহ, গলিত লোল-চর্ম শুষ্কমুখ কুলিরা ক্রমশ মিশে যায় সিল্ক আর সুন্দর-শুভ্রতায় মোড়া পদচারী সম্ভ্রান্ত নাগরিকদের দলে। পথ ভরে ওঠে মোটরে, বাসে, ভিক্টোরিয়া গাড়িতে। সন্ধ্যার আলো আঁধারীতে কুলির দল শহরের বাজারে ছড়িয়ে পড়ে।

তাড়ির দোকানে বসে রতন দুষ্টু হাসি হেসে মুন্নুর কাছে প্রস্তাব করে: 'আজ তোকে একটা তামাশা দেখাব···'

এক বোতল মুরী বিয়ার ঢক্ঢক্ ক'রে শেষ ক'রে মুন্নুকে পাশে নিয়ে সে বেরিয়ে পড়ে। আবদুল রহমান স্ট্রীটের বিজলী-বাতির তলা দিয়ে ভেন্ডী বাজারের গ্যাসের পোস্ট পেরিয়ে একটা ছোট্ট আলোকিত গলির ভেতর দিয়ে তারা গ্রান্ট স্ট্রীটের ওপর এসে পড়ে।

মুন্নুও এক গেলাস বিয়ার খেয়েছিল। গোলাপী নেশার উৎসাহে সে রতনকে অনুসরণ ক'রে চলে···পুরনো, সরু স্যাঁতসেঁতে গলি···অন্ধকার···তার দু'পাশের ময়লা জঞ্জাল ঢাকা পড়ে গিয়েছে···ছোট ছোট খুপরীতে ফুলওয়ালারা বসে···তাদের ফুলের গন্ধে রাস্তার দুর্গন্ধ যেন লুকিয়ে পড়েছে···ক্রমশ আশেপাশে ভাঙাচোরা বিসদৃশ দৃশ্যের বদলে চোখে পড়ে, জানালার ধারে, বারন্দার টুলের ওপর বসে নকল গয়নায় সারা-গা-মোড়া বিচিত্র-মূর্তি সব নারী···রাস্তায় পান চিবোতে চিবোতে যারা ঘুরে বেড়াচ্ছে···তাদের দিকে মুচকে হেসে চোখের ইঙ্গিতে নিমন্ত্রণ জানাচ্ছে···

রতন মুন্নুকে দেখিয়ে বলে: 'কেমন সুন্দর না? সত্যি বল্, ভালো লাগছে তো? কোন্ মেয়েটাকে তোর পছন্দ হয়?'

মুন্নু বিব্রত হয়ে পড়ে। অকারণে হেসে ওঠে। রতনের কথার ইঙ্গিতে তার দেহের মধ্যে যেন রক্তে দোলা লাগে। উত্তপ্ত পরিতৃপ্তিতে সে বন্ধুর দিকে চায়। চোখে তার জ্বলে ওঠে নিষ্কলঙ্ক শুভ্র আলো। রেশমী-উত্তরীয়র মতো তার অঙ্গকে ঘিরে দোলে উন্মাদ কামনায় আতুর স্বপ্ন···

মুন্নুর উত্তরের অপেক্ষায় না থেকে রতন বলে ওঠে: 'আয় আমি জানি কোথায় যেতে হবে···পিয়ারী জান···পিয়ারী জানের ঘরে যাব, চল্!'

মন্মু নীরবে অনুসরণ করে।

সাদা, কালো, তামাটে, বিচিত্র বর্ণের সব মানুষের দল রাস্তা দিয়ে এগিয়ে চলে। আনন্দ মুখর···চঞ্চল···জীবন্ত কামনায় চলমান তরঙ্গের-পর-তরঙ্গ··· যেন কোন্ অনাহত নীরব সঙ্গীতের সঙ্গে দুলে উঠেছে সরণী! আপনার আদিম সঙ্গীত···অন্তরের নিষ্করুণ নিঃসঙ্গতার হাত থেকে, নৃত্যে সুরে, প্রেমে সুকোমল স্পর্শে যা এনে দেয় মুক্তি···মধুর মৃত্যু···সুমধুর পরিসমাপ্তি···হোক্ তা' ক্ষণিক, হোক তা অসম্পূর্ণ···

এই আনন্দ-সরণীতে এই যে মানুষের ভিড়···এরা যে কত দুঃখী, কত ভাগ্যহত···ভেতরে-বাইরে কত রিক্ত···তা' মুন্নুর ধারণায় ছিল না। এই ছদ্ম সমারোহের ওপরের চাকচিক্য তার মনকে ভুলিয়ে দেয়···তার মনে প'ড়ে যায়, তার দেশে, বৎসর অন্তে যে-সব মেলা বসত···দলে-দলে মেয়ে-পুরুষ, জড় হতো, যার যা ভাল পোশাক লোক-দেখানোর জন্যে সেদিন তারা বার করত। তার নিজের কোন বিশেষ উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য ছিল না, তাই সে ভেবে নিয়েছিল তার আশেপাশে যারা ভিড় ক'রে আসছে তাদেরও বুঝি কোন উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য নেই।

ইতিমধ্যে রতন একটা গলির ভেতর দিয়ে অন্ধকার সিঁড়ি পেরিয়ে বৈঠকখানার মতো একটা বড় ঘরে মুন্নুকে নিয়ে হাজির হয়। ঘরের ভেতর ঝাড়-লণ্ঠনের আলো···দরজায় কাগজের ফুলের মালা ঝোলানো···দেয়ালে সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ড আর তাঁর পৌত্রের একটা বড় রঙীন ছবি···তার পাশে ভক্তরাজ হনুমানের একটা পট···সেই সঙ্গে সুবেশা এক তরুণী নারীর একখানি ফোটো চিত্র। চিত্রখানি ঘরের বর্তমান অধিকারিণী পিয়ারী জানের যৌবনের প্রতিকৃতি ···তখন বোম্বের বড় বড় সওদাগর আর রইস তার নৃত্য উপভোগ করবার জন্যে সমবেত হতো···তখন গ্রান্ট স্ট্রীটে পিয়ারী জানের নিজস্ব আলাদা আড্ডাখানা ছিল। এখন ভগ্ন-দেহ···বয়োবৃদ্ধা···নিঃশেষিত-রস শুষ্ক ছোবড়া···পথচারীর অনুকম্পার জন্যে সন্ধ্যায় নকল গয়না আর সস্তা রঙীন পোশাকে জানালার কাছে সেজেগুজে বসে থাকতে হয়।

'আরে, এসো, এসো পালোয়ানজী! বলি এতদিন কোথায় গা ঢাকা দিয়েছিলে? মাইরি বলছি, তোমার জন্যে পথ চেয়ে চোখ দুটো ক্ষয়ে গেল একেবারে···' এক গাল হেসে পিয়ারী জান সাদর আমন্ত্রণ জানায়।

'আরে ভাই বড় কাজ পড়েছিল···তার ওপর ফোরম্যান ব্যাটা গেল-মাসের মাইনে থেকে বিস্তর কেটে নিয়েছিল।'

মুচকে হেসে পিয়ারী বলে : 'এমাসের মাইনে কাটেনি নিশ্চয়!'

পিয়ারীর কথার উদ্দেশ্য বুঝতে রতনের দেরী হয় না। তাই তার যোগ্য উত্তর সে দেয় : 'আরে, না না···তোমার যা পাওনা তার জন্য ভেব না! সে ঠিক আছে!'

কথাটা পালটে নিয়ে মুন্নুকে দেখিয়ে বলে : 'এই দেখ, তোমার জন্যে খাপসুরৎ একটা তাজা ছোঁড়া নিয়ে এসেছি!'

মুন্নুর কাছে এগিয়ে গিয়ে তার মাথার ওপর হাত রেখে পিয়ারী বলে ওঠে : 'বাঃ, সত্যি তো, যেন পটের দেবতা···দিবি চেহারা···তোমার ছেলে বুঝি?'

রতন বলে ওঠে : 'দূর মাগী? আমার ছেলে কেন? তোর পীরিতের লোক···আমার দুশমন।

সেই ঝলমল গয়না আর রঙচঙে পোশাক···সেই সঙ্গে আতরের মিষ্টি গন্ধে মুন্নু যেন মুহ্যমান হয়ে পড়ে। এখনও যার দেখা পায় নি তার স্বাদ নেবার জন্যে তার দেহ-মন উন্মুখ হয়ে ওঠে। বহু কষ্টে উত্তেজনাকে দমন ক'রে সে দাঁড়িয়ে থাকে।

'বসো, দাঁড়িয়ে রইলে কেন, পালোয়ানজী, তোমার সব তাতেই ঠাট্টা!'

ফরশা-চাদরের ওপর আরাম ক'রে বসে রতন উত্তর দেয় : 'তাহলে তোমার আড্ডায় ভাঁড়ের চাকরিটা তো পাবো?'

'সে কি কথা! তুমি হলে আমার মালিক! আমি তোমাকে চাকরি দেবো?'

বাজে রসিকতা বাদ দিয়ে কাজের কথায় আসবার জন্যে পিয়ারী জান সুর পালটে জিজ্ঞেস করে : 'তাহলে হুজুরের ফরমাণ হয়, শরবত নিয়ে আসি··· শরবত খেয়ে দু'খানা গান শোন···কেমন?'

জামার ভেতর থেকে এক বোতল মদ বার করে পিয়ারীর সামনে ধরে উল্লাসে রতন বলে ওঠে : 'হাঁ হাঁ···শরবত চাই বইকি! তবে এই শরবত না হলে কি বিবিজানের ভালো লাগবে?'

আপ্যায়িত হয়ে পিয়ারী বলে ওঠেঃ 'এমনি না হলে পালোয়ানজী! মাইরি ভাই, তোমার দিল্ যেন হাতেমতাই-এর দিল। দরাজ! দাঁড়াও, গ্লাস নিয়ে আসি।'

সামনে চমৎকার কাঠের কাজ করা একটা খাটের ধারে কুলুঙ্গী থেকে গোটা চারেক ছোট গ্লাস নিয়ে আসে। দরজা থেকে মুখ বাড়িয়ে হাঁকেঃ 'জানকী ···গুলাব জান···বুদ্দী খাঁ···'

রতন বুঝতে পারে। 'তা'হলে একটু নাচ হবে দেখছি? মাইরি জান্, আমার জন্যে তুমি বড় মেহনত করছ···একটু আমার পাশে এসে বসো তো আগে?'

অঙ্গ দুলিয়ে নাচতে-নাচতে মুচকি হেসে পিয়ারী রতনের কোলের ওপর বসে পড়ে।

চোখের সামনে কামনার এই প্রত্যক্ষ অভিব্যক্তিতে মুনু সচকিত হয়ে ওঠে। স্ত্রী-পুরুষকে এইভাবে এত কাছাকাছি সে আর কখনো দেখে নি। দেশেতে তার খুড়ো আর খুড়ী এক বিছানাতে শুতো না! প্রভুদয়ালের বাড়িতেও, পাশাপাশি দুটো আলাদা খাটে তাদের স্বামী-স্ত্রী দু'জনকে সে শুতে দেখেছে— কখনও পরস্পর পরস্পরকে ছুঁতে পর্যন্ত দেখে নি। হাঁর আর লক্ষ্মী সম্বন্ধেও তাই, তারা যেন দু'জনে দুশহরে থাকত। তাই চোখের সামনে সেই অন্তরঙ্গ দৃশ্য কিছুক্ষণ দেখার পরেই তার মনে হলো, তার শরীরের ভেতর যেন কেমন করছে। মদের চেয়ে মাদক, কি এক অপূর্ব স্নিগ্ধরসে যেন তার সব ভাবনাগুলো গলে গলে যাচ্ছে।

এমন সময় দু'টি সুন্দরী তরুণী ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়েই থমকে দাঁড়াল। পরনে গোলাপী রঙের সিল্কের ঢিলে পায়জামা আর গায়ে আঁট পিরান। সামনের দিকে স্পষ্টভাবে একবার দেখে নিয়ে তারা বুদ্দী খাঁর জন্যে পিছন দিকে ফিরে চায়। সঙ্গে সঙ্গে দন্তহীন, ক্ষীণ দৃষ্টি, ভাঙা গাল, কৃষ্ণকায় একজন বৃদ্ধ সেলাম করতে করতে প্রবেশ করে। দেখলেই বোঝা যায়, এ অঞ্চলের দালাল। বুদ্দী খাঁ।

'সেলাম, সেলাম পালোয়ানজী! ও! বহুত বহুত দিন বাদে পায়ের ধুলো পড়ল আপনার! ভালো ক'রে আজ খুশী করতে হবে···কি বলিস্ রে ছুঁড়িরা?

বুদী খাঁ দেরি না ক'রে সোজা এগিয়ে গিয়ে হারমোনিয়াম বাজাতে আরম্ভ ক'রে দেয়।

পিয়ারী কোলের কাছে তবলা টেনে নেয়। সঙ্গে সঙ্গে গান ধরে।

গানের প্রথম কলি গাওয়া শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মেয়ে দু'টির পায়ের ঘুঙুর বেজে ওঠে···রঙীন ওড়না উড়িয়ে তারা নাচতে আরম্ভ করে। সঙ্গীতে-নূপুরে-নৃত্যে দেখতে-দেখতে সমস্ত ঘরটা ভরে ওঠে।

রতন উচ্ছ্বসিত হয়ে ট্যাঁক থেকে একটা টাকা বার ক'রে বুদী খাঁকে দেয়ঃ 'বাহবা, বাহবা, ওস্তাদজী! দিল্ ঠাণ্ডা ক'রে দিলে!' তার পর নেশায় অবশ দেহে পিয়ারীর ঘাড়ে ঢলে পড়ে···'পিয়ারী! মেরী জান্···'

আদর পেলে বিড়াল যেমন সমস্ত দেহটা বিচিত্র ভঙ্গীতে কুঁকড়ে কোল ঘেঁষে বসে, পিয়ারী ঠিক তেমনি ক'রে রতনের কোলে গিয়ে উঠে বসল···গলা জড়িয়ে ধ'রে বলে উঠলঃ 'আমার বরাত ভালো, তোমাকে খুশী করতে পেরেছি! তবে আমাকেও খুশী করতে হবে!'

ইঙ্গিতটা বুঝতে পেরে রতন উচ্ছ্বসিত-কণ্ঠে উত্তর দেয়ঃ 'তবে কি বৃথাই লোকে আমাকে হিন্দুস্থানের রুস্তম বলে?'

মেয়ে দুটি খিল্‌খিল্ ক'রে হেসে ওঠে।

মুমুর মনে হচ্ছিল যেন তার দেহের ভেতর থেকে হৃদয় বলে পদার্থটি বাইরে এসে গলে-গলে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে···তরঙ্গের মতো ব্যাকুল হয়ে ছুটে চলেছে সেই দুটি তরুণীর দেহ-তট স্পর্শ করবার জন্যে···কিন্তু কিসে যেন ব্যাহত হয়ে বার-বার ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসছে।

চোখের ইশারায় বুদী খাঁকে বাজনা-বাজাতে ইঙ্গিত ক'রে পিয়ারী বিলোল-কটাক্ষে হাতের চুড়ির আওয়াজের তালে আর একটি গান ধরে।

নেশার আবেশে রতন আদেশ করেঃ 'আর-একবার নাচ হোক···আমার খাতিরে···'

পিয়ারীর ইঙ্গিতে মেয়ে দু'টি আবার নাচতে শুরু ক'রে দেয়···পিয়ারী গান গায়···

ঠিক সোমের মাথায় রতন বাহবা দিয়ে ওঠে। গান শেষ হওয়ার সঙ্গে-

সঙ্গে আর-একটা টাকা ট্যাঁক থেকে বার ক'রে সামনের থালার ওপর ছুঁড়ে দেয়।

পিয়ারীর সঙ্গে মেয়ে দু'টির চোখে চোখে কি কথা হয়ে যায়, তারা উঠে ঘর ছেড়ে চলে যায়। তাই দেখে মুন্নু চঞ্চল হয়ে ওঠে। সে স্পষ্ট অনুভব করে তার সারা গা থেকে আগুন বেরুচ্ছে।

রতনের দিকে চেয়ে মুচকি হেসে মুন্নুকে লক্ষ্য ক'রে পিয়ারী বলে ওঠে: 'আহা, বাছার বড় কষ্ট হচ্ছে!'

সে-ইঙ্গিত বুঝতে রতনের দেরী হয় না: 'মুন্নু ভাই···তুই এবার বাড়ি যা ···অনেক রাত হয়ে গিয়েছে···আমি একটু পরে পরেই যাচ্ছি···যা···।'

এতদিন জীবনে যা জানা হয় নি, আজ তাই জানবার জন্যে সে আকুল আগ্রহে এতক্ষণ অপেক্ষা ক'রে ছিল। সহসা তা' থেকে বঞ্চিত হওয়ায় মুন্নু একেবারে ভেঙে পড়ে। এতক্ষণ ধরে সে যেন একটা কিছুর অপেক্ষায় বসে ছিল···কিন্তু কি তা, সে নিজেই জানত না। এখন বাধ্য হয়েই তাকে উঠে দাঁড়াতে হলো। পিয়ারী উঠে এসে তার মাথায় হাত দিয়ে যেন আশীর্বাদ করল। আচ্ছন্নের মতো সে ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে পড়ল···তখন মধ্যরাত্রি হয়ে গিয়েছে। বোম্বের নিদ্রাহীন রাজপথের আশেপাশে, ফুটপাতের ওপর, নিত্য-কালের গৃহহীন কুলির দল শয্যাহীন হিম-প্রস্তরে তখন ঘুমুবার ব্যর্থ চেষ্টায় গড়াগড়ি দিচ্ছে···গল্প করছে,···গ্যাসের মৃত্যু-পাণ্ডুর ম্লান আলোয় তন্দ্রা আর দুঃস্বপ্নের মধ্যে দুলছে;

শহর ছাড়িয়ে মুন্নু গাঁয়ের রাস্তায় এসে পড়ে। আকাশে চাঁদ নেই, তবুও পায়ে-হাঁটা সরু রাস্তাগুলো রুপোর পাতের মতো জ্বলছে, মাঝে মাঝে কোথাও অন্ধকারে জোনাকীর ক্ষীণ আলো অন্ধকারকেই আরও স্পষ্ট ক'রে তুলছে···কাছে কোথাও ঝোপের ভেতর থেকে নিশাচর পেচকের দল কঠিন কর্কশকণ্ঠে গেয়ে উঠছে নিশীথের নিষ্করুণ সঙ্গীত···

বুকের ভেতর যেন কি একটা ভারী জিনিস ভেতর থেকে তাকে অবশ ক'রে তুলছে···দুশ্চিন্তার প্রেতমূর্তির মতো অর্ধজাগরিত বাসনার অতৃপ্ত শিরা উপ-শিরা দিয়ে মগজে এসে সব যেন গুলিয়ে ধোঁয়ার মতো ক'রে দিচ্ছে···মাঝে-মাঝে সন্দেহ হচ্ছে, বুঝি তার ঘাড়ের ওপর মাথাটাই নেই।

কোনরকমে ভারাক্রান্ত দেহকে টেনে নিয়ে সে এগিয়ে চলে। চলতে-চলতে নিজেকেই জিজ্ঞেস করে : কি চাই তার ? কি চেয়ে ছিল সে, যা পায় নি ব'লে আজ তার মন এমনি ক'রে মরে যাচ্ছে ! কিন্তু সে-প্রশ্নের কোন সঠিক উত্তরই সে দিতে পারে না। ক্রমশ তার নিজের পায়ের শব্দে সে নিজে ভীত সচকিত হয়ে ওঠে···নির্জন প্রান্তরের সেই পুঞ্জীভূত অন্ধকার যেন প্রেত-স্পর্শে সজীব হয়ে ওঠে···সে ছুটতে আরম্ভ করে···যতক্ষণ না বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ায়। দরজার ভেতর ঢুকে সে হাঁফ ছেড়ে বাঁচে···রাত্রির পিশাচিনীরা আর তাকে ধরতে পারবে না ! কিন্তু তখনও তার হাড়ের ভেতর যেন কাঁপতে থাকে অন্ধকারের বিভীষিকা···সিঁড়ি দিয়ে উঠতে তার দম ফুরিয়ে আসে।

ঘরের মধ্যে লক্ষ্মী ছাড়া আর সকলেই তখন নাক ডেকে ঘুমোচ্ছিল। সেই বায়ুহীন বন্ধ ঘরে দেয়ালে ঠেস দিয়ে মাটির প্রদীপের আলোয় লক্ষ্মী তখনও পর্যন্ত জেগে ছেঁড়া কাপড় সেলাই করছিল। আসলে সে মুন্নুর অপেক্ষাতেই জেগে বসেছিল। ম্লান ব্যথিত দৃষ্টিতে মুন্নুর দিকে চেয়ে সে কাতরভাবে জিজ্ঞেস করে : 'এতক্ষণ কোথায় ছিলে ?'

মুন্নু কোন কথা বলতে পারে না, শুধু চেয়ে থাকে। পিয়ারী জান যখন তার মাথায় হাত দিয়েছিল, তখন তার উদ্গত অশ্রু-ধারা চোখের পাতার আড়ালে এসে থেমে গিয়েছিল···সেখানেই এতক্ষণ তা জমা হয়েছিল···লক্ষ্মীর স্নেহ-দৃষ্টির আকর্ষণে যেন তা ফেটে বেরিয়ে এল। তাই লক্ষ্মীর দিক থেকে চোখ ঘুরিয়ে নিয়ে, তার শোবার জায়গার দিকে চেয়ে দেখে। কতক্ষণ সে এমনি চোখ ঘুরিয়ে পিছন ফিরে দাঁড়িয়েছিল, তা সে নিজেই অনুমান করতে পারে না যখন আবার লক্ষ্মীর দিকে চাইল, দেখে লক্ষ্মীর সমস্ত দেহ তার দেহের ওপর ঝুঁকে পড়েছে···সে স্পষ্ট অনুভব করে, সে-আনত দেহ থরথর ক'রে কাঁপছে··· চোখে তার বিদ্যুৎ-বহ্নি !

স্পর্শ-ব্যাকুল হ'য়ে ওঠে অন্তর, তবু অভ্যাসবশত সে মাথাটা সরিয়ে নেয়, যেন লক্ষ্মীর স্পর্শ সে এড়িয়ে থাকতে চায়। তাতে বিন্দুমাত্র বিচলিত না হ'য়ে লক্ষ্মী কোমল, অতি কোমল স্পর্শে হাত দিয়ে তার চিবুক তুলে ধরে···জননী যেমন অতি সহজেই বোঝে সন্তান কি চায়, নারীর সেই সহজাত বেদনাতুর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে লক্ষ্মী নিমেষে বুঝতে পারে, তার সামনে সেই মৌনমূর্তি

কিশোরের দেহমনের কি আর্তি···তপ্ত ওষ্ঠ তার কপালে রেখে—মৃদু, অতিমৃদু কণ্ঠে, যেন কোন গুপ্তমন্ত্রের মতো কানে কানে বলে, 'ওগো, দুঃখ কি ! তুমিও দুঃখী, আমিও দুঃখী···দুঃখই আমাদের সব !'

আর দাঁড়িয়ে থাকতে না পেরে মুন্নু তার নির্দিষ্ট জায়গায় গিয়ে শুয়ে পড়ে। নীরবে লক্ষ্মী তার পাশে গিয়ে শোয়, দু'হাতে তাকে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে প্রাণপণে জড়িয়ে ধরে···সেই তপ্ত সান্নিধ্যের নীরব অভিষেকে সে যেন মূর্ছিত হয়ে পড়ে···অসহ্য যন্ত্রণায় জেগে ওঠে ইন্দ্রিয়ের সব দ্বার ভেঙে জাগ্রত যৌবনের সমস্ত নিরুদ্ধ কামনা···অসহ্য পীড়নে ভেঙে গুঁড়িয়ে দিতে থাকে তার সারা দেহ···অবশেষে ঊষার মধুর লগ্নে নিশাবসানের সেই মায়া-মুহূর্তে, সেই অসহ্য জ্বালা আপনি খুঁজে নেয় তার মুক্তি, মধুর মরণ···নারীর তপ্ত দেহে পুরুষের ক্ষণিক দেহাবসান !

॥ তের ॥

তাই সোমবারের সকাল বেলাটাকে সহজভাবে গ্রহণ করতে তারা পারে না। একটি দিনের ছুটি, তারই মধ্যে তারা পুরোপুরিভাবে আস্বাদ ক'রে নিতে চায় অন্য সব দিনের বঞ্চিত মানবীয় ক্ষুধা···এই একটি দিন—তারা বুঝতে চায় তাদেরও দেহের ভেতরে আছে মানুষের প্রাণ। তাই সেদিনটির আত্ম-বিলাসের পর, সহসা যখন বেজে ওঠে আবার সোমবারের বাঁশী, মনে হয়, যেন সে-আহ্বান জীবন-শেষেরই আহ্বান।

তবু উঠতে হবে, যেতে হবে কারখানায়। ঘর থেকে তাই কারখানার দিকে পা বাড়াতেই তাদের মনে হয় যেন কোন্ অদৃশ্য প্রেতমূর্তি আবার তাদের মরণ-আলিঙ্গনে আত্মস্থ ক'রে নিল···তারা এগিয়ে চলে, যেন পক্ষাঘাতে সম্মোহিত হয়ে গিয়েছে সারাদেহ···উদাসীন···প্রাণহীন···চোখে মুখে স্পষ্ট ফুটে ওঠে অব্যক্ত বেদনার বিভীষিকা···মুখ নয়, যেন মুখোস।

মুন্নুর কাঁচা দেহ থেকে তখনও কারখানা সব রস শুষে নিতে পারে নি—একটা রবিবারের উৎসবের পর যথেষ্ট উদ্বৃত্ত তেজ দেহ-ভাণ্ডে সঞ্চিত থাকে। তাই সোমবার কারখানা-যাত্রী কুলিদের ম্লান মুখের দিকে চেয়ে সে বিস্ময়ে ভাবে কেন তারা এত বিষণ্ণ ?

কাঁপতে কাঁপতে দুর্বল দেহে, রেখাঙ্কিত কুৎসিত মুখে, পা থেকে মাথা পর্যন্ত ময়লা মেখে, নির্বিকার-চিত্তে, শিরদাঁড়া-ভাঙা পুতুলের মতো সন্ত্রস্তপদে তারা কোনরকমে এগিয়ে চলে…চোখ চেয়ে থাকে বটে, কিন্তু সে-চাওয়াতে যেন কিছুই দেখা যায় না। মাঝে মাঝে বোকার মতো ধূম্র-লাঞ্ছিত আকাশের দিকে চেয়ে "রাম রাম" অথবা অন্য কোন দেব-দেবীর নাম উচ্চারণ ক'রে দীর্ঘশ্বাস ফেলে…সর্বশক্তিমান তাদের বাঁচিয়ে রেখে যে করুণা দেখিয়েছেন, তার জন্যে কৃতজ্ঞতা জানায়। মুন্নুর মনে পড়ে, দৌলতপুরে প্রভুদয়াল প্রায়ই বলত, সবই ভগবানের দান…গণপতের দুর্ব্যবহার পুলিশের সেই অকারণ নিষ্ঠুর প্রহার, এমন কি প্রহারের ফলে মরণ-সমান সেই জ্বর—সবই ভগবানের দান, কৃতকর্মের ফল! হয়তো তার চোখের সামনে নতমুখ ম্লান এই কুলির দল, তারাও তাই ভাবে। অন্তত হরিকে প্রায়ই সেই ধরনের কর্মফলের কথা বলতে সে শুনত; হরির বিশ্বাস জীবনে সে অনেক ভালো কাজ করেছে, তার ফলে একদিন তার ভাগ্য নিশ্চয়ই সুপ্রসন্ন হবে। একমাত্র রতন এই ধরনের কথা শুনলে হেসে উঠত, কোন কিছুতেই ভেঙে না পড়ে একমাত্র তাকেই সে দেখেছে, হাসিমুখে বুক ফুলিয়ে চলতে।

চিমটা সাহেব রোজ সকালে কুলিদের কারখানায় ঢোকবার সময় সেডের মুখে দাঁড়িয়ে সেলাম আদায় করত। তাদের অভিবাদনের উত্তরে কখনো হয়তো একটু হাত তুলত, নতুবা অধিকাংশ সময়ই গালাগাল দিয়েই প্রত্যুত্তর দিত। কাজে ঢোকবার মুখে সাহেবের সেই ষাঁড়ের মতোন বিপুল দেহ দেখে, কুলিদের মনে আপনা থেকে ইষ্ট-দেবের কথা জেগে উঠত, কাজ করবার একটা তাগিদ তারা খুঁজে পেত। মাঝে মাঝে চিমটা সাহেব সেলামের বদলে বুটসুদ্ধ পায়ের লাথি দিয়ে প্রত্যভিবাদন জানাত। যেদিন সকাল থেকেই প্রভু রঙে থাকতেন, কিংবা বাড়িতে মেমসাহেবের সঙ্গে ঝগড়া ক'রে আসতেন, অথবা সকাল বেলাকার খবরের কাগজ খুলে যেদিন দেখতেন, জাতীয়তাবাদী দলের লোকেরা অত্যন্ত বাড়াবাড়ি করছে কিংবা কোথাও কোন বিপ্লবী কাউকে খুন করতে চেষ্টা করেছে, অথবা সাম্যবাদীরা শ্রমিকদের সঙ্ঘবদ্ধ হবার জন্যে প্রচার করেছে, সেই দিনই তিনি হস্তের চেয়ে পায়ের ব্যবহারটাই বেশী করতেন। তাঁর ধারণা, যেহেতু শাসক সম্প্রদায়ের লোকের গায়ের রঙের সঙ্গে তাঁর

গায়ের রঙের মিল আছে, সেই হেতু এই সব জাতীয় অভ্যুত্থানের চেষ্টা যেন ব্যক্তিগতভাবে তাঁকেই অপমান করবার উদ্দেশ্যে করা হচ্ছে। একদা ল্যাংকাশায়ারের কোন কারখানায় কালি-ঝুলি মেখে তিনিও যে এমনি কুলিদের লাঞ্ছিত জীবন যাপন করতেন, সে-কথা আজ তিনি সম্পূর্ণভাবে বিস্মৃত হয়ে গিয়েছেন।

কিন্তু একমাত্র রতন, সে কোনদিন মাথা নিচু ক'রে চিমটা সাহেবকে অভিবাদন জানায় নি। তার নিজের শক্তির ওপর তার প্রভূত ভরসা ছিল, তার ভরসার আর-একটি প্রধান কারণ ছিল, শ্রমিকদের য়ুনিয়ন। সে জানত কারখানার কাজে তার এতটুকু গাফিলতি হয় না। সুতরাং মাসের শেষে তার পুরো মাইনে সে পাবে না কেন? যখনই সময় মতো মাইনে পেত না, বা দেখত চিমটা সাহেব তার মাইনে কাটবার ফন্দী করছে, সে রীতিমতো আন্দোলন শুরু ক'রে দিত।

তা' বলে বাইরে থেকে দেখলে কারুরই বোঝবার কোন সাধ্য ছিল না যে, তার আর চিমটা সাহেবের মধ্যে কোন মনোমালিন্য আছে।

চিমটা সাহেবের পাশ দিয়ে সেদিন ভেতরে ঢুকতে ঢুকতে রতন চোখ টিপে হেসে বলে ওঠে: 'সালাম সাহেব!'

সাহেব চাপা গলায় ডাকে: 'এদিকে এসো!'

যেন সাহেবের একান্ত বাধ্য, এমনি একটা ভঙ্গী ক'রে ছুটে এসে তার সামনে এসে দাঁড়ায়: 'হুজুর!'

'চাকরি থেকে তুমি বরখাস্ত হ'য়ে গিয়েছ—।' চিমটা সাহেব স্থিরভাবে জানায়।

রতন অবাক্ হ'য়ে যায়।

'আমার অপরাধ?'

'যা—ও—ও…!'

রতন প্রথমে শান্তভাবেই সাহেবের মুখের দিকে চেয়ে থাকে…ক্রমশ তার মুখের চেহারা বদলাতে থাকে…চোখের কোণে ঝিলিক মেরে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে ভেতরের ঘুমন্ত দৈত্যটাকে যেন জাগিয়ে তোলে; বিদ্যুৎ-আহতের মতো এক নিমেষে সে বুঝতে পারে, সাহেবের সেই ক'টি কথার পরিণাম তার জীবনে

কি হতে পারে·· বুঝতে পারার সঙ্গে সঙ্গে আঘাত করবার জন্যে হাত উঠে যায়। কিন্তু চিমটা সাহেব তখন পেছন ফিরে দ্রুত নাদির খানের ঘরের দিকে এগিয়ে চলে। তাই পেছন দিক থেকে শত্রুকে আঘাত করতে তার পালোয়ানের নীতিতে বাধল। ধিক্কারে সেই উত্তোলিত মুষ্টির বোঝা শূন্যে আস্ফালন ক'রেই হালকা ক'রে ফেলে। সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আঘাতের জন্যে সংহত হয়ে উঠেছিল, সেগুলো আপনা থেকে আবার আলগা হয়ে যায়। বুক থেকে রক্ত ঝলক দিয়ে উঠে চোখে ছড়িয়ে পড়েছিল···চোখের পাতা ফেলতে, দেখল সে-রক্ত গরম লোনা জল হয়ে ঝরে পড়ছে।

মুমু তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলে: 'লোকে বলে শুনেছি, ঘোড়ার পেছন দিয়ে আর অফিসারের সামনে দিয়ে নাকি যেতে নেই! তুমি পারবে না জানি, আমি তোমার হয়ে চিমটা সাহেবের কাছে গিয়ে হাতে-পায়ে ধরছি—'

স্থিরভাবে রতন বলে: 'না···আমার জন্যে কারুর হাতে-পায়ে ধরতে হবে না···সে কত বড় সাহেব আমি দেখে নেবো···তুই দাঁড়া···'

এই বলে সে ছুটে বেরিয়ে পড়ে। আধ মাইল দূরে নিখিল ভারত ট্রেড য়ুনিয়ন ফেডারেশনের অফিস। তার বিশ্বাস, ফেডারেশনের প্রেসিডেণ্ট লালা ওঙ্কারনাথের কাছে যদি তার ব্যাপার সে জানাতে পারে, তা হলে নিশ্চয়ই তিনি এর একটা বিহিত করবেন।

কমিটির অফিসের একজন কেরানী বারান্দায় বসেছিল। তাকে দেখে রতন বলে: 'প্রেসিডেণ্টের কাছে আমার একটা নালিশ আছে।'

আপাদমস্তক তাকে একবার দেখে নিয়ে নিস্পৃহভাবে কেরানীবাবু জানালেন: 'তিনি এখন কাজে ব্যস্ত আছেন।'

রতন কোন কথা না ব'লে তার হাতে একটা আধুলি গুঁজে দিল।

কেরানী তৎক্ষণাৎ উঠে গিয়ে সামনের দরজার পর্দাটা তুলে একবার উঁকি মেরে দেখেই ফিরে এল: 'সাহেব বললেন, তিনি এখন বড় ব্যস্ত···তোমার যদি খুব জরুরী দরকার থাকে তাহলে একটা কাগজে লিখে দাও···নিজে যদি না লিখতে পার, একটা টাকা দাও আমি লিখে দিচ্ছি!'

রাগে রতনের সর্ব-শরীর জ্বলে উঠল। ইচ্ছে হলো, এই মুহূর্তে লোকটার ঘাড় ধরে মটকে দেয়। কিন্তু বহু কষ্টে নিজেকে সংযত ক'রে ট্যাঁক থেকে

একটা টাকা বার ক'রে তার হাতে দিল। কেরানী হাসিমুখে কাগজ-কলম নিয়ে লিখতে বসল, তখন রতন বলে যেতে লাগল।

দেখতে দেখতে কুলি-মহলে খবরটা ছড়িয়ে পড়ল, পালোয়ানজীকে বরখাস্ত করা হয়েছে। তাকে খুঁজে বার ক'রে কুলিরা দলে দলে এসে সহানুভূতি জানিয়ে যায়। দিনের-পর-দিন এই অত্যাচার তারা সহ্য ক'রে এসেছে। উলটে রতনও তাদের সহানুভূতি জানায়।

কিন্তু তারা শুধু পারে চুপটি ক'রে দাঁড়িয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলতে। দুঃখ দৈন্যে তাদের মেরুদণ্ড ভেঙে গিয়েছে, কোন কিছুতেই আর তাদের নেই উৎসাহ, তাই তারা মুখ বুজে শান্তভাবে সব সহ্য করে। রক্তহীন পাণ্ডুর চোখে ফ্যালফ্যাল ক'রে চেয়ে থেকে, বড় জোর তাদের মধ্যে কেউ একান্ত নম্রভাবে তাদের সান্ত্বনার যা বাঁধা বুলি আছে, তাই বলেঃ 'ভেবে আর কি হবে ভাই! এ সবই ভগবানের খেলা!' কেউ কেউ বলেঃ 'কষ্ট হয় বটে, কিন্তু এ দুনিয়ার ধারাই এই···বদমায়েশ যে হবে সেই পায়ের ওপর পা দিয়ে থাকবে আর ভালো লোক মার খাবে!'

দুঃখ সইতে সইতে তাদের দেহ-মন থেকে প্রাণশক্তি এমনভাবে নিঃশেষে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে গিয়েছে যে, সন্দেহ হয়, বুঝি তাদের দেহে প্রাণ আর নেই··· শুধু তাদের ম্লান মুখে মধ্যে মধ্যে দেখা যায় বেদনার স্মৃতির একটা ক্ষীণাভাস··· রোগ-পঙ্গু শয্যাশায়ীর দৈহিক অসহায়তার মতোন, শিশুর মুখের কোমলতার মতোন, মূক প্রাণীর চোখের দৃষ্টির পরনির্ভরতার মতোন।

সাড়ে-আট-টা নাগাদ দু'জন দেশী সাহেব, সউদা আর মুজাফর, আর একজন বিলাতী সাহেব, স্টানলী জ্যাকসন, এসে উপস্থিত হলো। প্রায়ই মিলের ময়দানে তাদের বক্তৃতা দিতে কুলিরা দেখেছে।

সউদা জিজ্ঞেস করেঃ 'শুনলুম তোমাকে নাকি বরখাস্ত করেছে, রতন?'

যেন কিছুই হয় নি এমন ভাব দেখিয়ে রতন সংক্ষেপে উত্তর দেয়ঃ 'হ্যাঁ!'

ভাঙা হিন্দুস্থানীতে বিলাতী সাহেব জিজ্ঞেস করেঃ 'ফোরম্যান টোমকো কুছ বাৎলায়া···কাহে নোকড়ী গিয়া?'

'না সাহেব! আমার চাকরিটা খাবার জন্য অনেক দিন থেকেই তাকু

করেছিল। চাকরি গিয়েছে আমার তত মনে লাগে নি সাহেব, যত মনে লেগেছে আমাদের য়ুনিয়নের প্রেসিডেণ্ট লালা ওঙ্কারনাথের ব্যবহারে···তিনি আমার সঙ্গে দেখাই করলেন না ?'

মুজাফর বলে : 'তুমি আমাদের কাছে এলে না কেন ? আমাদের সঙ্গে মেশো বলেই লালাজী তোমার সঙ্গে দেখা করে নি···ভয় নেই···আমরা তোমার পেছনে আছি।'

রতন সরলভাবেই জানায় : 'অন্য কোন মিলে হয়তো একটা চাকরি জুটে যেতে পারে, এই ভরসাতেই ছিলাম। তাই আপনাদের কাছে যাই নি। আপনাদের কাছে গেলেই ব্যাপারটা সব কারখানায় জানাজানি হয়ে যেত, তখন কোন মিলেই আমাকে কাজ দিত না !'

হঠাৎ তাদের ঘরে লাল-ঝাণ্ডা য়ুনিয়নের সাহেবদের আসতে দেখে মুনু প্রথমে একটু হকচকিয়ে গিয়েছিল। চুপটি ক'রে তাদের কথাবার্তা শুনছিল। রতনের উত্তর শুনে সে বলে উঠল : 'তুমি চিমটা সাহেবের কাছে গিয়ে হাতে-পায়ে ধরলেই পারতে।'

হাত নেড়ে উত্তেজিতভাবে সউদা বলে : 'না, না···সে কখনই নয়···এত অপমান ভোগ করেও তোমাদের শিক্ষা হলো না ? এত লাঞ্ছনা, এত যে নির্যাতন তাতেও কি তোমাদের মাথা তুলে দাঁড়াতে শেখাল না ? তোমাদের দেহ থেকে চামড়া ছিঁড়ে নেবে।'

এতক্ষণ ধনুকের মতো পিঠ বেঁকিয়ে হরি চুপটি ক'রে বসেছিল। সউদার কথায় ঘাড় নেড়ে বলে ওঠে : 'ঠিক বলেছ সাহেব।'

সউদা আবার বলতে শুরু করে : 'এই যে-ঘরে তোমরা বাস করছ, ভালো ক'রে এটাকে দেখেছ কোন দিন ? এটা কি ঘর ? হাজারে হাজারে তোমরা এমনি গর্তে রাতের-পর-রাত, দিনের-পর-দিন কাটিয়ে দিচ্ছ···কিন্তু এইভাবে কতদিন মানুষ বেঁচে থাকতে পারে ? বড় জোর আর ছ'মাস···তারপর অথর্ব পঙ্গু হয়ে যে-যার দেশে ফিরে যাবে, মরবার জন্যে ! আর তোমাদের ছেলে-মেয়েরা যারা এখানে পড়ে থাকবে, এক আনা পয়সা রোজগার করতে তারা সারাটি দিন মাথার ঘাম পায়ে ফেলবে···বয়স হবে তাদের, অথচ বাড়বে না···

যত দিন যাবে, ততই যেন তারা শুকিয়ে ছোট হয়ে আসবে। আর কবে চেতনা হবে তোমাদের? কবে আর জাগবে তোমরা?'

সউদার কথার মধ্যে যে আঘাতটুকু ছিল, পাছে তাতে এরা ক্ষুণ্ণ হয়ে ওঠে, সেই জন্য মুজাফর কথাটা অন্যভাবে বোঝাতে চেষ্টা করে: 'সাহেবের কথা শুনে তোমরা রাগ করো না, সাহেবকে ভুল বুঝো না! সাহেব তোমাদের ভালোবাসে বলেই তোমাদের এভাবে বলতে পারে। তোমাদের সাহেবকেও একদিন দুঃখ-কষ্ট পেতে হয়েছে, সাহেবের ইচ্ছে, যে-ভাবে তিনি চেষ্টা ক'রে সেই সব দুঃখ সহ্য করতে পেরেছেন, তোমরাও সেইভাবে দুঃখকষ্টের হাত থেকে উদ্ধার পাও।'

জ্যাকসন বলে ওঠে: 'তোমাদের ছেলেমেয়েদের জন্য উনি স্কুল ক'রে দেবেন!'

সউদা বাধা দিয়ে বলে: 'স্কুল কেন, তার চেয়েও বেশী যা দরকার তা হচ্ছে খাদ্য। তোমাদের দরকার, দু'বেলা পেট ভরে খেতে পাওয়া। তোমাদের হাত থেকেই এই সব কলে তুলো থেকে সুতো বেরোয়, কাপড় তৈরি হয়। দেশে তোমাদের আপন জন মাঠে-ঘাটে তুলোর চাষ করে। তোমরাই বন সাফ ক'রে পথ বার করছ…খনি থেকে মণি তুলছ, জঙ্গলে সোনা ফলাচ্ছ। আর তোমাদের মালিক বড় সাহেব, তোমাদের কাছ থেকে তোমাদের উৎপন্ন সব জিনিস আদায় ক'রে নিয়ে বিলেতে পাঠিয়ে দিচ্ছে। তার বদলে তোমাদের মজুরী যা দিচ্ছে, তা' দিয়ে তোমাদের খেতে-পরতেই কুলোয় না…ঘর ভাড়া, দেনাশোধ তো দূরের কথা! তোমরা প্রত্যেকেই তোমাদের মেয়াদ মতো বুকের রক্ত হিম ক'রে খাট, কাজ ছেড়ে যখন দেশে ফিরে যাও, তখন শুধু মরার মতো শক্তিটুকুই পড়ে থাকে। তোমাদের শূন্য জায়গায় আবার নতুন লোক আসে… আবার চলে সেই ব্যাপার। তার মধ্যে যদি এল কলেরা, দলকে-দল উজাড় ক'রে নিয়ে চলে গেল। তাই জিজ্ঞেস করছি, বল, তোমরা চাও, এইভাবে তোমাদের মালিকরা তোমাদের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলুক?'

রতন বিহ্বলের মতো বলে: 'না…কখ্খনোই নয়…ভগবানের দোহাই দিয়ে বলছি, কখ্খনোই নয়!'

একজন কুলি তাদের ঘরে বেড়াতে এসেছিল। সে জিজ্ঞেস ক'রে উঠল: 'আমরা কি করতে পারি সাহেব! তোমরা লেখা-পড়া জানা লোক…সাহেবদের

মতোই···সেই জন্যে তোমরা অন্য সাহেবের সঙ্গে লড়তে পারো···কিন্তু আমরা কে ? কি সাহসে আমরা প্রতিবাদ করব ?'

উত্তেজিতকণ্ঠে সউদা জবাব দেয় : 'কি সাহসে আবার ! তোমরাও মানুষ···সেই তোমাদের সব চেয়ে বড় দাবী। নিজেদের ইজ্জৎ ভুলে গেলে চলবে কেন ? কেউ যদি তোমার মাথা থেকে পাগড়ী টেনে নিয়ে ফেলে দেয়, তুমি তাতে প্রতিবাদ করবে না ?'

উত্তেজিত সাহেবের মুখের দিকে চেয়ে কুলিটি নির্বিকার ভাবে উত্তর দেয় : 'না !'

সউদা ক্ষিপ্ত হয়ে বলে উঠে : 'তাহ'লে বলব তোমার ইজ্জৎ নেই ! মান-অপমানের জ্ঞান নেই···মনুষ্যত্ব নেই !'

রতন বুকে হাত দিয়ে বলে ওঠে : 'আমি কিন্তু মরদের বাচ্চা !'

'তাই তোমার চাকরি আগে গেল'—হেসে ওঠে মুন্নু।

হঠাৎ মুন্নুর সেই ব্যঙ্গ-উক্তিতে সকলেই হেসে ওঠে। ঘরের মধ্যে যে-উত্তেজনা জমা হয়ে উঠেছিল, তা' যেন একটু হালকা হয়ে যায়।

ঘাড় দুলিয়ে অনেক ভেবেচিন্তে হরি বলে : 'আমাদের কিন্তু কাজ করতেই হবে···চিমটা সাহেবের কাছে না হোক, অন্য কারুর কাছে !'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, কাজ তো করতেই হবে। কাজ করা তো ভালো ! কিন্তু এগারো ঘণ্টা রক্ত জল ক'রে যদি তার উপযুক্ত মাইনে না পাও ? আমি যা বলি, সেই রকম যদি চলো, তাহ'লে আমি বলছি, যে তোমাদের খাটুনির মেয়াদ কমে যাবে এবং মাইনেও বাড়বে !'

হরি জিজ্ঞেস করে : 'কি করতে হবে শুনি ?'

সউদা বলে : 'তোমরা একসঙ্গে সকলে মিলে কাজ ছেড়ে দিয়ে মিল থেকে বেরিয়ে পড়ো। যতক্ষণ না তোমাদের মাইনে বাড়ে, খাটুনির ঘণ্টা না কমে, যতক্ষণ না তোমাদের ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শেখানোর কোন ব্যবস্থা হয়, তোমাদের থাকবার উপযুক্ত ঘর-দোর দেয়, ততক্ষণ তোমাদের কাজ ছেড়ে দলবন্ধ হয়ে থাকতে হবে !'

জ্যাকসন সংক্ষেপে সেই কথাটাই বলে : 'অর্থাৎ তোমাদের ধর্মঘট করতে হবে !'

রতন তৎক্ষণাৎ জানায় : 'আমি রাজী।'

মনুমনু তাকে খেপায় : 'তুমি তো সকলের আগেই ধর্মঘট ক'রে আছো।'

ঘরে আর যে-সব কুলি ছিল, তারা চুপচাপ বসে থাকে। সউদার প্রত্যেক কথাটি যে সত্য, তা তারা মনে-প্রাণে বুঝতে পারে কিন্তু তাদের ভাবনা, ধর্মঘটের মধ্যে তারা খাবে কি? তাদের ছেলে-পুলেরা কি ক'রে উপোস দিয়ে থাকবে? এ প্রশ্নের কোন সদুত্তর তারা খুঁজে পায় না…খুঁজতে গিয়ে তারা আতঙ্কিত হয়ে ওঠে। তাই মাথা নিচু ক'রে তারা নীরবে বসে থাকে।

মজাফর বুঝতে পারে। শান্তভাবে তাদের শেষ-আবেদন ক'রে বলে :

'বেশ ভালো ক'রে তোমরা ভেবে দেখ। ইতিমধ্যে রতন, তুমি বরঞ্চ কাল আমাদের সঙ্গে একবার দেখা কোরো, তোমায় সম্বন্ধে কি করতে পারি দেখব'খন।'

কুলিরা উঠে দাঁড়িয়ে সেলাম জানায়।

কম্যানিস্ট তিনজন সিঁড়ি দিয়ে নামতে শুরু করে।

'সালাম, সালাম, সালাম…'

মনুমনুর অন্তরে অব্যক্ত এক মহাচাঞ্চল্য জেগে ওঠে…

সউদা মুজাফর এবং জ্যাকসন রতনের জন্যে অল ইণ্ডিয়া ট্রেড-য়ুনিয়ন কাউন্সিলের প্রেসিডেণ্টকে ধরাধরি ক'রে স্যার জর্জ হোয়াইট মিলের কর্তৃপক্ষের কাছে একটা আবেদন পাঠাবার বন্দোবস্ত করল। আবেদনে লেখা হলো, যাতে রতনকে আবার কাজে বহাল করা হয়।

মিলের সাহেবদের সেক্রেটারী মিঃ লিটলের কাছে সেই আবেদন-পত্র গিয়ে পৌঁছল। কিন্তু অফিসের বিরাট দফতরের চাপে এক কোণেই তা পড়ে রইল। মিঃ লিটল জরুরী কাগজ-পত্রে আগে হাত দিলেন, জরুরী বলতে সর্বপ্রথম বোঝায়, স্যার জর্জ হোয়াইটের নিজস্ব ফাইল।

স্বভাবতই মিঃ লিটল একটু অসহিষ্ণু প্রকৃতির লোক ছিলেন। তার ওপর বোম্বের চাপা গরমে সর্বদাই তাঁর মুখমণ্ডল ঘেমে নেয়ে উঠত…তাতে সাহেবের অসহিষ্ণুতা এবং সেই সঙ্গে রাগের মাত্রাও বেড়ে যেত।

ফাইলগুলো টেনে নিয়ে তিনি হেঁকে উঠলেন : 'স্কুওয়ালা!'

সঙ্গে সঙ্গে দরজা ঠেলে একজন অল্পবয়স্ক দেশী কেরানী ঘরে ঢুকল। পরনে

সস্তাদামের সাদা বিলাতী পোশাক কিন্তু মাথায় কালো রঙের দেশী টুপী। বিলাতী পোশাক পরার অপরাধ যেন জাতীয় পোশাকের প্রতীক টুপিটুকু পরে কাটান দেওয়া হয়েছে।

ঘরে ঢোকবার সময় তার মুখের চেহারা দেখলেই যে কেউ বুঝতে পারবে যে, সাহেবের সামনে আসতে তার ভয় করছে। একবার হর্নবি রোডের মোড়ে এক সাহেবের পুরস্কারস্বরূপ অযাচিত পদাঘাত পাবার সৌভাগ্য তার ঘটেছিল। বেচারার অপরাধ, কৌতূহলবশতঃ সাহেবের মুখের দিকে একদৃষ্টিতে চেয়েছিল। সেই থেকে কোন সাহেবের সামনে যেতেই তার ভয় করে।

ভীত সন্ত্রস্ত মুখে টেবিলের সামনে এসে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

মিঃ লিটল ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে: 'মাই গড্! ভূতের মতো দাঁড়িয়ে থেকে আমার যন্ত্রণা বাড়াতে কে বলেছে তোমাকে? বোসো!'

'ইয়া স্যার,' বলেই ধপ্ ক'রে সামনের চেয়ারে বসে পড়ে।

'লেখো···'

সর্ট-হাণ্ডের খাতাপত্রগুলো ঠিক ক'রে নিতে একটু সময় লাগে, সাহেব অধীর হয়ে ওঠে: 'তুমি ঘুমিয়ে পড়লে নাকি?'

'না স্যার!'

'নাও, আরম্ভ করো, ওপরে লেখ, নোটিশ···বানান হলো—'

ঠিক সেই সময়ে একটা বেরসিক মাছি সাহেবের নাকের ডগার ওপর এসে বসে। সাহেব হাত দিয়ে সরিতে দিয়ে সেই কথা বলবার জন্যে মুখ হাঁ করবে, মাছিটি অমনি আবার ফিরে এসে ঠিক জায়গায় বসে।

সাহেব চিৎকার ক'রে ওঠে: 'লালকাকা—!'

'হুজুর'···বলতে বলতে পর্দার ওপার থেকে অফিসের পার্সী "বয়" ঘরে ঢুকে সেলাম ক'রে দাঁড়ায়।

বালক ভৃত্যের হাতে একটা ছড়ি দিয়ে সায়েব হুকুম দেয়: 'ঘরেতে যেখানে মাছি বসতে দেখবি, এই ছড়ি দিয়ে মেরে ফেলবি!'

'জী হুজুর!' লালকাকা যেন একটা মহৎ কাজের দায়িত্ব পেল···আনন্দে সাহেবের হাত থেকে ছড়িটা নিয়ে নিল।

'নাও, স্কুওয়ালা, এবার লেখো'

স্ক্রুওয়ালা পেনসিল নিয়ে লিখে চলে, সাহেব ধীরে স্থিরভাবে বলতে থাকেঃ—

'বর্তমান বিশ্বব্যাপী বাণিজ্যে মন্দা এবং মুদ্রা সংকটের দরুন, মিলের ডিরেক্টর মহোদয়গণ অতঃপর স্থির করিয়াছেন যে যাহাতে মিলের যন্ত্র না থামিয়া চলিতে থাকে, সেইজন্য মিল এখন হইতে কম সময় চলিবে এবং অবস্থা অনুযায়ী মিলের খরচও কমাইতে হইবে। সুতরাং অন্য নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত এখন হইতে প্রত্যেক মাসের চতুর্থ সপ্তাহ কাজ বন্ধ থাকিবে। যে-সপ্তাহ মিল বন্ধ থাকিবে, সে-সপ্তাহের মাহিনা কুলিরা পাইবে না। কিন্তু মিলের কর্মীদের মঙ্গলচিন্তা কর্তৃপক্ষের সর্বদাই স্মরণে আছে, সেইজন্য তাহাদের যথোপযুক্ত ভাতা দিবার বন্দোবস্ত করা হইবে। ১০ই মে হইতে এই আদেশ কার্যকরী হইবে।

(স্বাক্ষর) স্যার রেজিন্যাল্ড হোয়াইট, বার্ট,
প্রেসিডেন্ট, স্যার জর্জ হোয়াইট মিলস।'

ঠিকমতো লেখা হলো কি না, স্ক্রুওয়ালা যেই পড়ে শোনাতে যাবে, অমনি আবার সেই মাছিটি এবার সাহেবের বিস্তৃত কপালের ওপর এসে বসল। সাহেব বিরক্ত হ'য়ে ভ্রূকুটি বিস্তার ক'রে লালকাকার দিকে চাইলেন।

লালকাকা মাছিটাকে আক্রমণ ক'রবে কি না একটু ইতস্তত করছিল কিন্তু সাহেবের ভ্রূকুটি-ইঙ্গিতে তার সে-দ্বিধা দূর হয়ে গেল। ছড়িটা তুলে সোজা সাহেবের কপালে বসিয়ে দিল।

'ড্যাম ফুল্! ব্ল্যাডি রাস্কেল'···সাহেব গর্জন করতে করতে চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠল। একহাতে কপাল ঘষতে ঘষতে, আর-এক হাতে শূন্যে আস্ফালন ক'রে সাহেব লালকাকাকে তার কর্তব্যপরায়ণতার পুরস্কার দেবার জন্যে সবুট পা তুলতেই টেবিলের ওপর টেলিফোনটা জোরে বেজে উঠল···

সাহেবকে অন্য কাজে ব্যস্ত দেখে স্ক্রুওয়ালা রিসিভারটা তুলেছিল বটে, কিন্তু সাহেব উদ্যত-পা নামিয়ে এক ঝটকা মেরে হাত থেকে রিসিভারটা কেড়ে নিয়ে কানে লাগাল—'হ্যালো···হ্যালো···ও···স্যার রেজিন্যাল্ড···গুড মর্নিং স্যার··· নিশ্চয়ই···নিশ্চয়ই···এইমাত্র সর্টহ্যান্ডে লেখালাম···হ্যাঁ স্যার···জিমিকে ডেকে তার হাতেই দিয়ে দেবো···নিশ্চয়ই স্যার···কখন স্যার? লাঞ্চের আগে? আমি থাকব স্যার···নিশ্চয়ই স্যার···গুড মর্নিং স্যার···গুড মর্নিং···'

লালকাকা তখন ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ছিল। রিসিভার

নামিয়ে রেখে সাহেব আদেশ করল : 'শুয়োর-কা-বাচ্চা, জলদি জিমি সাহেবকে সেলাম দাও।'

লালকাকা ছুটে গিয়ে তৎক্ষণাৎ জিমি সাহেবকে ডেকে নিয়ে আসে।

'হ্যালো জিমি, সামনের হপ্তা থেকে মিলে কমতি-রোজ শুরু হবে!'

জিমি সাহেব আনন্দে বলে উঠল : 'মরলো ব্যাটা নিগারগুলো! ঠিক হয়েছে! একটা পেগ খেতে ইচ্ছে করছে!'

'ঐ ড্রয়ারটা টানো—হুইস্কীর বোতল আছে···আমারও তেষ্টা পাচ্ছে··· গলাটা অনেকক্ষণ থেকে কাঠ হয়ে আছে!'

বোতল থেকে গেলাসে ঢালতে ঢালতে জিমি সাহেবের নজর শঙ্কুওয়ালার ওপর গিয়ে পড়তে জিজ্ঞেস করে : 'কি ব্যাপার?'

'সেই নোটিশটাই লিখছে—' জবাব দেয় মিঃ লিটল।

একটা গেলাস আধাআধি নির্জলা হুইস্কী দিয়ে ভর্তি ক'রে জিমি লিটলের সামনে তুলে ধরে : 'এই নাও!'

লিটল গেলাসটা তুলে নিতে নিতে জিমিকে সাবধান ক'রে দেবার জন্যে জানায় : 'কিন্তু সাবধান! বেশী নয়! রেজী লাঞ্চের আগে এখানে আসছে!'

'তাতে তুমি মরবে···আমার কি? আমাকে তো আর খাতা সাজিয়ে হিসেব বোঝাতে হবে না?'

সে-কথার কোন জবাব না দিয়ে লিটল নোটিশটার কথা তোলে : 'দেখো, সাহেব চলে গেলে নোটিশটা কুলিদের জানিয়ে দেবে। ব্যাটাদের দলে কতকগুলো হুজুগে বদমায়েশ আছে তো?'

'কতকগুলো নয়···একটা···সেটাকেও আমি ঘাড় ধরে বার ক'রে দিয়েছি! ব্যাটা লাল-ঝাণ্ডাদের উস্কানিতে বড় বাড়াবাড়ি শুরু ক'রে দিয়েছিল। তবে লোকটা কাজের লোক ছিল, কিন্তু তা ব'লে তো কারখানার মধ্যে বিপ্লবী পুষতে পারি না।'

'আরে দাঁড়াও, বোধ হয় সেই লোকটার সম্বন্ধে ট্রেড য়ুনিয়নের কাছ থেকে একটা আবেদন পেয়েছি। ওরা বলেছে, লোকটাকে আবার কাজে বহাল ক'রে নেবার জন্যে। ব্যাপারটা কি বলতো? এই সব পাজী নচ্ছারগুলোই

তো চারদিকে অসন্তোষ ছড়িয়ে বেড়াচ্ছে…সত্যি, আমি ভেবে পাই না, গভর্ন-মেণ্ট চুপ ক'রে বসে আছে কেন ?' বিস্ময়ে প্রশ্ন করে লিটল।

পাত্রে এক চুমুক দিয়ে জিমি বলে : 'আর ওদের মধ্যে আবার দুটো দল হয়ে গিয়েছে। একটা হলো ট্রেড য়ুনিয়ন ফেডারেশন, তার কর্তা হলো ওঙ্কার-নাথ। আর একটা হলো রেড-ফ্ল্যাগ য়ুনিয়ন, সেটা সম্প্রতি মাঞ্চেস্টার থেকে জ্যাকসন বলে কে একটা লোক এসে গড়ে তুলেছে।'

লিটল সাহেব ক্রুদ্ধ গর্জনে ফেটে পড়ে : 'সব ব্যাটাদের ধরে নিয়ে গিয়ে দেয়ালের সামনে সারি সারি দাঁড় করিয়ে গুলি ক'রে মেরে ফেলা উচিত।'

এমন সময় বাইরে মোটর গাড়ির হর্নের চিৎকারে লিটল সাহেবের উচ্ছ্বাস বন্ধ হয়ে যায়। তাড়াতাড়ি চেয়ার ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে পড়ে। বোতল এবং গেলাস ড্রয়ারের ভেতর লুকিয়ে ফেলে জিমি সাহেবও পর্দা সরিয়ে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ায়।

'এই যে গুড মর্নিং লিটল, গুড মর্নিং জিমি,—' স্যার রেজিন্যাল্ড এগিয়ে এসে ঘরে ঢোকেন।

'নোটিশটা দেওয়া হয়েছে ?'

জিমি উত্তর দেয় : 'না স্যার, এখনো দিই নি…'

স্যার রেজিন্যাল্ডের শব্দ শুনে জিমি সাহেবের মেম সামনের বাংলোর বারান্দার এসে দাঁড়িয়েছিল। স্যার রেজিন্যাল্ডকে কারখানায় দেখার সৌভাগ্য তো খুব বেশী ঘটে না।

জিমির দিকে চেয়ে হেসে স্যার রেজিন্যাল্ড বলে ওঠেন : 'জিমি তোমার বউকে বলো, আমি বলেছি, বারান্দায় দাঁড়াবার সময় সে যেন জামা-কাপড় আর-একটু বেশী ব্যবহার ক'রে !'

জিমি লজ্জায় লাল হ'য়ে ওঠে…কটকট ক'রে একবার বাংলোর দিকে চায়…তারপর শান্তদৃষ্টিতে স্যার রেজিন্যাল্ডের দিকে চেয়ে স্ত্রীর ক্ষীণ-বস্ত্রের ত্রুটির জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করে।

স্যার রেজিন্যাল্ড কাজের কথা পাড়েন : 'হাঁ…এই সম্পর্কে বলছিলুম…ডিরেক্টররা হোম থেকে যা খবর পাচ্ছেন, তাতে খুব খুশী হবার কিছু নেই। তা' ছাড়া, শুধু এই মিলের দরুন নয়, কলকাতা এবং মাদ্রাজে যে-সব মিল

আছে, তাদের শেয়ার-হোল্ডারদের মুখের দিকে চেয়ে আমাকে বাধ্য হয়েই এই পন্থা নিতে হলো। আমাদের অবস্থা এখন ঠিক কি তা জানাবার জন্যে হোম থেকে এবং ক্লাইভ স্ট্রীট থেকেও জরুরী তারে খবর আনবার ব্যবস্থা করেছি···যদি এই রকম দুর্দিন···'

লিটল সাহেব বাধা দিয়ে বলে ওঠেঃ 'এখানকার হিসেবপত্র অডিটররা এখন দেখছেন···তবে আমার মনে হয়, এখানে আমাদের অবস্থা ভালোই। গত মাসে যা অর্ডার পেয়েছি, তা ভালোই বলতে হবে। কিন্তু বাইরের প্রতিযোগিতা বেড়ে গিয়েছে বলেই···'

'এ সম্বন্ধে একটা ডেলিগেশন নিয়ে আমি ভাইসরয়ের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি···দেখি কতদূর কি করতে পারি। এখন আমাদের যা অবস্থা হয়েছে··· তাতে তুলো আর মিলের কারবারে ভারতীয়েরা প্রায় শতকরা ৭৫ ভাগ দখল ক'রে নিতে চলেছে···যাই হোক্···এখন আর আমার বেশী সময় নেই···লিটল, তুমি শিগগির হিসেবটা আমাকে পাঠিয়ে দেবে···গুড বাই!'

সাহেব গাড়িতে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে জিমি সাহেব কুলিদের ডেকে নোটিশের খবর জানিয়ে দেয়। কুলিদের মাথায় বাজ ভেঙে পড়ে। তারা দেখে বড় সাহেবের ডিমলার গাড়িখানা ফটক দিয়ে এই মাত্র বেরিয়ে গেল···নইলে মিলে বড় সাহেবের পায়ে লুটিয়ে পড়ত। কিন্তু যখন তার আর কোন সম্ভাবনা নেই, তখন তারা দল বেঁধে জিমি সাহেবের পায়ে লুটিয়ে পড়বার জন্যেই অগ্রসর হয়।

জিমি সরে দাঁড়িয়ে জানিয়ে দেয়ঃ 'যদি ঐ নোংরা হাত দিয়ে তারা পা ছুঁতে আসে, তাহ'লে লাথি মেরে সে মাথা গুঁড়ো ক'রে দেবে!'

কিন্তু তবুও তারা ফিরে যায় না। হাত জোড় ক'রে সবাই মিলে একসঙ্গে তারা কেঁদে ওঠে, কাতরভাবে অনুনয় করে, সাহেবের সামনে মাটিতে সারা দেহ লুটিয়ে দেয়। তারা বড় সাহেবকে জানে না, তারা জানে জিমি সাহেবই তাদের দেবতা, তাদের হর্তাকর্তাবিধাতা। তাদের মারতে বা বাঁচাতে সেই পারে।

বেগতিক দেখে চিমটা সাহেব বাংলোর ভিতর ঢুকে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে নাদির খাঁন এসে ছত্রভঙ্গ ক'রে দেয়।

শেয়ার-হোল্ডার, বড় সাহেব, ডিরেক্টর, এসব ব্যাপার মুন্নু কিছুই জানত

না। তার মানে হলো, রতনকে ছাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে বলেই, এত সব গণ্ডগোল। তাই নিজেই সহজ বুদ্ধিতে সে ঠিক করল, সে নিজে গিয়ে চিমটা সাহেবকে ধরবে, পা ধরে অনুরোধ করবে, রতনকে ফিরিয়ে নাও কাজে।

মনে মনে এই স্থির ক'রে কাউকে কিছু না জানিয়ে সে চিমটা সাহেবের বাংলোর দিকে অগ্রসর হলো।

বারান্দার সিঁড়ি দিয়ে ওঠবার সময় তার বুকের ভেতর কাঁপুনি যেন শতগুণ বেড়ে যায়। এমন সময় দেখে, বারান্দার সামনে ঘরে পর্দা সরিয়ে মেমসাহেব। —নিশ্চয়ই চিমটা সাহেবের স্ত্রী।

কপালে হাত ঠেকিয়ে কম্পিত কণ্ঠে মুন্নু বলে: 'সালাম!'

মেমসাহেব মৃদুকণ্ঠে প্রত্যুত্তরে সেলাম জানায়। ঘরের ভেতর জিমি সাহেব তখন বোতল থেকে গেলাসে মদ ঢালছিল। পর্দা সরিয়ে মেমসাহেব নিম্নকণ্ঠে বলে ওঠে: 'ঘরে বসে বসে মদ খেয়ে মাতাল হচ্ছো, আর বাইরে যে তোমার কুলিরা…'

জিমি সাহেব আর কোন কথা শোনার জন্যে অপেক্ষা না ক'রে হাতের বোতলটা সোজা বাইরে মুন্নুর দিকে সজোরে ছুঁড়ে মারে। মেমসাহেবের কথায় সে ধরে নিয়েছিল যে, কুলিরা তার ওপর চটে গিয়ে বাংলোয় ধাওয়া করেছে… নিশ্চয়ই তাকে খুন করবে…

জিমি সাহেবের বোতল সৌভাগ্যবশতঃ মুন্নুর গায়ে না-লেগে থামে সশব্দে ফেটে যায়।

মেমসাহেব কি হচ্ছে, না-হচ্ছে, বুঝতে না পেরে তারস্বরে চিৎকার ক'রে ওঠে: 'খুন! খুন! পুলিশ!'

জিমি সাহেব যখন বুঝল, মাঝখান থেকে তার বোতলটাই নষ্ট হয়ে গিয়েছে, তার সব রাগ গিয়ে পড়ল মেমসাহেবের ওপর। রাগে অন্ধ হয়ে মেমসাহেবকে শিক্ষা দেবার জন্যে মুষ্টিবদ্ধ হাত তুলে জিমি সাহেব অগ্রসর হয়…আত্মরক্ষার স্বাভাবিক প্রেরণায় মেমসাহেব সামনের একটা চায়ের কেটলী তুলে নিয়ে সজোরে স্বামীকে লক্ষ্য ক'রে ছোঁড়ে…

অবস্থা দেখে মুন্নু নিঃশব্দে সরে পড়ে।

। চোদ্দ ।

সেদিন বিকেল বেলা স্যার জর্জ হোয়াইট মিলের কুলিরা মিলের সামনের মাঠ দিয়ে ভূতের মতোন যে-যার গর্তে ফিরে এল।

হঠাৎ সেই নোটিশের ধাক্কায় তারা একদম অসাড় হয়ে গিয়েছিল। জীবনে তাদের একটি মাত্র সৌভাগ্য আছে, সে-সৌভাগ্য হলো, হ্যাঁ, কাজ করা··· কাজ করলে, তারা তবে মাইনে পাবে···কাজ না-করলে, উপবাসে শুকিয়ে মরতে হবে। তাই সে-সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হলে, তাদেরর জীবনে আর-কিছু অবশিষ্ট থাকে না। তাই কাজ করতে তাদের এতটুকু অলসতা নেই। গুদাম-ভর্তি তুলোর আঁশ ছাড়াতে, পরিষ্কার করতে করতে তুলোর আঁশে যদি নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যায়, তাতেও তারা কিছু মনে করে না। সেই তুলো থেকে সুতো তৈরি করতে, মেশিনের সঙ্গে মেশিন হয়ে যেতে, যদি তাদের জীবন থেকে সব সূর্যের আলো মুছে যায়, তাতেও তাদের কোন আপত্তি নেই। যতক্ষণ তারা হাত পাতলে মাইনে পাবে, যা দিয়ে তারা দু'মুঠো ডাল-ভাত খেতে পায়, ততক্ষণ তারা সব কিছুই করতে পারে। কিন্তু সেই কাজ যদি বন্ধ ক'রে দেওয়া হয়···!

সেই চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে তাদের মধ্যে জীবনের যেটুকু আঁচ তখনও পর্যন্ত বেঁচে ছিল, হঠাৎ যেন তা নিভে গেল। সেই মুহূর্তে তাদের দেখলে মনে হয় না যে তারা মানুষের জাত। তারা যেন অন্য কোন স্বতন্ত্র জীব-জগতের বাসিন্দা···ম্লান চোখে দৃষ্টি···সে-চোখ কোটরে কোথায় ঢুকে গিয়েছে···দু'ধারে গাল তুবড়ে গর্ত হয়ে গিয়েছে···বুকের পাঁজরা চামড়া ফুঁড়ে বেরিয়ে আসছে··· শুকনো···ম্লান···শূন্য। বেদনারও সীমা ছাড়িয়ে তারা যেখানে গিয়ে দাঁড়িয়েছে, সেখানে তারা সম্পূর্ণ নিশ্চেষ্ট, উদাসীন···কোন কিছু ভাববার শক্তিও তাদের আর নেই।

মুমু ফিরে গিয়ে রতনকে বলে : চিমটা সাহেবের কাছে গিয়েছিলাম··· তোমার হয়ে বলব ব'লে···রেগে আমাকে বোতল ছুঁড়েই মেরে দিল···তোমার ওপর এত রেগে গিয়েছে যে, আমাদের সকলের কমতি-রোজ করে দিল!'

রতন তাকে বুঝিয়ে বলে : 'বোকা আমার ওপর···রাগের জন্যে নয়···আর হুকুম দেবার সেই বা কে ? আমাদের কমতি-রোজ হয়েছে বড় সাহেবের হুকুমে ···জালার মতো পেটে খিদের অন্ত নেই যার! আমায় সঙ্গে মিটিং-এ চল্··· সেখানে সব কুলিরা যাবে···সেখানে গেল সব বুঝতে পারবি! ট্রেড য়ুনিয়ন থেকে ধর্মঘটের ব্যবস্থা করা হচ্ছে!'

মুন্নু বিস্মিত হয়ে বলে ওঠে : 'তা' হলে আমার অন্যায় হয়েছে···চিমটা সাহেবকে মিছিমিছি আমি দোষী···'

রতন বাধা দিয়ে চিৎকার ক'রে ওঠে : 'মিছিমিছি নয়···সে আসল বদমায়েশ···দেখবি কি ক'রে তার মাথা আমি গুঁড়িয়ে ফেলি···শুধু তার নয়··· ঐ বড় সাহেবেরও···মোটর গাড়ি ক'রে এসে আমাদের মাইনে কেটে নেওয়া আমি দেখে নেবো!'

॥ পনের ॥

বাংলো বাড়ির পেছনে মস্ত বড় যে মাঠটা পড়েছিল, সেইখানে দলে দলে কুলিরা এসে জড় হতে লাগল।

সেই বিরাট জনতার মধ্যে থেকে মাঝে মাঝে হঠাৎ সমবেতকণ্ঠে ফরিয়াদ জেগে ওঠে···হঠাও য়ুনিয়ন জ্যাক···উড়াও লাল-ঝাণ্ডা! আবার তৎক্ষণাৎ সব নিস্তব্ধ হয়ে যায়···সন্ধ্যার সময় ঘন-বনে হঠাৎ যেমন ঝিঁঝিঁ ডেকে উঠে থেমে যায়।

বহুদিন ধরে তিল তিল ক'রে তাদের অন্তরে যে ঘৃণা আর প্রতিহিংসার বাসনা নিষ্ক্রিয়ভাবে জমা হয়েছিল, সেই উন্মাদ চিৎকারে তাকে মুক্তি দিয়ে তারা যেন তার লাঘব করে···নিরুদ্ধ জ্বালার উত্তাপে তাদের চোখ-মুখ রক্তিম হয়ে ওঠে :

'এ যুগের বাতাসে আছে পাশ!'—দীর্ঘশ্বাস ফেলে এক বৃদ্ধ কারিগর বলে, যেন তার বুকের পাঁজরার ওপর থেকে সেই কথাগুলো বেরিয়ে এল।

একজন আধাবয়সী কুলি বৃদ্ধকে সমর্থন করে : 'সত্যিই দাদা! এর মধ্যে আমরা বাঁচি কি ক'রে ?'

ছোকরা মতোন একজন উত্তর দেয় : 'বাঁচবার একমাত্র উপায় হচ্ছে, প্রতিবাদ করা…'

বৃদ্ধ ঘাড় নেড়ে বলে : 'আজকালক রছেলে-ছোঁড়া কাউকে মানতে চায় না!'

প্রত্যুত্তরে যুবক বৃদ্ধকে বোঝাতে চেষ্টা করে : 'দাদু, রোজ সকাল বেলা আমি তোমাকে পেন্নাম করি কিনা বলো…কিন্তু তা বলে মোটর-ওয়ালা বড় সাহেবের সামনে আমি ভূমিষ্ঠ হতে পারব না। তিনি তো মজায় মোটর গাড়িতে চড়ে, কারখানা বেড়াতে আসেন…আমাকে রোদে পুড়ে ধুলো মেখে পায়ে হেঁটে আসতে হয়…তার ওপর তিনি কাজের মধ্যে করলেন কি? না, আমাদের রোজ কেটে নিলেন।'

প্রৌঢ় লোকটি সায় দিয়ে ওঠে : 'তা যা বলেছ ভায়া…মুনিব সুবিধের নয়। আমার বাচ্চাগুলোর কারুর পায়ে জুতো বলতে কিছু নেই…সেদিন ছোট ছেলেটার পা কেটে গেল…ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেলুম…বলে কি না কেটে ফেলতে হবে!'

তার শোকোচ্ছ্বাসে বাধা দিয়ে যুবকটি বিদ্রূপ ক'রে ওঠে : 'সাহেবদের ধারণা আমাদের কোনমতে এক মুঠো জুটলেই হয়ে গেল…আর ওরা গ্যাট্ মিট গ্যাট্ মিট করতে করতে লেডীদের নিয়ে মোটর চড়বেন…শালা!'

কিন্তু পরক্ষণেই গম্ভীর হয়ে জোর গলায় চিৎকার ক'রে বলে ওঠে : 'কিন্তু আমরা য়ুনিয়নের লোক…আমরা জানতে চাই, আমাদের জন্যে য়ুনিয়ন কি করছে?'

দেখতে দেখতে তার প্রশ্ন এককণ্ঠ থেকে আর-এককণ্ঠে ঘুরতে থাকে।

'আমরা জানতে চাই…য়ুনিয়ন কি করেছে?' সমবেতকণ্ঠে য়ুনিয়নের একদল পুরনো সভ্য চিৎকার ক'রে উঠল।

হঠাৎ রতন একটা টেবিলের ওপর ওঠে দাঁড়ায় : 'চুপ করো ভাই সব চুপ করো! আমাদের প্রেসিডেণ্ট ওঙ্কারনাথ এই বার বলবেন…তার পর লাল-ঝাণ্ডা-দলের সউদা সাহেব, মিস্টার মুজাফর আর জ্যাকসন সাহেব বলবেন… আসুন প্রেসিডেণ্ট সাহেব…আসুন'—নাটকীয় ভঙ্গীতে হাত বিস্তার ক'রে দীপ্ত মুখে সে ওঙ্কারনাথকে আহবান করে।

মন্নু কাছেই দাঁড়িয়েছিল। উৎসাহে উদ্দীপ্ত হয়ে সে-ও বলে ওঠে : 'আসুন প্রেসিডেণ্ট সাহেব আসুন…'

জনতা একসঙ্গে চিৎকার ক'রে উঠল : 'প্রেসিডেণ্ট সাহেব বলুন!'

লালা ওংকারনাথ ধীর-মন্থর-গতিতে মঞ্চের দিকে অগ্রসর হলেন। ধোপ-দুরস্ত চেহারা, আপাদমস্তক দেশী সিল্কে সুসজ্জিত। বয়স চল্লিসের বেশী হবে না, কিন্তু ইতিমধ্যেই কানের ওপরে মাথার দুপাশে দু একটি ক'রে শ্বেতপতাকা দেখা দিয়েছে। অধর ওষ্ঠটি সর্বদাই কোণের দিকে এক অপরূপ তাচ্ছিল্যের ভঙ্গীতে বেঁকে আছে…যেন সেই নীরব ইঙ্গিতে তিনি বুঝিয়ে দিতে চান, জগতে তিনি ছাড়া আর সবাই করুণার পাত্র। ক্ষুরচাঁচা পরিষ্কার মুখে বিলেত যাওয়ার আভিজাত্যের ছাপ এখনও স্পষ্ট দেখা যায়। বিলেত থেকে ফিরে এসে এই হতভাগ্য দেশের মাটিতে পা-দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি নিজেকে ঘোরতর সোসালিস্ট বলে জাহির করেন—আশা ছিল, হয়তো গান্ধীজী তাঁকে হাত ক'রবেন, না হয় গভর্নমেণ্ট ভয় পেয়ে তাঁকে নিয়ে নেবার চেষ্টা করবে। কিন্তু কিছুদিন পরেই মনে মনে বুঝলেন, তীরটা ঠিক জায়গায় গিয়ে লাগে নি। তাই তিনি পরমারধ্যা সুপ্রাচীনা এই ভারত মাতার কোলেই ঝাঁপিয়ে পড়েছেন…উদ্দেশ্য পশ্চিমের নবলব্ধ শ্রমবাদের মন্ত্রে পূর্ব-দেশের জনতার জড়দেহে প্রাণ-সঞ্চার করা

'ভাইসব…!'

বিপুল গাম্ভীর্যে লালা ওংকারনাথ জনতাকে আহ্বান করেন কিন্তু জনতার ভঙ্গী দেখে মনে হলো, তাঁর গাম্ভীর্য নিতান্তই মাঠে মারা গেল।

অধীরভাবে রতন বলে উঠল : 'ধর্মঘটের কি হলো, তাই বলো প্রেসিডেণ্ট সাহেব!'

রতনের জামার খুঁট টেনে ধরে মন্নু জিজ্ঞেস করে : 'আরে ঐ লোকটাই না সেদিন তোমার সঙ্গে দেখা করতে চায় নি?'

'হাঁ,'—রতন সংক্ষেপে মন্নুর উত্তর দেয়, তারপর বক্তার দিকে চেয়ে আবার বলে ওঠে : 'ধর্মঘটের কি হলো, তাই বল লালাজী!'

মঞ্চের ওপর থেকে মুজাফর উঠে দাঁড়িয়ে বলে : 'বসো, রতন ভাই, সবাই চুপ ক'রে শোন…প্রেসিডেণ্ট কি বলেন তাঁকে বলতে দাও!'

'আচ্ছা…' বলে রতন বসে পড়ে।

ওঙ্কারনাথ নতুন ক'রে শুরু করেন : 'ভাই সব, প্রত্যেক যুগে ধন উৎপাদনের জন্য সর্বপ্রথম প্রয়োজন হচ্ছে, কারিগর···তৈরি পাকা কারিগর এবং আনাড়ী কারিগর···তারা স্বতন্ত্রভাবে কাজ করুক আর সঙ্ঘবদ্ধভাবেই কাজ করুক। প্রাচীন ভারতবর্ষে আমাদের জাতীয় অর্থনৈতিক জীবনে শ্রমিকদের একটা সুনির্দিষ্ট স্থান ছিল···এবং শ্রম-পরিচালক ও শ্রমিকদের মধ্যে যে একটা দায়িত্বের সম্পর্ক ছিল, তা এই প্রাচীন উক্তি থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়। শ্রমিকদের পক্ষে উদার বিচক্ষণ প্রভু যেমন বিরল, তেমনি বুদ্ধিমান, অনুগত এবং সত্যবাদী শ্রমিকও সকলের ভাগ্যে জোটে না! মিঃ রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়, তাঁর বিখ্যাত—'

লালাজীর কাছ থেকে সেদিন রতন মুখ বুজে যে প্রত্যাখ্যানের অপমান নিয়ে চলে এসেছিল, সে-কথা সে ভোলে নি। তাই তার জ্বলায় সে স্থির হয়ে ব'সে থাকতে পারছিল না। বিরক্ত হয়ে আবার চেঁচিয়ে উঠল : 'ও সব কথা শুনে কি হবে? আমাদের মাইনে কাটার সম্বন্ধে কি হলো তাই বল লালাজী!'

সে-কথা যেন তাঁর কর্ণগোচর হয় না। ওঙ্কারনাথ পরম-উৎসাহে কেতাবী ভাষায় বক্তৃতা দিয়ে চলে : শুধুমাত্র অসাধু মনিবই তার নিযুক্ত শ্রমিকদের দিয়ে অতিরিক্ত পরিশ্রম করিয়ে নেয় আর আশা দেয়, কিন্তু পরিপূরণ করে না, পরিশ্রমের বিনিময়ে উপযুক্ত পারিশ্রমিক দেয় না···অন্যদিকে, যে শ্রমিক কাজ করতে করতে কেবল পারিশ্রমিকের জন্য উত্যক্ত করে, সে নিন্দনীয়। যে মনিব পরিশ্রম করিয়ে নিয়ে পারিশ্রামিক দেয় না, সে-ও ঠিক তদ্রূপ নিন্দনীয়!'

রতন বসে বসে গজরাতে থাকে : 'নিন্দনীয়!'

হঠাৎ কে একজন বলে ওঠে : 'আমাদের যে রোজ বন্ধ ক'রে দিয়েছে, য়ুনিয়ন তার কি করছে?'

প্রেসিডেণ্ট তাঁর বাঁকা ঠোঁট আর-একটু বেঁকিয়ে উত্তর দিলেন : 'অল্ ইণ্ডিয়া ট্রেড য়ুনিয়ন ফেডারেশন যথাযোগ্য স্থানে কথাবার্তা চালাবেন।'

ভিড়ের ওপরে মাথা তুলে রতন বলে : 'গত বছর জামসেদপুরে টাটার কারখানাতেও তুমি ঠিক একই কথা বলেছিলে···কিন্তু তাতে তো কিছুই হলো না!'

বিরক্ত হয়ে তিনি আদেশ করেন : 'বসো! বক্তৃতার সময় বাধা দিও না।

বোম্বের মিলের মালিকরা অবুঝ নন···তাড়াহুড়ো ক'রে একটা গোলমাল বাধিয়ে তো লাভ কিছু হবে না। আমার কথা হলো, গণ্ডগোল হয়েছে, বেশ, কথা-বার্তা বলে মিটমাট ক'রে ফেল। ইতিমধ্যেই বোম্বের রাস্তায় হাজারে হাজারে বেকার লোক ঘুরে বেড়াচ্ছে, সেকথা ভুলে গেলে চলবে না! আর তা ছাড়া ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের অনুমোদন ছাড়া আমি কোন ধর্মঘটকেই প্রশ্রয় দিতে পারি না।'

অনেকগুলি কণ্ঠ একসঙ্গে বলে উঠল: 'কংগ্রেসের দোহাই দিলে কি হবে? আমরা কমতি-রোজে কিছুতেই কাজ করব না।'

প্রেসিডেণ্ট গর্জ্জন ক'রে উঠলেন: 'চুপ করো! এ রকম অবস্থায় বিলেতে শ্রমিকরা কি করে, আমি তা ভালো ক'রে দেখে এসেছি। সেখানকার শ্রমিকরা যে এত বলশালী তার কারণ কি? তার কারণ হলো, সংঘবদ্ধতা। আমি যখন বিলেত থেকে এসে এই দেশের মাটিতে পা দিই, তখন আমাদের এখানে একটাও ট্রেড য়ুনিয়ন ছিল না···কেউ তার নাম পর্যন্ত এখানে শোনে নি। আমি এই ব্যাপার নিয়ে এতদিন ধ'রে পরিশ্রম ক'রে এসেছি···আমি চাই তোমরা আমার কথামতো ঠিক পথে এগিয়ে চল। মিলের মালিকরা তোমাদের কাজ দেন, তাঁরা তোমাদের শত্রু নন্। তাঁরা যদি বুঝে থাকেন যে এখন কমতি রোজে মিল চালাতে হবে, সেক্ষেত্রে তোমাদের ভেবেচিন্তে মতলব ক'রে সংঘবদ্ধভাবে চলতে হবে। তোমাদের ভালোমন্দ দেখবার জন্যেই য়ুনিয়নের আর-একটা কর্তব্য আছে, মালিক আর শ্রমিক দু'পক্ষেরই যাতে ক্ষতি না হয়, তা দেখা। মালিক আর শ্রমিকদের মধ্যে য়ুনিয়ন যে ভাবে আপোস নিষ্পত্তি করে তাতে তোমাদের আস্থা থাকা চাই। য়ুনিয়নের কমিটির ওপর এবং প্রেসিডেণ্ট-রূপে আমার ওপরও তোমরা সম্পূর্ণভাবে নির্ভর ক'রে থাকতে পারো।'

হঠাৎ ওঙ্কারনাথকে এক রকম হাত দিয়ে সরিয়ে দিয়ে সউদা উঠে দাঁড়ায়: 'ভাই সব, ওঙ্কারনাথজী যে কমিটির কথা বললেন, সে-কমিটির সভ্যরা এখানেই উপস্থিত আছেন। আমিও তাঁদের মধ্যে একজন। আমরা এখুনি এখানেই এর একটা ফয়শালা ক'রে ফেলতে চাই। লালা ওঙ্কারনাথের মিলের মালিকদের ওপর অগাধ বিশ্বাস! এইমাত্র তিনি তোমাদের বলেছেন,

মালিকরা তোমাদের শত্রু নন্‌···তবে একথা তোমরা প্রত্যেকেই ভালোভাবে জানো যে তাঁরা তোমাদের অন্তরঙ্গ বন্ধুও নন্‌। তোমাদের আর মিলের মালিকদের মধ্যে আকাশ-পাতাল ফারাক···তোমরা হলে উৎপীড়িত, তাঁরা হলেন উৎপীড়নকারী—'

সমস্বরে জনতা বলে উঠল: 'ঠিক বলেছ ভাই!'

উত্তেজিত হয়ে সউদা বলে চলে: 'তারা হলেন ডাকাত, লুঠেল, চোর, খুনে···হ্যাঁ, খুনে হয়েও তারা মালাবার হিলের ওপর সুরম্য প্রাসাদে থাকে··· তোমরা পরিশ্রম ক'রে যে অর্থ উৎপাদন কর, তাই দিয়েই তারা সে প্রাসাদ গড়ে। দিনের মধ্যে পাঁচবার ক'রে তারা খানা খায়···মালাবার হিলে বাস ক'রেও হাওয়া খেতে তারা রোলসরইস্‌ নিয়ে বেরোয়। আর তোমরা, তোমাদের মাথার ওপর নেই ছাদ, পেটে নেই ভাত, পরনে নেই কাপড়··· অথচ তোমরাই করছ তুলোর চাষ, তৈরি করছ সুতো···চলছে বড় বড় মিল। ওরা খেয়ে যে উচ্ছিষ্ট ফেলে, তোমরা আছো তা পরিষ্কার করবার জন্যে—মেথর মুদ্দাফরাশ! ওরা ভোগ করবে, আর তোমরা করবে কাজ···জগতের নামহীন পরিচয়হীন মজুর দল। হ্যাঁ···তোমাদের ডাকনাম হলো কুলি···তোমাদের পরিচয়, ডার্টি নিগার···তোমরা অসভ্য বর্বর। ভাঙা কুঁড়ে ঘরে মাটির মেঝেতে একঘরে বুনো জন্তুদের মতো একসঙ্গে কুড়িজন তাল পাকিয়ে জড়-পিণ্ডের মতো তোমাদের বাস করতে হয়···দুর্গন্ধ আবর্জনা তোমাদের শয্যা···আস্তাকুড় তোমাদের উপাধান। তোমাদের দেহ আছে, কিন্তু দেহবোধ নেই···হাড় আছে, মাংস নেই···সেই হাড়কে ঢাকবার জন্যে আছে শুধু ছেঁড়া ময়লা ন্যাকড়া! অথচ আমার বন্ধু লালা ওঙ্কারনাথ বলেন, তোমাদের আর মালিকদের স্বার্থ নাকি একই!'

রতন আনন্দে ফেটে পড়ে: 'সাবাস! সাবাস! সউদা সাহেব!

সউদার কথা শুনতে শুনতে, দেহের মধ্যে শিরায়-উপশিরায় যে-রক্ত চলাচল হচ্ছে তা যেন মুমু উপলব্ধি করতে পারে।

সউদা থামে না:

'লালা ওঙ্কারনাথ ধনী ব্যক্তি, প্রভূত ধনী। জীবনে তিনি কোনদিন দেখেন নি, দারিদ্র্য-রাক্ষসী কি ক'রে মানুষকে টেনে নিয়ে ফেলে বুক-সমান

নরক-কুণ্ডের পাঁকে—সে-পাঁকে সাপের মতো ফণা তুলে আছে খিদে···জোঁকের মতো রক্ত চুষে খাচ্ছে অভাব···কুমীরের মতো হাঁ ক'রে জ্যান্ত মানুষকে গিলে খেয়ে নেবার জন্যে রয়েছে লোভ ! আমার কথা সত্যি না মিথ্যে, তোমরা তোমাদের নিজের কথা ভাবলেই বুঝতে পারবে। তোমাদের মধ্যে এমন কে আছে, যে তোমাদের কারখানার ফোরম্যানের কুম্ভীপাকে জড়িয়ে পড়ো নি ? মালিকদের ভাড়াটে দালালের আক্রোশে জ্বলে-পুড়ে মর নি ? সামনেই তোমাদের রয়েছে রতন ভাই···সে আর তার মতোন অনেকেই বিনা কারণে আজ চাকরি থেকে বিতাড়িত হয়েছে। তাদের অপরাধ ? তারা ফোরম্যানকে তাদের রক্তজল-করা মাইনে থেকে কমিশন দিতে চায় নি। মাইনের দিন কারখানার দরজায়, দরজার বাইরে কাবুলী মহাজনেরা লাঠি হাতে দাঁড়িয়ে থাকে, তাদের সেই লাঠি পিঠে পড়ে নি, এমন একজনও কেউ আছে তোমাদের মধ্যে ? তোমাদের কাছে থেকেই শুনেছি, ঐ সব কাবুলী মহাজনেরা আসল টাকা ফেরত নিতে কিছুতেই চায় না, তাদের অসীম দয়া, মাসের-পর-মাস তাদের সুদটা শুধু তোমরা দিয়ে যাও ! এইভাবে সামান্য ঋণের বদলে তোমাদের উপার্জ্জনের যথাসর্ব্বস্বই তারা গ্রাস ক'রে নেয়। তার পর একদিন আসে যখন কারখানার মাইনে আর পাওয়া যায় না সুতরাং সুদ বা আসল কিছুই শোধ দেওয়া যায় না···তখন গর্ত্তে ফিরে গিয়ে উপোস দিয়ে মরা ছাড়া আর কোন গত্যন্তর থাকে না। হায়, কবে তোমরা বুঝতে পারবে, তিল তিল ক'রে যুগ যুগ ধরে তোমাদের কিভাবে দোহন ক'রে মেরে ফেলা হচ্ছে !'

মুন্নু উৎকর্ণ হয়ে সউদার দিকে চেয়ে থাকে···একটা কথাও যেন ভুল না হয়ে যায়।

সউদা বলে চলে : 'সারা জগতে মানুষের মধ্যে মাত্র দুটো জাত আছে, একটা জাত হলো গরীব, আর-একটা জাত হলো বড়লোক। এই দু'জাতের মধ্যে কোন মিল, কোন আত্মীয়তা নেই। যারা ধনী এবং সেই জন্যেই বলশালী, তারাই পৃথিবীর সব সুখ-সাধ-ঐশ্বর্য-ভোগের মালিক যদিও তাদের সেই ঐশ্বর্য গড়ে উঠেছে ডাকাতি, চুরি এবং প্রকাশ্য যুদ্ধ-বিগ্রহের সুযোগে। পৃথিবী তাদেরই শ্রদ্ধা করে, সম্মান দেখায়···তারাও পরস্পর পরস্পরকে পিঠ চাপড়ে বাহাদুরী নেয় ! আর তোমরা, যারা দরিদ্র এবং দরিদ্র বলেই দুর্ব্বল

এবং অসহায় এবং শান্ত···যেন পৃথিবীর অভিশপ্ত জীব···তোমাদের কোন দাবি নেই, কোন অধিকার নেই, দেহ ও মন পঙ্গু, জগতের কেউ তোমাদের দিকে একটা আঙুল তুলেও সম্মান দেখায় না···তোমরা যে আছ, তা স্বীকার পর্যন্ত করতে চায় না···।'

মুমুর মনে পড়ে, শ্যামনগরে থাকবার সময়, তারও মনে, ধনী ও দরিদ্র সম্বন্ধে ঠিক এই রকম সব ধারণা অস্পষ্ট ঘুরে বেড়াত কিন্তু এমন ক'রে সাজিয়ে-গুছিয়ে বলবার ক্ষমতা তো তার নেই।

'ভাই, শোষিত সর্বহারার দল, মাথা তুলে দাঁড়াও···বল, আমার অধিকার আমি ছাড়ব না···উঠে দাঁড়াও মেরুদণ্ড সোজা ক'রে, বুক ফুলিয়ে মাথা তুলে বল, এই আমি, এমনি ক'রে মাথা তুলে দাঁড়াবার তাগদ আমার আছে···এমনি কেঁচোর মতো বুকে হেঁটে দু'বেলা কারখানার দরজা দিয়ে ঢোকবার আর বেরুবার জন্যেই শুধু নই!···জীবনের যেটুকু এখনো বাকি আছে তারই জোরে উঠে দাঁড়াও···নইলে পায়ের তলায় নিঃশেষে ঐ শয়তান শোষক ব্যাটারা তোমাদের টিপে মেরে ফেলবে : উঠে দাঁড়াও···এগিয়ে এস। কাল থেকে শুরু হোক ধর্মঘট···ভাই সব, সকলে মিলে একসঙ্গে এসো···একসঙ্গে আওয়াজ তোলো, আমরা সকলকে শুনিয়ে দিই আমাদের দাবির কথা।'

কয়েক মিনিটের জন্যে সউদা নীরব হয়ে স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে থাকে! তার সামনে সেই বিরাট জনতা বিদ্যুৎ আহতের মতো নড়ে ওঠে···উত্তেজিত কিন্তু আবিষ্ট। সউদা ধীর-গম্ভীর-কণ্ঠে উচ্চারণ করে : 'আমরা মানুষ···প্রাণহীন মেসিন নই।'

সঙ্গে সঙ্গে সেই বিরাট জনতা মিলিতকণ্ঠে বলে ওঠে : 'আমরা মানুষ মেসিন নই!'

সউদা বলে : 'আমাদের দাবী—ঘুষ না দিয়ে কাজ করবার সহজ অধিকার।'

'বাস করবার মতো ঘর···'

'উপযুক্ত পরিশ্রমিক···কমতি রোজের ভুখা নয়···'

'আমরা চাই, আমাদের ছেলেমেয়েদের জন্যে ইস্কুল···'

'আমরা চাই, লিখতে, জানতে, বুঝতে—'

'আমরা চাই, জমিদার-মহাজনের গ্রাস থেকে বাঁচতে···'

'আমরা চাই আশ্বাস…যে-কোন ফোরম্যান যখন খুশী আমাদের বরখাস্ত করতে পারবে না। আমরা চাই, আমাদের য়ুনিয়নকে মেনে নেওয়ার আইন।'

উত্তেজিত জনতার সমবেতকণ্ঠে সেই তুমুল-ধ্বনি প্রশমিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, হঠাৎ পিছন দিক থেকে কে যেন চেঁচিয়ে কেঁদে উঠল। ভাঙা-ভাঙা অস্পষ্ট শোনা গেল : 'ছেলে চুরি…ছেলে চুরি—'

সকলের দৃষ্টি সেই দিকে আকৃষ্ট হওয়ার ফলে দেখা গেল, ভিড়ের পেছনে এক বৃদ্ধ কুলি আর্তস্বরে কাঁদছে : 'ওগো আমি কি করব? আমার ছেলেকে না-কি চুরি ক'রে নিয়ে গিয়েছে! এই লোকটা আমাকে খবর দিল এই মাত্তর!'

জনতার ভেতর থেকে চাপা স্রোতের মতো চাপা আওয়াজ উঠল : 'ছেলে চুরি! সর্বনাশ! নিশ্চয়ই পাঠানদের কাজ! ব্যাটাদের পেশাই হয়েছে হিন্দুদের ছেলেমেয়ে চুরি করা?'

সউদা নেমে আসে জনতার মধ্যে…

'কি ব্যাপার? কি হয়েছে?'

ভিড়ে স্পষ্ট কোন শব্দ কানে আসবার উপায় নেই, শুধু তার মধ্যে থেকে একটা ভাঙা চাপা গলায় কান্নার বিচিত্র আওয়াজ আসে, মধ্য-রাত্রিতে অপহৃত শাবক হায়নার আর্তনাদের মতো।

সউদার প্রশ্নের উত্তরে একজন কুলি বলে ওঠে : 'ছেলে-চুরি গিয়েছে! মুসলমানেরা একটা হিন্দু ছেলেকে চুরি ক'রে নিয়ে পালিয়েছে।'

জনতার ভেতর থেকে ভয় আর ঘৃণার একটা ব্যঞ্জনা জেগে ওঠে।

সউদা তীব্রকণ্ঠে ভর্ৎসনা করে করে ওঠে : 'বাড়ি যাও! যে-যার বাড়ি যাও। এ সব হলো—আমাদের শত্রুদের কারসাজি, হীন গুজব! কাল আর কেউ কাজে বেরিও না…আমাদের য়ুনিয়ন থেকে ধর্মঘটের সময় তোমাদের কিছু পেট-ভাতা দেওয়া হবে…আর হ্যাঁ, কাল এইখানেই আবার সবাই জড় হবে… এখান থেকেই শোভাযাত্রা বেরুবে!'

সউদার কথা শেষ হতে-না হতে ভিড়ের ভেতর থেকে আর-একজন কে বলে উঠল : 'সত্যি সাহেব, একটা হিন্দু-ছেলে চুরি গিয়েছে, হিন্দু-ছেলে!'

সঙ্গে সঙ্গে আর একজন বলে উঠল : 'একজন নয়, অনেকগুলো হিন্দু ছেলে চুরি গিয়েছে সাহেব।'

ক্রমশ সংবাদটা পাকাপাকিভাবে জনতার মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। উত্তেজনায় তারা উপস্থিত সমস্যার কথা ভুলে যায়। চারদিক থেকে ক্রুদ্ধ আক্রোশের বাণী জেগে ওঠে।

'এর সমুচিত শিক্ষা দিতে হবে! ব্যাটারা আস্পর্ধায় মাথায় উঠেছে। হারামজাদা!'

সউদা চিৎকার ক'রে উঠে: 'বাড়ি যাও, বাড়ি যাও···আমরা দেখছি কি হয়েছে, না-হয়েছে!'

কিন্তু তার কথায় ভ্রূক্ষেপ না ক'রে ক্ষিপ্ত জনতা প্রলাপ বকতে আরম্ভ করে।

আমরা প্রতিশোধ নেব! কিছুতেই ছাড়ব না! আমাদের টাকা-পয়সাও কেড়ে নেবে, ছেলেদেরও চুরি করবে। প্রতিশোধ! প্রতিশোধ চাই!'

রতন টেবিলের ওপর লাফিয়ে উঠে দাঁড়ায়: 'চুপ কর্, বোকার দল!' কারুর যদি ছেলে চুরি যায়, আমি আছি···আমি লড়ব তার হয়ে! কিন্তু আগে বাড়ি গিয়ে দেখ্, সত্যি সত্যি চুরি গিয়েছে কি-না!'

কিন্তু মাঠের এককোণে দেখা গেল, ইতিমধ্যেই একদল হাতাহাতি শুরু ক'রে দিয়েছে। কতকগুলি মুসলমান কুলি গলা ছেড়ে চেঁচাচ্ছে: 'আরে রেখে দে শাক চচ্চড়ী খানেওয়ালা! হিঁদুয়ানী বাড়ি গিয়ে করিস্! আমাদের ধর্ম নিয়ে কিছু বলবি তো মাথা গুঁড়িয়ে দেব!'

মুন্নু ছুটে গিয়ে রতনের জামা টেনে ধরে। ভয়ে তার সর্বাঙ্গ কাঁপতে থাকে। পিছন ফিরে দেখে, উন্মাদ জনতা তরঙ্গের মতো এগিয়ে আসছে, পিছু হটছে, পরস্পর পরস্পরের ঘাড়ে গিয়ে পড়ছে···চার দিকে শুধু ক্রুদ্ধ মুখ···অগ্নি উদ্গারী জ্বলন্ত দৃষ্টি। প্রত্যেক লোকই ক্ষিপ্ত হয়ে চিৎকার করছে· সেই সমবেত চিৎকারের মধ্যে একটিও কথা শোনা যাচ্ছে না। কয়েক মুহূর্ত আগে সউদার মুখে তাদের নব-অধিকারের মন্ত্রোচ্চারণ শুনে তার মনে যে প্রাণদায়ী মহা উল্লাস জেগে উঠেছিল, এই কয়েক মুহূর্তের মধ্যে তা কোথায় উবে গেল! তার জায়গায় এক অনিশ্চিত অনির্দিষ্ট মরণ অন্ধকার···চারদিকে রক্তচক্ষু, ক্রুদ্ধ বিকৃত মুখ···উন্মাদ গালাগাল।

এমন সময় সে দেখে, জনতার সামনে, একটু দূরেই অতি পরিচিত

নীলকোর্তা পরিহিত পুলিশের লোক, লাঠি ঘোরাতে ঘোরাতে জনতাকে ছত্রভঙ্গ করতে শুরু ক'রে দিয়েছে।

মুন্নুর হাতের মুঠো থেকে জোর ক'রে জামাটা ছাড়িয়ে নিয়ে রতন বলে: 'তুই বাড়ি ফিরে যা মুন্নু!' সঙ্গে সঙ্গে সে ভিড়ের মধ্যে ঝাঁপিয়ে গিয়ে পড়ে।

'রতন! রতন!'—মুন্নু আর্তস্বরে চিৎকার ক'রে ওঠে। কিন্তু উম্মাদ কলরবের মধ্যে তার ক্ষীণ কণ্ঠস্বর কোথায় ডুবে যায়!

টেবিলের ওপর উঠে দাঁড়িয়ে সে আর্ত দৃষ্টিতে খোঁজে, হরি কোথায়!

এমন সময় পেছন থেকে লাঠি হাতে এক ভীমকায় পাঠান হেঁকে উঠল: 'তুই হিন্দু, না, মুসলমান!'

মুন্নু এক নিমেষের মধ্যে কাঠের পুতুলের মতো স্থির আড়ষ্ট হয়ে যায়। তার মনে হয় যেন যমরাজ তাকে নিয়ে যাবার জন্যে এসে দাঁড়িয়েছে। একবার মনে হলো চিৎকার ক'রে সে ডাকে···ডাকবার জন্য হাঁ করল বটে কিন্তু গলা থেকে কোন শব্দ বেরুল না। আপনা থেকে চোখ বন্ধ হয়ে যায়, আবার আপনা থেকে খোলে। সেইটুকু সময়ের মধ্যে সে ঠিক ক'রে নেয় টেবিলের ওপর থেকে ডান দিকে লাফিয়ে পড়ে···পাঠানটা তখন লাঠি তুলেছে। লাফিয়ে, পড়েই মুন্নু শোনে, তার বরাদ্দ লাঠি টেবিলের ঘাড়েই পড়ল। দিক্‌বিদিক্‌ জ্ঞানশূন্য হ'য়ে কোনরকমে ভিড় ফুঁড়ে সে বাইরে বেরিয়ে আসে···তখন দলে দলে প্রাণভয়ে যে-যার ঘরের দিকে ছুটছে। মুন্নু তাদের দলে মিশে যায়।

ভিড়ের মধ্যে থেকে কে বলে উঠল: 'মাসের-পর-মাস এই পাঠানগুলো ছেলে চুরি ক'রে বেড়াচ্ছে···'

কে যেন সে-কথা সমর্থন করল: 'মনে করেছ মিলের মালিকরা জানে না? সব জানে তারা। তারাই তো ওদের আস্কারা দেয়···আর সরকার তলে তলে যোগসাজস্‌ করে।'

'নিশ্চয়ই! পাঠানরা হামেশা চোখের সামনে মোটরে ছেলে তুলে নিয়ে যাচ্ছে আর সরকার তা বন্ধ করবার কোন ফিকিরই করে না। ছেলেপুলে ঘরে রেখে কাজ করতে আসা দায় হয়ে উঠেছে।'

ট্রেড য়ুনিয়নের একজন কর্মী বলে ওঠে: 'পাঠান গুণ্ডারাই তো আমাদের

শহু। গেল বছর তেল কলের ধর্মঘট ভাঙবার জন্যে মিলের মালিকরা দুশো পাঠান আনিয়ে ছিল···তাদের উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়া দরকার!'

মুন্নু তাদেরও ঠেলে এগিয়ে চলে। তাদের গলির মুখে এসে দেখে, সেখানেও মারামারি শুরু হয়ে গিয়েছে।

নিরুপায় হয়ে সে ফিরে শহরের রাস্তা ধরে। এ-গলি সে-গলি দিয়ে ভেণ্ডি-বাজারে এসে দেখে, একটা ছোট্ট মাঠে বহু লোক জড় হয়েছে। মাঝখানে একটা কাঠের চৌকির ওপর একজন বেঁটে-মোটা মতোন লোক বক্তৃতা দিচ্ছে: "হিন্দু ভাই সব! যদি নিজেদের মা-বোনদের ওপর কোন দরদ থাকে আপনাদের, তাহ'লে আর ঘুমিয়ে থাকবেন না! উঠুন, জাগুন! আমাদের ঘর থেকে আমাদের বউ-ঝিদের ধরে নিয়ে খুন-জখম করছে, অপমান করছে অথচ আমাদের মহামহিম সরকার বাহাদুর যখন সে-সব ব্যাপার গ্রাহ্যের মধ্যেই আনছেন না, তখন হাতে লাঠি নিয়ে যে-যার বেরিয়ে পড়ুন। উলটে তাঁরা হুকুম জারী করেছেন, পাঁচজন এক জায়গায় হলেই গুলি চালাবেন। তাই আত্মরক্ষার জন্যে আমাদের প্রস্তুত হতে হবে। আমাদের লাঠি-সোটা সরকার কেড়ে নেবেন, অথচ ওদের হাতে ছুরি-ছোড়া তেমনই থাকবে। এ সবের মানে কি? এর একমাত্র সদুত্তর হলো, আমাদের মারাঠা-তেজ ভালো ক'রে আজ ওদের দেখিয়ে দিতে হবে!'

একটা বন্ধ দেকানের পাটাতনের ওপর উঠে দাঁড়িয়ে মুন্নু লোকটাকে ভালো ক'রে দেখবার চেষ্টা করে। দেখে লোকটার মাথার ওপর তখন একটা লাঠি পড়বার উপক্রম হয়েছে। সে আর চেয়ে থাকতে পারে না।

এমন সময় চিৎকার জেগে ওঠে: 'হেই···হেই···খুন করল···খুন করল!'

সঙ্গে সঙ্গে প্রতিধ্বনির মতো জেগে উঠল: 'প্রতিশোধ! প্রতিশোধ! মারো! শালাদের খুন করো! লুঠ করো···পুড়িয়ে দাও!'

চিৎকার করতে করতে জনতা রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে।

এমন সময় খাঁকি-পোশাকে একজন ইংরেজ পুলিস-অফিসার লাঠিওয়ালা বারোজন পাহারাওয়ালা নিয়ে জনতার ওপর লাঠি চালাতে আরম্ভ করে। বেগতিক দেখে মুন্নু উলটো রাস্তা ধরে। তার মাথার ভেতর যেন হাজারটা ভোমরা ঢুকে ভোঁভোঁ করছে। স্পর্শ না করেও সে বুঝতে পারে তার

কপালের দু'ধারে দুটো রগ দপদপ করছে। এই চোখের সামনে যে লোকটা কথা বলছিল, চোখের পলক না-ফেলতে আবার যখন সে চেয়ে দেখল, তখন সে-লোকটাকে আর সেখানে সে দেখতে পেল না। এই হঠাৎ অন্তর্ধানের মানে কি, মৃত্যু? আততায়ীর আক্রমণে মৃত্যু? —না, আর কিছু? তার চারদিকে মনে হলো যেন মৃত্যুর ছায়া অন্ধকারে ছমছম করছে। আপনার মনে প্রলাপের মতো বকতে বকতে সে এগিয়ে চলে…অর্ধ-অচেতন…অন্ধের মতো। চলতে চলতে সে নিজেই প্রশ্ন করে, একি হলো? নিরন্তর প্রশ্ন বার বার তার কাছেই ফিরে ফিরে আসে। চারদিকে তার একি মৃত্যুঘন নীরবতা? ভয়ে তার চৈতন্য লুপ্ত হয়ে আসে! সে তো এত ভীতু নয়! তবে কোথা থেকে এল এই ভয়? নিজেকে আশ্বাস দেবার জন্যে সে নিজেই জোরে জোরে বলে: 'গাঁয়ে সবাই জানে আমার সাহসের কথা…কতবার নিশুতি অন্ধকারে একা শ্মশানের পাশ দিয়ে যাওয়া-আসা করেছি…কই, তখন তো এমন ভয় করে নি? এখনই বা এত ভয় করছে কেন?' হঠাৎ মনে পড়ে রতনের কথা।

এখন সে কোথায়? সত্যি কি করছে এখন সে? আর হরি? লক্ষ্মী হয়তো ছেলেমেয়েদের নিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে ঘরেতে ঘুমুচ্ছে।

হঠাৎ অন্ধকারে তার খুব কাছে কে যেন মর্মান্তিক চিৎকার ক'রে উঠল… সেই সঙ্গে দূরে থেকে হাওয়ায় ভেসে এল উন্মাদ চিৎকারধ্বনি: 'আল্লা হো আকবর!' ভয়ে সে ছুটতে আরম্ভ ক'রে দিল। একটা ছোট্ট বাজারের কাছাকাছি এসে দেখে, কাঠের পা নিয়ে এক বৃদ্ধ খঞ্জ ভিখারী প্রাণপণে ছুটছে…বগলে ছেঁড়া ন্যাকড়ার পুঁটলী…আর তাকে তাড়া ক'রে আসছে একজন মুসলমান পাঠান। সমস্ত বৃত্তি সংহত ক'রে সে দাঁড়িয়ে পড়ল। সামনে দিয়ে আর দু'জন মুসলমান লাঠি আস্ফালন করতে করতে এগিয়ে আসছিল। বুড়ো ভিখারীটা পেছনের তাড়ায় সামনে ছুটতে গিয়ে সেই দু'জনের একেবারে সামনে গিয়ে পড়ল। লাঠি দিয়ে সামনের দু'জন বুড়োকে আটকাতেই পেছনের পাঠানটি এসে সজোরে তার পাঁজরে ছোরা বসিয়ে দিল। 'হায় রাম!' বলে বুড়ো সেইখানেই পড়ে গেল। পাঠানটা চিৎকার ক'রে উঠল: 'কাফের! ইবলিসের বাচ্চা! মর শালা!'

বুদ্ধ একবার শেষ চিৎকার ক'রে নীরব হয়ে গেল। আবার সেই নীরবতা···

মন্মু পেছন ফিরে ছুটতে আরম্ভ করল। সমুদ্রের দিক থেকে ঝড়ো হাওয়া তার পেছনে তাকে যেন তাড়া ক'রে আসে। আতঙ্কিত চিত্তে মন্মু সেই ঝড়ের শব্দে মনে করে যেন উন্মাদ জনতা খোলা ছোরা হাতে তার পেছনে ছুটে আসছে।

ছুটতে ছুটতে হঠাৎ একজায়গায় এসে দেখল অন্ধকার লাল হয়ে উঠেছে। সামনে একটা দোকান-ঘর পুড়ছে। একজন গুজরাটী ভদ্রলোক তার বাড়ির দরজার সামনে দাঁড়িয়ে একজন বন্ধুকে সেদিকে যাবার জন্যে হাত ধরে নিষেধ করছিলেন: 'দেখছ না মুলজী মাধবজীর মিষ্টির দোকানে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে···দোহাই তোমার, যেয়ো না···এগোলেই মেরে ফেলবে!'

কথাটা মন্মুর কানে যেতেই সে আবার থমকে দাঁড়ায়। যদি কোন দোকানের আশেপাশে কিংবা কারুর বাড়ির কোথাও লুকিয়ে থাকবার মতো একটু জায়গা পাওয়া যায়। এমন সময় সেই জ্বলন্ত দোকানের দিক থেকে তুমুল চিৎকার জেগে উঠল, সঙ্গে সঙ্গে অসংখ্য লোকের পায়ের শব্দ শোনা গেল—সেই দিকেই তারা এগিয়ে আসছে।

তাড়াতাড়ি মন্মু একটা ছোট গলির ভিতর ঢুকে পড়ে। কিন্তু বেশী দূরে যেতে-না-যেতেই তার কানে আসে এক মর্মন্তুদ আর্তধ্বনি। দেখে, সামনের এক বাড়ির বারান্দায় এক মহিলা দু'হাতে বুক চাপড়াচ্ছে···চুল ছিঁড়ছে আর কেঁদে কেঁদে উঠছে: 'ওরে আমার বাছা রে কোথায় গেলি রে? আর কি ফিরে আসবি না রে?'

মন্মুর মনে হলো স্ত্রীলোকটির কাছে গিয়ে তাকে সান্ত্বনা জানায়। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হলো, তাকে দেখে স্ত্রীলোকটি হয়তো মনে করতে পারে যে তাকে খুন করবার জন্যেই সে এসেছে। তাই সে ফিরে দাঁড়িয়ে দেখে, যে-পথ দিয়ে এসেছে, সেই পথে আবার ফিরে যাওয়া যায় কিনা। কিন্তু দেখল পাঠানদের ভিড়ে গলি ভরে এসেছে। তারা রাইফেলের বাঁট দিয়ে বন্ধ দোকানে দরজা ভেঙে ফেলে জিনিসপত্র লুঠ করছে···কেউ কেউ হাতের ছোরা শূন্যে আস্ফালন করতে করতে এগিয়ে চলেছে। ভয়ে তার সব অঙ্গ হিম হয়ে

আসে⋯ভুলক্রমে এ কোন গলিতে সে ঢুকে পড়েছে ? এতো গলি নয়⋯এ যেন মৃত্যুর গহ্বর। এমন সময় দেখে একদল পুলিশ তাদের তাড়া করছে। দেখতে দেখতে এক নিমিষের মধ্যে এত যে লোক তারা কোথায় যেন অদৃশ্য হয়ে গেল। বারান্দার বসে যে মেয়েটি কাঁদছিল, সে-ও সরে গিয়েছে। এখন আর এক নতুন ভয় তাকে পেয়ে বসল, পুলিশের লোকেরা তাকে যদি দেখে ফেলে। হয়তো সোজা পেটের ভেতর দিয়ে বেয়নেট চালিয়ে দেবে! দেয়াল ঘেঁষে এ-দিক ও-দিক চাইতে চাইতে সে অগ্রসর হলো।

গলির বাইরে নেমে দেখে, বড় রাস্তার ওপরে তখন তুমল উৎসাহে লড়াই চলছে। একটা ট্রাম অচল অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে। মুন্সু ছুটে গিয়ে তার আড়ালে আশ্রয় নেয়। আড়াল থেকে উঁকি মেরে যেই দেখতে যাবে, অমনি মনে হলো, পেছন দিক থেকে একটা হাত সজোরে তার ঘাড় টিপে ধরল⋯সঙ্গে পিঠে ঠিক মেরুদণ্ডের ওপর, কিসের যেন একটা নিদারুণ আঘাত এসে পড়ল⋯ মাথা ঘুরে সে রাস্তার পড়ে গেল।

শুয়ে পড়ে একবার শুধু সে চেয়ে দেখবার চেষ্টা করল, স্পষ্ট দেখতে পেল, তার সামনে দাঁড়িয়ে যমদূতের মতো একজন পাঠান। আর বাঁচবার কোন আশাই নেই। চোখ বুজে সে মড়ার মতো পড়ে রইল। পাঠানটা সজোরে একটা লাথি মেরে দেখল, 'আল্লা হো আকবর' বলে চেঁচিয়ে তার দলে গিয়ে ভিড়ে পড়ল।

কিছুক্ষণ পরে স্যোসাল সার্ভিস লীগের দু'জন স্বেচ্ছাসেবক তাকে স্ট্রেচারে ক'রে তুলে নিয়ে গেল।

রাত্রিতে মুন্নুর যখন জ্ঞান ফিরে এল সে দেখে, একটা ঘরে সে শুয়ে আছে, তার চারদিকে দাঙ্গায় আহত সব লোক শুয়ে। খুব কাছেই কোথা থেকে উৎকট দুর্গন্ধ আসছে। সেই বন্ধ ঘরে, ক্ষতবিক্ষত বিকৃত-দেহ সেই অসাড় মানুষের মধ্যে তার দম যেন আটকে আসতে লাগল। যা হয় হবে, এখান থেকে বেরিয়ে গিয়ে আমি সমুদ্রের ধারে যাব, সেইখানেই রাত কাটাব। এই স্থির ক'রে মুন্নু উঠে দাঁড়াল। দেখল, কেউ তাকে বাধা দিল না। সামনের দরজা খোলাই ছিল। নিঃশব্দে সে রাত্রির অন্ধকারের মধ্যে বেরিয়ে পড়ল।

সূর্যের আলোর আঘাতে তার ঘুম ভেঙে গেল। একে একে গতদিনের বিভীষিকার কথা তার মনে পড়তে লাগল। আজও কি শহরে তেমনি মারধোর

চলেছে ! আস্তে আস্তে সে শহরের দিকে এগিয়ে চলে। দেখে, পথে-ঘাটে যেমন লোকজন চলাচল করে ঠিক তেমনিই সব চলছে ; কোথাও কিছু হয় নি। তবে কি সে স্বপ্ন দেখছিল ? এমন সময় দেখে এক পার্সী ভদ্রলোকের সঙ্গে এক পাহারাওয়ালার কথা হচ্ছে।

মুন্নু তাদের মধ্যে কি কথাবার্তা হচ্ছে শোনবার জন্যে একটু এগিয়ে গেল, যেন সে অনাথ ভিখারী বালক···গাছের তলা থেকে শুকনো পাতা কুড়ুচ্ছে।

পাহারাওয়ালা বলে চলেছে, পুলিসের দিক থেকে ব্যাপারটা খোঁজখবর নিয়ে দেখা গেল যে, ছেলে চুরি সম্বন্ধে যে গুজব রটে ছিল, সেটা সর্বৈব মিথ্যে। পুলিসের তরফ থেকে সেই মর্মে বেতারে খবর বলা হলো' কিন্তু তা সত্ত্বেও এখানে ওখানে খুন জখম চলতে লাগল। সরকার থেকে সৈন্যদের কোন ব্যবস্থা করা হলো না। পুলিসের লোকেরাই সব ঘাঁটি আগলে হাঙ্গামা ঠাণ্ডা ক'রে দিল। আজ সকালে শহরের অবস্থা ভালোই। কুলিরা অনেকেই যে যার কাজে ফিরে গিয়েছে।

মুন্নু ভাবে, তাহ'লে তো কারখানা খুলে গিয়েছে, নিশ্চয়ই সেখানে কাজ চলেছে। তবে সে যাবে না কেন ? কারখানার দিকেই সে এগিয়ে চলে।

কিছুদূর যেতে না-যেতে দেখে দু'জন কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবক সাহেবী পোশাক-পরা একজন ভদ্রলোকের সঙ্গে কি কথাবার্তা বলছে। তাদের মধ্যে একজন বলে যাচ্ছে, সাহেবী পোশাক পরা ভদ্রলোকটি তাড়াতাড়ি তাই কাগজে লিখে নিচ্ছে। মুন্নু বুঝল স্বেচ্ছাসেবক দু'জন খবরের কাগজের রিপোর্টারকে দাঙ্গার বিবরণ দিচ্ছে।

এমন সময় একটা বৃহৎ মোটর গাড়ি সেখান দিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ থেমে গেল। স্বেচ্ছাসেবক দু'জন ফিরে দেখে, মোটরের ভেতর নবাবী পোশাকে সুসজ্জিত দীর্ঘকায় এক ব্যক্তি।

তাঁকে লক্ষ্য ক'রে তারা অভিবাদন জানায় : 'বন্দেমাতরম্ !'

গাড়ির ভেতর লোকটি কে তা মুন্নু জানে না, কিন্তু তার চেহারা দেখে সে স্পষ্ট বুঝতে পারল, নিশ্চয়ই কোন গণ্যমান্য ব্যক্তি হবে।

গাড়ির ভেতরকার নবাব বাহাদুর মুখ বার ক'রে বলে উঠলেন : 'বলি তোমাদের লীডাররা কি করছেন এখন ? পুলিস আর গভর্নমেণ্টই বা কি

করছে ? তোমার যুব সঙ্ঘ—তারাই বা কোথায় ? সারারাত ধরে হিন্দুরা সবাই মিলে নিরীহ পাঠানদের মেরে শেষ ক'রে ফেলল অথচ কংগ্রেস সে-সম্বন্ধে কোন-কিছু আর করা প্রয়োজন বোধই করল না ? যদি মিস মেয়ো এসে লিখত, এখানকার লোক ছেলে চুরি ক'রে যজ্ঞে বলি দেয়, তা'হলে কি তোমরা মুখ বুজে সহ্য করতে ?'

স্বেচ্ছাসেবক দু'জন চুপ করেই রইল। কিন্তু রিপোর্টার ভদ্রলোক মোটরের কাছে এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস ক'রে বসল : 'মৌওলনা হজরৎ আলী সাহেব, আপনি কি মনে করেন এই ব্যাপার নিয়ে সারা ভারতবর্ষে হিন্দু-মুসলমান সংঘর্ষ বেধে যাবে ?'

মৌওলনা সাহেব জবাব দেন : 'নিশ্চয়ই।' তারপর উত্তেজিতকণ্ঠে বলেন, 'আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করবার জন্য আমরা মুসলমানদের সংঘবদ্ধ করতে চলেছি।'

এইবার একজন স্বেচ্ছাসেবক বলে ওঠে : 'কিন্তু কংগ্রেস তো একটা শান্তি-কমিটি গড়ে তোলবার আয়োজন করছে।'

মৌওলনা বলে উঠলেন : 'হ্যাঁ, হ্যাঁ শান্তি! মুখে তোমরা শান্তি বলো আর ভেতরে ভেতরে যুদ্ধের আয়োজন করো। যাও কিং এডওয়াড হাসপাতালে গিয়ে দেখে এসো, হিন্দু আহতদের চেয়ে মুসলমান আহতদের সংখ্যা কত বেশী।'

খবরের কাগজের রিপোর্টার সেলাম জানিয়ে তাড়াতাড়ি পিটটান দেয়।

মৌওলনা সাহেব লোকটাকে শুনিয়ে চেঁচিয়ে বলে ওঠেন : 'ওহে শুনছো, আমি যা বললাম, তা যেন খবরের কাগজে ছেপো না কিন্তু!'

লোকটা তখন বহু দূরে চলে গিয়েছে।

মুন্নু আবার হাঁটতে শুরু করে।

মেমসাহেবের শফারটি ছিল মুসলমান।

মুন্নুর কাছে গিয়ে সে বুঝল ছেলেটা হিন্দু। সুতরাং তাকে তুলে গাড়িতে নিতে তার কোন ইচ্ছাই ছিল না কিন্তু মেমসাহেবের হুকুম···নিতেই হবে। তাই কাফেরের অচৈতন্য দেহটা কোনরকমে তুলে নিয়ে সে গাড়ির ভেতর শুইয়ে দিল। মিসেস্ মেন্‌ওয়ারিঙ গাড়িতে উঠে হুকুম দিল : 'তাড়াতাড়ি

তাজ থেকে আমাদের লাগেজটা তুলে নিয়ে, শহরের এক ধার দিয়ে বেরিয়ে পড়ো। জল্‌দি!'

মিসেস্‌ মেনওয়ারিঙের মোটর গাড়ি বোম্বের সীমান্ত ছাড়িয়ে-যেতে-না যেতে মুন্নু সুস্থির হয়ে উঠে বসল।

সেখান থেকে সিমলা যেতে মোটরে দু'দিন লেগে গেল। তার মধ্যে মুন্নু কতকটা চাঙ্গা হয়ে উঠল।

কিন্তু ভেতর থেকে সে একেবারে ভেঙে পড়েছিল। একে একে তার মনে পড়তে লাগল, কি ভয়াবহ দুর্যোগের মধ্যে দিনগুলো কেটেছে। সেই সঙ্গে রতন, হরি, লক্ষ্মী—সকলের মুখই একে একে তার স্মৃতিপটে জেগে ওঠে। দুশ্চিন্তা আর দুর্ভাবনায় সে একেবারে মুষড়ে পড়ে। হঠাৎ এই ক'দিনের অভিজ্ঞতায় যেন সে অথর্ব বুড়ো হয়ে গিয়েছে।

সে নিজেকে অথর্ব ভাবলেও তার উদ্ধারকর্তী মিসস্‌ মেন্‌ওয়ারিঙ কিন্তু তাকে সে-চোখে দেখে নি। তা যদি দেখত, তা'হলে আজ তাকে মোটর ক'রে এই দূর-পথ টেনে নিয়ে আসত না। তার ছিপছিপে সাবলীল দেহ, সহজ সরল মুখ-চোখ মেমসাহেবের অন্তর স্পর্শ ক'রেছিল। বিশেষ ক'রে তার চোখ দুটি, তরুণ কবির ভাবে-ভরা অর্থহারা নয়নের মতো,—মিসেস্‌ মেনওয়ারিঙের ভালো লেগেছিল। মেমসাহেব তাকে জিজ্ঞেস করে: 'বাচ্ছা তোর বয়স কত?'

'পনেরো', মুন্নু জবাব দেয়।

মুন্নুর কাজল-কালো চোখের দিকে চেয়ে, মেমসাহেব দুগ্ধশুভ্র হাতখানি দিয়ে তার কালো কপালে আদর ক'রে খিলখিল ক'রে হেসে ওঠে। আনন্দের হাসি। সে এই বয়সেরই একজন "বয়" খুঁজছিল!

মিসস্‌ মেন্‌ওয়ারিঙ এক প্রাচীন এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান পরিবারের মেয়ে: তার পূর্ব-পুরুষেরা ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে যুদ্ধ ক'রেছিল। তার ঠাকুরমা ছিলেন ভারতবর্ষেরই মেয়ে এবং সেই সূত্রে তার দেহে রীতিমতো ভারতীয় রক্ত প্রবাহিত ছিল: কিন্তু ছেলেবেলায় কনভেণ্টে অন্য সব য়ুরোপীয় শিশুর সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়ে, সেই ছেলেবেলা থেকেই নিজেকে পাকা বিলাতী বলে জাহির করতে হয়। কিন্তু বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কন্‌ভেণ্টের অন্য সব মেয়ের সঙ্গে এই নিয়ে তুমুল বাদানুবাদ তাকে করতে হয়েছে কিন্তু কেউই তার নির্জলা

বিলিতীত্বতে আস্থা স্থাপন করতে পারে নি। শেষকালে অবস্থা একরকম দাঁড়ায় যে সেই কনভেণ্ট তাকে ছেড়ে দিতে হয় এবং প্রতিজ্ঞা করে "হোমে" গিয়ে তার কালা রঙের অভিশাপ সে ধুয়ে-মুছে আসবে। পাকা সাদা-আদমী বলে পরিগণিত হবার তার এই দুর্বার সাধনার প্রতিবন্ধক হলো তার জন্মদাতা পিতা; কারণ কন্যাকে বিলাতে চেলটেলহাম লেডিস্ কলেজে পড়াবার সঙ্গতি তার ছিল না। এই নিয়ে পিতা এবং পুত্রীর মধ্যে রীতিমতো মনোমালিন্য ঘটতে থাকে। নিরুপায় হয়ে তখন সে তার বাসনা চরিতার্থ করবার পথ নিজেই খুঁজে বার করে। সেই সময় উলমার বলে একজন জার্মান ফটোগ্রাফার রাজা-রাজড়াদের মহলে বেশ নাম করেছিল। মে, কুমারী অবস্থায় এই নামেই সে পরিচিত ছিল, উলমারের স্কন্ধে আরোহণ করবার চেষ্টা শুরু ক'রে দিল এবং তাতে কৃতকার্য হলো। যথাকালে উলমারের সঙ্গে তার বিয়ে হয়ে গেল।

কিন্তু বিয়ের দু'বৎসর পরেই মহাযুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। উলমার কারারুদ্ধ হলো। তখন মে'র কোলে একটি মেয়ে। সাহিত্য ঘেঁটে তার নাম রেখেছিল পেনেলোপি, আর-একটি সন্তান তখন গর্ভে। যুদ্ধ ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই পুত্র-রূপে সেই গর্ভজাত সন্তান দেখা দিল।

স্বামীর অনির্দিষ্ট কারাবাসে সে দুঃখিত হলো বটে, কিন্তু কোনদিনই সে স্বামীকে ভালোবেসে তার দেহ-মন সম্পূর্ণভাবে দান করে নি, তাই এই আঘাতের তীব্রতা খুব বেশী হলো না। কিছুদিন যেতে-না-যেতেই, জালিমপুর স্টেটের শিক্ষা-সচিবের ওপর সে নজর দিল এবং সেখানকার একটা ছেলের স্কুলে একটা কাজ যোগাড় ক'রে নিল। যেখানে নারীরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পর্দার আড়ালে অবরুদ্ধ হয়ে থাকে, সেখানে তার মতো সুন্দরী স্বাধীনা নারী যে অনায়াসেই রাজ-স্টেটের উচ্চপদস্থ অফিসারের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারবে, তাতে আশ্চর্য হবার কিছুই ছিল না।

দেখতে-দেখতে তার কালো কেশের ফাঁদে সেই স্টেটের সৈন্য বিভাগের একজন ক্যাপটেন, আগা রাজা আলী শাহ্ বন্দী হয়ে পড়ল। আলী শাহ্-এর চেষ্টায় উলমারকে যথাবিধি ডাইভোর্স ক'রে, সে ক্যাপটেন-গৃহিনী হয়ে তার ঘরে ঢুকল। আলী শাহ সত্যিই তাকে ভালোবাসত এবং হয়ত তাকে সবরকমেই সুখী করতে পারতো, কিন্তু কিছুদিন যেতে-না-যেতেই মে'র মনে সেই আদিম

বাসনা জেগে উঠল, তাকে পাকা সাদা-আদমী হতেই হবে···! খাঁটি ইংরেজ রমণী হিসেবে আত্ম-প্রতিষ্ঠা করতেই হবে। এই চিন্তার পুনরাবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে তার নিদারুণ চিত্ত-বিক্ষোভ দেখা দিতে লাগল। দেশী স্বামীর ধৈর্য পরীক্ষার জন্যে সে প্রথমে গোপনে, তার পর সদরেই ইংরেজ সৈনিকদের ব্যারাকে যাতায়াত শুরু ক'রে দিল। একদিন আর সহ্য করতে না পেরে আলী শাহ্ প্রহার ক'রে তাকে বাড়ি থেকে দূর ক'রে দিল।

মাত্রাটা একটু বেশী হয়ে গেলেও, সে এই পরিণতিই চাইছিল। কারণ রয়েল ফুসিলিয়ার্স রেজিমেণ্টের একজন তরুণ অফিসরের সঙ্গে সে তখন বন্দোবস্ত ক'রে নিয়েছিল। এই অফিসরটির নাম গাই মেনওয়ারিঙ, তার চেয়ে বয়সে ঢের ছোট···সে জানত, একজন বুড়ো পাকা ঝুনোকে ব্ল্যাকমেল করার চেয়ে, অল্প বয়সের ছোকরাদের ব্ল্যাক-মেল করা অপেক্ষাকৃত সহজ। আলী শাহের গৃহ থেকে বিতাড়িত হয়ে সে গাই-কে একদিন কানে কানে জানিয়েছিল, তার গর্ভে যে সন্তানটি এসেছে, নিঃসন্দেহে সে তারই বীর্যসম্ভূত। গাই মেনওয়ারিঙের বিলিতী শিভালরী তাতে বিন্দুমাত্র দমে গেল না।

বিবাহের পর স্থির হলো, হোমে তারা "হনিমুন" উদ্‌যাপন করবে। ছ'মাসের ছুটি নিয়ে স-বৎসা নব-বধূকে সঙ্গে ক'রে গাই লণ্ডনে এল, সেখানে মিসেস মেনওয়ারিঙ নবতম স্বামীকে একটি কন্যারত্ন উপহার দিল। কন্যাটির গায়ের রঙ গাই যতখানি শুভ্র হবে বলে আশা করেছিল, কার্যত তা হলো না। এবং মেয়েটি একটু বড় হতেই গাই দেখল মেয়ের মুখের গড়ন তার চেয়ে আলী শাহ্-এর মুখের সঙ্গেই বেশী মেলে। এবং একদিন যখন স্বামী-স্ত্রীতে রীতিমতো ঝগড়া হচ্ছিল, মিসেস্ মেনওয়ারিঙ রাগের মাথায় সে-কথা নিজের মুখেই স্পষ্ট স্বীকার করল, জানিয়ে দিল যে গাই-এর সন্দেহ অমূলক নয়। গাই-এর বাপ-মা ইংলণ্ডের উচ্চস্তরের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আসল নীল-রক্তওয়ালা সম্ভ্রান্ত লোক ছিলেন। তাঁরা পুত্রের ভারতীয় ভ্রান্তির কথা জানতেন এবং সেইজন্যে পুত্রকে তাঁরা গ্রহণ করেন নি। গাই একেবারে নিঃসঙ্গ সমাজচ্যুত হয়ে পড়ল। অসহায় শিশু যেমন মার কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ে তেমনি ধারা সকল দিক থেকে বঞ্চিত হয়ে প্রায় স্ত্রীর আলিঙ্গনের মধ্যেই নিজেকে বিলুপ্ত ক'রে দেবার চেষ্টা করল। তার তাজা বিলাতী-রক্তের সঙ্গে সঙ্গে তার জাতের যা

প্রধান বিশেষত্ব তা পেয়েছিল, অস্‌ট্রিচ পাখির মতোন বালিতে মাথা গুঁজে বাস্তবতার হাত এড়ানো। নিজের কর্তব্য কর্মের মধ্যে সে ভুলে গেল অতীতের ভ্রান্তির জ্বালা।

ছুটির মেয়াদ শেষ হয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে গাই ঠিক করল, সে পেশোয়ারে তার রেজিমেণ্টে ফিরে যাবে। কিন্তু মিসেস্ মেনওয়ারিঙ এত কাণ্ড ক'রে যে স্বর্গ-লোকে এসে পৌঁছিয়েছে, সেখান থেকে নড়তে কিছুতেই চাইল না। তাই সে ভারতবর্ষে ফিরে না যাবার একটা অছিলা বার করল, পলিটেক্‌নিক কলেজে সে যখন ভর্তি হয়েছে, তখন সেখানকার পড়া শেষ ক'রে তাকে একটা ডিপ্লোমা নিতেই হবে।

গাই তাতে বিশ্বাস করল। নিজের মাইনের অর্ধেক স্ত্রীর নামে বন্দোবস্ত ক'রে দিয়ে সে ভারতবর্ষে ফিরে এসে উপজাতিদের সঙ্গে লড়াই-এ ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

ওধারে মিসেস মেনওয়ারিঙ সেই-টাকায় সিনেমা, হোটেল, কক্‌টেল পার্টি এবং নৈশ-ক্লাব উপভোগ ক'রে বেড়াতে লাগল। বেস্‌ওয়াটারে যেখানে সে থাকত, সেখানে ভারতবর্ষ থেকে বহু এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান রাজকার্য থেকে অবসর গ্রহণ ক'রে বসবাস স্থাপন করেছিল। ভারতবর্ষের সঙ্গে তাদের আর কোন যোগসূত্র ছিল না এবং স্বজাতির সঙ্গেও তাদের আর কোন সম্পর্ক রাখা তারা প্রয়োজন বোধ করত না। সেই এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান-সমাজ মহাসমাদরে মিসেস্ মেনওয়ারিঙকে গ্রহণ করল। তাতেই মেমসাহেব ধরে নিল যে এতদিন পরে সে পাকা ইংরেজ রমণী হতে পেরেছে, এবং তাতে আর কোন সন্দেহ আর থাকে না। কিন্তু এই সব অন্তঃসারশূন্য লোকদের সমাজে প্রতিপত্তি জাহির ক'রে তার কোন সুখই হয় না। এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান, তাদের না-আছে কোন বিশেষ কালচার না-আছে কোন বৈশিষ্ট্য···যা অর্জন করেছে, তা পেতে তাদের আত্মাকে পর্যন্ত বিকিয়ে দিতে হয়েছে। তাই মিসেস মেনওয়ারিঙের দুরাকাঙ্খা জেগে উঠল, সত্যিকারের সভ্যতার মধ্যে থেকে কিছু জীবনের রসদ সংগ্রহ করা। বোহিমিয়ার এক কবির সঙ্গে এক সভায় তার আলাপ হয়। আলাপের সূত্রপাত হয় অটোগ্রাফ খাতায় কবির নাম স্বাক্ষর নিয়ে এবং রক্ষিতা হিসাবে বোহিমিয়া যাবার নিমন্ত্রণে তার পরিসমাপ্তি ঘটে। যে-টুকু বিদ্যা সে অর্জন

করেছিল, তাতে প্রত্যেক মিল-দেওয়া ছড়াকে সে কবিতা মনে করত এবং প্রত্যেক অটোগ্রাফের ছবিকে মনে করত আর্টের সৃষ্টি। যে কোন কবি বা চিত্রকর তাকে শয্যাসঙ্গিনীরূপে অনায়াসেই পেত···শুধু তাকে একটু স্বীকার করার অপেক্ষা মাত্র। কিন্তু তার পর দু'দিনের আলাপেই তারা বিরক্ত হয়ে যেত···শুধু হলিউডের ছবির কথা আর তার নায়ক-নায়িকার অসম্ভব-অবাস্তব-গল্প ছাড়া তার মানসিক উৎকর্ষের প্রমাণ দেবার মতো তার আর কিছুই ছিল না। তখন তারা তাকে দেখলে পালিয়ে বেড়াত।

গাই নিয়মিতভাবে, আদর্শ স্বামীর কর্তব্য অনুযায়ী তাকে চিঠি লিখত। তার কাছে ভারতবর্ষে চলে আসবার জন্যে আবেদন জানাত! ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শেখানোর অজুহাতে সে আবেদন এড়িয়ে চলত, অবশেষে একদিন তার কি সুমতি হলো, সে স্বামীকে লিখে জানাল, বড় ছেলেটির বোর্ডিং এ থাকার ব্যবস্থা ক'রে ছোট মেয়েটিকে সঙ্গে নিয়ে সে ভারতবর্ষে যাচ্ছে কিন্তু মাত্র এক বৎসরের জন্যে। তবে পেশোয়ারের গরমে সে থাকতে পারবে না।

চিঠি পেয়েই গাই সিমলা পাহাড়ে আনানডেল পাড়ায় একটা ছোট ফ্লাট ভাড়া ক'রে ফেলল। পেশোয়ারের উত্তপ্ত পথে-প্রান্তরে সে রেজিমেন্টের সঙ্গে বেড়াক···তার স্ত্রী যেন ভারত গভর্নমেণ্টের শৈল-রাজধানীর স্নিগ্ধ শৈত্যের সব সুখটুকু পায়! মাঝে মাঝে দু'এক সপ্তাহের ছুটি নিয়ে সেই সুখ শৈলে গিয়ে উঠলেই হবে।

এই সিমলা-যাত্রার পথেই মিসেস্ মেনওয়ারিঙের সঙ্গে মুন্নুর দেখা।

॥ ষোলো ॥

মিসেস মেনওয়ারিঙকে মুন্নু এক অভূতপূর্ব বিস্ময়ে চেয়ে চেয়ে দেখে··· কিসের এক অজ্ঞাত উত্তেজনায় তার হাড়ের ভেতর পর্যন্ত যেন চঞ্চল হয়ে ওঠে। মেমসাহেব তার শুভ্র কোমল হাত দিয়ে তার হাত ধরে, তার পিঠ চাপড়ায়, তার দিকে চেয়ে কি রকম ক'রে হাসে! কোন মেমসাহেব, মেমসাহেব কেন, কোন স্ত্রীলোকই ওভাবে এত কাছ থেকে তার সঙ্গে এতখানি অন্তরঙ্গভাবে মেশে নি। মনে পড়ে শ্যামনগরে, যখন সে আরও ছোট ছিল, ছোট্ট শীলাকে দেখে তার দেহের ভেতর যেন কি রকম অস্বস্তি হতো···মনে পড়ে প্রভুদয়ালের স্ত্রীর কোলের

ওপরও সে অনেকদিন বসেছে···লক্ষ্মীকে ভালোবেসেছে···কিন্তু আজ মেম-সাহেবকে দেখে এবং মেমসাহেবের সংস্পর্শে তার মধ্যে অব্যক্ত যে চেতনা জেগে উঠছে, আর কোন দিন সে তা অনুভব করে নি।

তবে একথা ঠিক যে, তার ভীরু দরিদ্র চিত্তে, সে কোন বৃহৎ সম্ভাবনার কথা ভাবতেই পারত না। তাই অর্ধভীত অর্ধআনন্দিত চিত্তে সে শুধু এইটুকু চিন্তা ক'রেই সুখী ছিল যে, তার বরাতেও এই সান্নিধ্যের সৌভাগ্য জুটেছে। মেমসাহেবের এই যে অযাচিত স্নেহ, এ শুধু দয়া—না, তা ছাড়া আর কিছু সে ভাবতে পারত না।

তাকে যে কি-কি কাজ করতে হবে, তা সে বুঝতে পারে না। তবে এইটুকু সে বুঝতে পারে যে সদাসর্বদাই মেমসাহেবের কাছাকাছি থাকতে হবে, যাতে ক'রে মেমসাহেব ডাকলেই সে হাজির হতে পারে এবং মেমসাহেব যা আদেশ করবেন, তখনই তাই করতে হবে।

ভোর হতেই খানসামা আল্লা দাদ তাকে ডেকে তুলত। তখন উনুন ধরাতে হতো। উনুন ধরলে তাতে মেমসাহেবের চায়ের জল চড়াতে হতো। আল্লা দাদ তখন মৌজ ক'রে সাদা দাড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে প্রাতঃকৃত্য সমাপনের উদ্যোগে তামাক টানত।

তাড়াতাড়ি চা তৈরি ক'রে ট্রেতে সব জিনিস-পত্র গুছিয়ে, মুন্নু একবার আল্লা দাদকে দেখিয়ে 'নয়—সব জিনিস ঠিক মতো নেওয়া হয়েছে কিনা। তার পর সেগুলো নিয়ে মেমসাহেবের শোবার ঘরে গিয়ে হাজির হতে হয়।

ততক্ষণ হয়তো সার্সি ঘুম থেকে উঠে খাবারের জন্যে বায়না ধরেছে।

রাত দুটো কি তিনটের আগে মেমসাহেব ঘুমোতে যেতে পারে না, তাই সকালবেলা মেয়ের চেঁচামেচিতে ঘুমের ব্যাঘাত হয়···তন্দ্রাজড়িত চোখে মেয়েকে গালাগাল দিয়ে ওঠে। জোর ক'রে তাকে দাঁত মাজতে পাঠাতে হয়, নইলে ছোট হাজরী খেতে পাবে না, ভয় দেখাতে হয়। মেয়েও তেমনি দুরন্ত। মার কথা সাধ্যমতো কানেই তোলে না। যা বায়না ধরবে, তক্ষুণি তাই চাই। অনেকদিন রাগে গজগজ করতে করতে বিছানা থেকে উঠেই মেমসাহেব দু'ঘা মেয়ের পিঠে বসিয়ে দেয়···তারপর তাকে চাকরদের কাছে পাঠিয়ে দেয়। নিজে তাড়াতাড়ি একটা ময়লা স্কার্ট টেনে নিয়ে পাজামার ওপরে কোনরকমে চাপিয়ে

দেয়, তার পর মাইকেল আর্লেনের 'গ্রীন্‌ হ্যাট্‌'খানা খুলে চায়ের কাপে চুমুক দেয়।

মুন্নু তখন বসবার ঘর, বারান্দা ঝাঁট দিতে শুরু করে। সামনেই বর্ষায়ভেজা আনানডেলের সবুজ বনানী··· বাতাসে পাইনের প্রাণদায়ী সুগন্ধ···

মিসেস্‌ মেনওয়ারিঙ নীরবে চেয়ে দেখে, আপনার মনে মুন্নু কাজ ক'রে চলেছে, মনে ভাবতে চেষ্টা করে, ছেলেটা কি ভাবছে। ওরা কি সত্যিই কিছু ভাবে! ইচ্ছে যায় ছেলেটাকে কাছে ডেকে জিজ্ঞেস করে, তার সঙ্গে একটু গল্প করে। কিন্তু সে তো চাকর! চাকরের সম্পর্কে এ-সব চিন্তা তার মনে আসে কি ক'রে? মেমসাহেব নিজেই বিস্মিত হ'য়ে ভাবে! সেই সঙ্গে মনে হয়, সে যেন নিজেই মাইকেল আর্লেনের নায়িকা আইরিশ স্টর্ম···জগতের সবাই তাকে ভুল বুঝেছে।

নিজের মনেই সে নিজে বলে ওঠে, জগৎ কেন বোঝে না, নারী কি ভাবে নিত্য নিজেকে বিলিয়ে দিচ্ছে, কখনো প্রেমে কখনো ঘৃণায়, কখনো করুণায়, কখনো বা শুধু খেলাচ্ছলে, শতরূপে শতভাবে? কি অধিকার আছে জগতের বিচার করবার। আজ যদি আমি এই বালকটির কাছেই নিজেকে সমর্পণ করি, ক্ষতি কি তাতে! কেনই বা আমি তা পারি না?

মুন্নুর তরুণ সজীব দেহ-রেখার দিকে চেয়ে থাকতে, তার চপল দ্রুতগতি-ভঙ্গীর সহজ অভিব্যক্তি দেখতে দেখতে মেমসাহেবের মনের গহন গভীরে কি যেন অব্যক্ত চাঞ্চল্য জেগে ওঠে। কিন্তু আইরিশ স্টর্মের মতোই তার দেহ ছিল এক রাজ্যে···মন কিন্তু বাঁধা আর এক রাজ্যে। তাই সিমলার আবহাওয়া, যে আবহাওয়াতে স্বভাবতই মানুষের মন আনন্দ-লোভী হয়ে ওঠে, তার ওপর সব দোষ চাপিয়ে দিয়ে সে উঠে পড়ে, ঘরের মধ্যে পায়চারী করতে করতে দীর্ঘ কালো কেশ এলিয়ে দিয়ে আঁচড়াতে শুরু করে। দীর্ঘশ্বাস ফেলে আয়নায় লক্ষ্য করে, কালো চুলের ফাঁকে ফাঁকে দু-একটা ক'রে সাদা দেখা দিয়েছে।

মেমসাহেবের প্রসাধন সম্পর্কে মুন্নুর একটা বিরাট কৌতুহল ছিল। তাই সে-সময় সে কোন-না-কোন কাজের অছিলায় ঘরের মধ্যে ঘুরত-ফিরত।

'বয়, গোল কামরা থেকে আমার কাঁচিটা নিয়ে আয়।' মেমসাহেব আদেশ করে।

কাঁচি নিয়ে মুন্নু যখন দেবার জন্যে হাত বাড়ায়, ইচ্ছে ক'রেই মেমসাহেব তার হাত চেপে ধরে···

'ইস, কি নোংরা ছেলে! হাতে কি ময়লা লেগে দেখতো? হাতের নখগুলোও কাটতে পার না? দেখি, আমি কেটে দিচ্ছি।'

মুন্নু আত্মসমর্পণ করে।

মেমসাহেব অতি সন্তর্পণে তার সুকোমল হাত নিয়ে মুন্নুর আঙুল নাড়াচাড়া করে, মুখে অর্ধ-বিকশিত স্নিগ্ধ হাসি। অন্যমনস্কতার ছলে ডান-পায়ের ওপর থেকে সুকৌশলে দেহাবরণ সরিয়ে নেয়। মাঝে মাঝে ইউ-ডি-কোলন সিক্ত রুমালটা তুলে নিয়ে মুখের সামনে ঘোরায়।

ক্ষৌরকার্য শেষ ক'রে মেমসাহেব মুন্নুর দিকে চেয়ে হেসে বলে ওঠে:

'সুন্দর ছেলে! দেখ দেখি, কেমন সুন্দর দেখাচ্ছে! এখন একটা বউ হলেই হয়!'

মেমসাহেবের সুকোমল স্পর্শে তখন মুন্নুর শরীরের ভিতর তরঙ্গ জেগে উঠেছে···সেই উষ্ণ সুবাসের মাদকতায় তার মস্তিষ্ক যে আচ্ছন্ন হয়ে আসছে··· সেই একান্ত মধুর অস্বস্তির লজ্জা থেকে আত্মরক্ষার জন্যে সে আর নিজেকে ধরে রাখতে পারে না। হঠাৎ মেমসাহেবের পায়ের তলায় লুটিয়ে প'ড়ে সেই দুটি নরম রাঙা পা জড়িয়ে ধরে···ঘন চুম্বনে আর দুর্বার অশ্রুতে ভিজে যায় রাঙা পা।

মেমসাহেব চেয়ার ছেড়ে ছিটকে উঠে পড়ে, লাথি মেরে মুন্নুকে সরিয়ে দেয়, সরু গলায় চিৎকার ক'রে ওঠে: 'এত বড় আস্পর্ধা! বেয়াদপ! শিগ্গীর উঠে কাজে যা···জল্দি ব্রেক-ফাস্ট লে আও! যাও!'

মহা-অপরাধীর মতো মুন্নু ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে চাকরদের ঘরে গিয়ে ওঠে, ভাবে, এ কি ক'রে ফেলল সে! কি ক'রে মেমসাহেবের সামনে সে আবার মুখ তুলে দাঁড়াবে? যেতেই হবে···ব্রেক-ফাস্ট তৈরি···মেমসাহেবের এক্ষুনি চা দরকার! ট্রে তুলে নিয়ে ঘরে ঢোকে।

ছোট্ট সার্সি তার বিপদ বাড়িয়ে তুলল। খাবার দেবার জন্যে নীরবে সে টেবিল সাজাচ্ছিল···হঠাৎ শিশুসুলভ কৌতূহল ছোট্ট সার্সি জিজ্ঞেস ক'রে উঠল: 'কাঁদছো কেন মুন্নু? ম্যামি বকেছে বুঝি?'

মনুয়া কোন উত্তর দেয় না।

মিসেস মেনওয়ারিঙের ব্রেক-ফাস্ট শেষ হতে লাগে প্রায় চার ঘণ্টা। ইংলণ্ডে থাকবার সময় তার ধারণা হয় যে, তার কোন কঠিন রোগ হয়েছে। নানা ওষুধ-পত্র খেয়ে যখন কোন ফল হলো না, কারণ আসলে কোন বিশেষ রোগই তো হয়নি, তখন একজন নেচার কিওর বিশেষজ্ঞ উপদেশ দিলেন যে ওসব ওষুধপত্র বাজে···রোজ ব্রেকফাস্টের সময় যদি তিনি অন্য কোন খাদ্য গ্রহণ না ক'রে শুধু ফল খান, তাহলে তাঁর সব রোগ সেরে যাবে। সেই ব্যবস্থা মেমসাহেবের কাছে রীতিমতো বিজ্ঞ এবং বৈজ্ঞানিক বলে মনে হলো, কারণ সারা সকালটা চেয়ারে বসে একটা একটা ক'রে ফল ছাড়িয়ে খেতে খেতে দুপুর এসে যেত···আপেল, বেদানা, ন্যাসপাতি থেকে আরম্ভ ক'রে খোলা ছাড়ানো আটটি বাদাম পর্যন্ত, মেমসাহেবের ব্রেক-ফাস্ট টেবিলে বাজারের সেরা সব ফলই সাজানো থাকত। এই ওষুধের ব্যবস্থার ফলে মেমসাহেবের অসুখ ভালো হয়ে উঠেছিল, তাই এ ওষুধ পরিবর্তন করা সে আর প্রয়োজন বোধ করে নি।

ব্রেক-ফাস্ট শেষ হতে না হতেই টিফিন এসে হাজির হতো।

সেদিন টিফিন সেরেই মেমসাহেব হুকুম করল: 'আলা দাদ, রিক্‌শা বোলাও। তিন কুলি···চৌঠা কুলি মনুয়াকে জোড় দেও!'

সিমলার উঁচু-নীচু পাহাড়ের-পথে চারজন কুলিতেই একটা রিক্‌শা টানে। এবং ভারতের এই শীত-রাজধানীর পথে রিক্‌শা গাড়িই একমাত্র যান-বাহন। শুধু সেই শৈলবাসী তিনজন ভাগ্যবান মোটর বা অশ্বচালিত অন্য যান ব্যবহার করতে পারেন: বড়-লাট, কমাণ্ডার-ইন্-চীফ এবং পঞ্জাবের গভর্নর। এই তিনজন ছাড়া, আর কোন ব্যক্তিই, তিনি মহারাজাই হোন্ আর পার্লামেণ্টের সভ্যই হোন্, সিমলার পথে রিক্‌শা ছাড়া আর কোন যান ব্যবহার করতে পারেন না।

কিছুক্ষণ রিক্‌শা টানার পর মুনুয়া বুঝল, ব্যাপারটা প্রথমে সে যা আন্দাজ করেছিল, মোটেই তা নয়। মোহন রিক্‌শাওয়ালার কাছে সে শুনেছিল, রিক্‌শাটানা রীতিমতো একটা আর্ট। বহুদিনের কসরতের পর এই আর্ট আয়ত্ত করা সম্ভব। বহু জিনিস অভ্যাস করতে হয়, কি ক'রে দম থাকতে হয়, কি ক'রে পায়ের কায়দায় 'ব্যালান্স' ঠিক রাখতে হয়, খাড়া নিচু নামবার সময়

মোটরের ব্রেকের মতো কি ক'রে পা দুটিকে ব্যবহার করতে হয়···একটু অসাবধানতা, একটু অপটুতার ফলে অনর্থ ঘটে যেতে পারে। মুন্নু তখন এসব কথা হেসেই উড়িয়ে দিয়েছিল, এখন বুঝল তা অক্ষরে অক্ষরে সত্য।

কিন্তু দমবার পাত্র সে নয়। শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে সে তার অপটুত্বকে মানিয়ে নিতে চেষ্টা করে। ফলে তার শ্বাস যন্ত্রের ওপর অত্যধিক চাপ পড়তে থাকে। হাঁপিয়ে ওঠে, যেন দম ফুরিয়ে যায়। কিন্তু তবুও সে দমে না। সহকর্মীরা তার ঐকান্তিকতা দেখে সাবাস দেয়ঃ 'সাবাস্ ভাই সাবাস্!'

ক্রমশ রিক্শা "ম্যালে" প্রবেশ করে। দু'ধারে সুসজ্জিত সব দোকান···মুন্নু দেহের শ্রান্তির কথা ভুলে গিয়ে সেই দিকে চেয়ে চেয়ে অগ্রসর হয়। সজ্জিত বৃহত্তর জীবনের সেই মহামূল্য উপকরণ তার চিত্তকে চুম্বকের মতো আকর্ষণ করে। 'হোইট্‌ওয়ে লেড্‌ল', 'লরেন্স এণ্ড মেয়ো', 'সাহেব সিং এণ্ড কোং'··· একে একে সকলের পাশ দিয়ে সে এগিয়ে চলে। দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার জন্যে প্রত্যেকে দোকানে কাঁচের ভেতর থরে থরে সাজানো সব বিচিত্র উপকরণ··· প্রত্যেকটি জিনিস যেন মুন্নুকে নামধরে ডাকে···মুন্নু শুধু চেয়ে চেয়ে দেখে··· একটা দোকান পেছনে পড়ে যায়···আর একটা আসে···

ড্যাভিকোর হোটেলের সামনে মেমসাহেবের রিক্শা এসে থামে, সেখানে মেমসাহেবের চায়ের নিমন্ত্রণ আছে।

মুন্নু গলা বাড়িয়ে হোটেলের মুক্ত দরজা দিয়ে ভেতরে কি হচ্ছে দেখতে চেষ্টা করে, ইংরেজরা নিজেদের মধ্যে কি করে' কি ভাবে চলে ফেরে, তা' দেখবার, জানবার, কৌতূহলের তার অন্ত নেই।

রিক্শা টানার কাজের প্রথম দিনের অভিজ্ঞতার ফলে রাত্রিতে মুন্নুর জোর জ্বর এল।

ফেরবার সময়েই তার মনে হচ্ছিল তার পায়ের হাড়গুলো সব যেন ভেঙে গিয়েছে। ঘরে এসে সে আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না। সমস্ত দেহ ঝিমঝিম করতে লাগল। সে শুয়ে পড়ল। কিন্তু তাতেও কোন শান্তি দেখা দিল না। মনে হলো তারগলা যেন শুকিয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছে। উঠে, ঢক্‌ঢক্ ক'রে এক কুঁজো জল খেয়ে ফেলল। কিন্তু পরক্ষণেই আবার যেন গলা শুকিয়ে এল।

হাত দুটো যেন আপনা থেকে দুমড়ে যাচ্ছে···দেহ থেকে পা দুটো ছিঁড়ে পড়ছে। শরীরের ভেতর রক্ত যেন টগবগ ক'রে ফুটছে।

আলা দাদ বাজারে গিয়েছিল। বাজার থেকে ফিরে ঘরে ঢুকতে, অন্ধকারে দেখতে-না-পেয়ে, মুন্নুর গায়ের ওপর সে হুমড়ি খেয়ে পড়ল : 'কে? কে এখানে?'

মুন্নু কোন উত্তর দিতে পারল না। শুধু অস্ফুট কাতরানীতে তার অস্তিত্ব জানিয়ে দিল। আলা দাদ গায়ে হাত দিয়ে বুঝল, জ্বর হয়েছে। মেমসাহেবকে খবর দেবার জন্য ছুটল।

মেমসাহেব চিন্তিত হয়ে পড়ল। সে আর যাই হোক, সে-ও মা। দুটি অপগণ্ড শিশুর সে জননী। তার ছোট ছেলেটির জ্বর হ'লে, সে যে-রকম ভীত, বিব্রত হয়ে পড়ে, মুন্নুর জ্বরের কথা শুনে তেমনি বিব্রত হয়ে উঠল। তাড়াতাড়ি মুন্নুকে তুলে নিয়ে, দোতলায় যে-ঘরে তার ছেলে থাকে, সেইখানে তাকে শুইয়ে দিল। মুন্নু নিজে প্রতিবাদ ক'রে উঠল···সে চাকর···দোতলার ঘরে কি ক'রে সে শোবে!

মিসেস্ মেনওয়ারিঙ সে-কথায় কর্ণপাত না ক'রে ডাক্তার ডাকতে পাঠালেন। যা-তা ডাক্তার নয়, মেজর মার্চেণ্ট, সিমলার হেলথ অফিসার, তাঁকেই নিয়ে আসা হলো।

মেজর মার্চেণ্ট এসে যথারীতি রোগীকে দেখলেন, টেম্পারেচার নিলেন, ওষুধের ব্যবস্থা লিখে দিলেন। যথারীতি রোগীকে উৎসাহ দিয়ে বলে উঠলেন : 'ডরো মত্, অভি আচ্ছা হো যায়ে গা!'

কিন্তু চলে যেতে পারলেন না। মিসেস মেনওয়ারিঙ সম্পর্কে তাঁর তীব্র কৌতুহল জেগে উঠল। একজন শ্বেতাঙ্গ রমণী তার কালো নেটিভ চাকরকে কিসের জন্যে দোতলার ঘরে তার নিজের ছেলের শয্যার পাশে শুতে দিতে পারে?

মার্চেণ্ট একজন ভারতীয় ক্রিশ্চান। ভারতবর্ষে, সাধারণতঃ খ্রীস্টধর্ম গ্রহণ করে, তাদের অনেকের মতো, তিনি ছিলেন একজন দেশী মুচির ছেলে! একজন ইংরেজ মিশনারী দয়া পরবশ হ'য়ে শিশুকালে তাঁকে মিশনের আশ্রমে নানা রকমের উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে তিনি ইংরেজদের সঙ্গে গায়ে গা-ঘেঁষে

এগিয়ে চলতে থাকেন। পড়বার জন্যে ইংলণ্ডে বাস করবার সময় ইংরেজ সমাজে মেলা-মেশার ফলে ক্রমশ নিজেকে একজন পাকা ইংরেজ রূপেই তিনি ভাবতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েন। এই বিশ্বাসের মূলে তিনটি জিনিস বিশেষভাবে তাঁকে সাহায্য করে, প্রথম—ছেলেবেলা থেকে ইংরেজ মিশনারীদের সঙ্গে মেলামেশার ফলে তাঁর ইংরেজী উচ্চারণটা দোরস্ত হয়ে গিয়েছিল, দ্বিতীয় ইংলণ্ডে কোন থিয়েটারে কোরাস্-দলের একটি মেয়েকে বিবাহ করবার সৌভাগ্য তাঁর ঘটে, তৃতীয়—য়ুরোপীয় হাব-ভাব আয়ত্ত করবার তাঁর একটা স্বাভাবিক প্রতিভা ছিল। তাই জীবনের আরম্ভ-মুখে বুদ্ধিমানের মতো, নিজের মুচী নাম বদলে মার্চেণ্ট ক'রে নিয়েছিলেন। তাই মিসেস্ মেনওয়ারিঙের গায়ের রঙের দিকে চেয়ে তাঁর বুঝতে দেরী হয়নি যে, তাঁদের দু'জনেরই গায়ের রঙের ঈষৎ মলিনতা একই রক্ত-মূল থেকে এসেছে।

রোগীর ঘর থেকে বেরিয়ে বাইরের ঘরে এসেই তিনি জিজ্ঞেস করলেন: 'এ ছেলেটা কে, মিসেস্ ম্যানিঙ ?'

'আমার চাকর…বোম্বেতে পেয়েছিলাম…হ্যাঁ…দেখুন…আমার নাম ম্যানিঙ নয়, মেনওয়ারিঙ, মিসেস্ মেনওয়ারিঙ !'

মেজর তাড়াতাড়ি নিজের ভুল শুধরে নেবার চেষ্টায় বলেন: 'মাফ করবেন। আপনার খানসামা গিয়ে বলল, ময়না, না কি, ঠিক, বুঝতে পারলাম না…তাই ধরে নিয়েছিলাম বোধ হয় ময়না নয়, ম্যানিঙই হবে।'

'ভুলটা শুধরে নিন এবার…মেনওয়ারিঙ। ঠিক মতো উচ্চারণ করা একটু শক্ত বোধ হয়।'

মেজর সে-প্রচ্ছন্ন আঘাত বুঝতে পারেন: বুঝেই এবার আরও স্পষ্ট ক'রে তিনিও প্রতি-আঘাত করেন: 'যাক আপনার নামটা উচ্চারণ করা কঠিন হলেও, আপনি কিন্তু খুব কঠিন লোক নন্। সিমলাতে অন্য যে সব অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান আছে, তারা একেবারে, যাকে বলে যাচ্ছেতাই। তাই না ?'

মিসেস্ মেনওয়ারিঙ জবাব দেন: 'হবে।'

কথাটা একটু পালটে নেবার জন্যেই মেজর জিজ্ঞেস করেন: 'আপনি কতদিন সিমলাতে আছেন ?'

'এই ক'দিন হলো হোম থেকে এসেছি।'

'তাই নাকি ?'

হোমের নামে মেজরের চোখ আনন্দে যেন জ্বলে ওঠে। মিসেস্ মেনওয়ারিঙ সেইটুকুতেই খুশী হয়ে ওঠেন, একটা চেয়ার এগিয়ে দিয়ে বলেন : 'দাঁড়িয়ে থাকবেন কতক্ষণ ? বসুন, একটা পেগ ইচ্ছা করেন যদি…'

মার্চেণ্ট চেয়ারে টেনে জমে বসেন।

'তাহলে বলুন, হোমের এখন খবর কি ?'

হোমের গল্প করতে করতে মিসেস্ মেনওয়ারিঙের নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে যাবার সময় হয়ে এল। নিচের তলায় স্টুয়ার্টদের ওখানে মেমসাহেবদের ডিনারে নিমন্ত্রণ! হঠাৎ একটু কথা বলতে গিয়ে তারা দু'জনেই দেখলো, এত কথা তাদের দু'জনের মধ্যে বলবার আছে যে এক-আধ ঘণ্টার মধ্যে তা শেষ করা সম্ভব নয়। তাই মেমসাহেব আগামীকাল চায়ের নিমন্ত্রণ ক'রে বসলেন। মেজর আনন্দে তা গ্রহণ ক'রে বিদায় নিলেন।

ততক্ষণ মুমু দোতলার ঘরে শুতে পাওয়ার অসম্ভব সৌভাগ্যে জ্বরের নিদারুণ যন্ত্রণা চুপটি ক'রে সহ্য ক'রে থাকবার চেষ্টা করছিল।

জ্বর থেকে সেরে উঠে মুমুকে সেই পুরানো চাকরিই করতে হয়…বাড়িতে মেমসাহেবের খাস-বেয়ারা—বাইরে মেমসাহেবের চারজন রিক্‌শা-কুলির মধ্যে একজন।

মেমসাহেবকে রোজই বাইরে বেরুতে হয়, চায়ের নিমন্ত্রণ, বাজার-করা কিংবা বায়ুসেবন…যে কোনো একটা কারণেই হোক! সিমলার মধুময় অলস জীবন তাঁর বেশ ভালো লেগে গিয়েছিল।

তিনি বুঝেছিলেন, শ্বেতাঙ্গ রমণীর পক্ষে ভারতবর্ষ হলো স্বর্গ-ভূমি। এতদিন ইংলণ্ডে থেকে সাধ্য-সাধনা ক'রে তিনি যে তাঁর গায়ের ঈষৎ মলিন রঙটুকু ধুয়ে মুছে পাকা সাদা ক'রে এনেছিলেন, এখন দেখলেন তা প্রভূত কাজে লেগেছে।

অপচয় করবার মতো এখানে অফুরন্ত সময়, সুযোগ ও সুবিধা। কারণ, আজও পর্যন্ত জগতের মধ্যে ভারতবর্ষ একমাত্র জায়গা যেখানে চাকর সত্যিই চাকর…তাদের উপর নির্ভর ক'রে তুমি অনায়াসে সকালে চেয়ারে হেলান দিয়ে আর সারা দুপুর, বিকেল পর্যন্ত, ঘুমিয়ে কাটাতে পার, তোমার মুখের সামনে

রান্না তৈরি ক'রে তোমার বয় এবং খানসামা তুলে ধরবে। ভারতবর্ষ একমাত্র জায়গা, যেখানে বাইরে থেকে তুমি ঘুরে এসে, বাড়িতে ঢুকেই যেখানে-সেখানে তোমার পোশাক-পত্র ছুঁড়ে ফেলে দিতে পার, এই বিশ্বাসে যে, তোমার চাকর তাকে সাজিয়ে-গুছিয়ে ভাঁজ-করে, ধুলো-ঝেড়ে যথাস্থানে আবার ঠিক ক'রে সাজিয়ে রেখে দেবে। যদি ছিঁড়ে যায় তারাই রাত জেগে নিখুঁতভাবে সেলাই ক'রে রেখে দেবে।

এখানে এখনও পর্যন্ত তুমি মাত্র এক শিলিং খরচ ক'রে সারাদিন ঘুরে বেড়াবার জন্যে একটা "পনি" ঘোড়া ভাড়া পেতে পার।

ঘণ্টায় মাত্র চার পেন্স খরচ ক'রে চারজন-মানুষের রিকশা পাবে।

এক ডজন ডিম পাবে ছ' পেন্সে।

কাপড় পিছু এক ফার্দিঙ হিসাবে এখানে ধোপা সুন্দরভাবে তোমার কাপড় কেচে দেবে।

এখানে বসে তুমি প্যারিসের "লেটেস্ট" ফ্যাসান দেখতে পাবে।

অবসর বিনোদনের জন্য এখানে সুন্দর সুন্দর হোটেলে বড় বড় নাচ-ঘর নাইট ক্লাব, সবই আছে।

এখানকার সিনেমায় পাবে তুমি হোলিউডের তাজা "রিলিজ" দেখতে।

ইচ্ছে করলে এখানে তুমি তিনটে ক্লাবের সভ্য একসঙ্গে হতে পার এবং পরের ঘাড়ে যত খুশী তত ককটেল খেয়ে যাও, ডজন ডজন সিগারেট পোড়াও, কারণ এখানে তামাকের ওপর ট্যাক্স নেই···এক টিন প্লেয়ারের দাম মাত্র এক টাকা।

এখানে পাশ্চাত্ত্যজগতের সমস্ত বিলাসিতা, সমস্ত সুখভোগের উপকরণ পূর্বজগতের কড়ির দামে বিকিয়ে যায়, তাই বিলেতের এঁদো গলির চুনোপুঁটি এখানে মে-ফেয়ার আজ পিকাডেলীর বড় সাহেব!

আজ মিসেস মেনওয়ারিঙ এই স্বর্গ-সুখ ষোল আনাই ভোগ করতে পেতেন না। মাঝে মাঝে রূঢ়ভাবে তাঁকে নিজের দেহের আলো-আঁধারীর দ্বন্দ্বে সচেতন হয়ে উঠতে হতো! শ্বেতাঙ্গদের য়ুনিয়ন জ্যাক ক্লাবে ভর্তি হতে গিয়ে সেদিন তা মর্মে মর্মে বুঝতে পেরেছিলেন। সে ক্লাবের সভ্য হবার অনুমতি তিনি পেলেন না। তিনি যতই চেষ্টা ক'রে নিজের আসল-রঙকে লুকোবার চেষ্টা

করুন না কেন, কানাঘুষোর হাত এড়িয়ে যাওয়া বড়ই ভাগ্যের প্রয়োজন। তবুও, সব জড়িয়ে, তিনি আনন্দেই ছিলেন।

ইতিমধ্যে মুন্নুও সেই জীবনে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিল।

বাইরে বেড়াবার সময় রিক্‌শাতে চড়ে, মিসেস্ মেনওয়ারিঙ তাঁর ছোট মেয়েকে কানে কানে যখন বলতেন : 'ঐ দেখ্, মেজর জেনারেল কুড হ্যারিঙটন যাচ্ছেন! ঐ উনি হলেন, স্যার জীজীভাই ইসমাইল···চেম্বার অফ কমার্সের প্রেসিডেন্ট···ঐ লেডী রফ্‌ফী, স্যার এম. রফ্‌ফী, ভাইস-রয়ের কাউন্সিলের সদস্য তাঁর স্ত্রী, ঐ পণ্ডিত দ্বারকাপ্রসাদ, কংগ্রেস-নেতা···ঐ লামডীর মহারানী··· তখন ছোট্ট সার্সি কি বুঝত তা সেই জানত, কিন্তু মুন্নু কান খাড়া ক'রে শুনত ···একটি কথাও যেন হারিয়ে না যায়···সেই এক নিমিষের দৃষ্টিতে প্রত্যেক মহাপুরুষের ছবিই তার মনে গাঁথা হয়ে যেত।

কিন্তু ঘনায়মান সন্ধ্যার আনন্দ-উৎসবের আয়োজনের মধ্যে দিয়ে যখন বাড়ি ফিরে আসত, তখন সে আবার বিষণ্ণ হয়ে পড়ত। মনে হতো, এই পৃথিবীতে সে একা···আপনার বলতে কেউ নেই তার। সারাদিনের পরিশ্রমে পিঠটা কনকন ক'রে উঠত—এক এক দিন এমন ব্যথা ধরত যে উঠতে বসতে পর্যন্ত কষ্ট হতো। একদিন থুতু ফেলতে গিয়ে দেখল, থুতুটা লাল।

তা নিয়ে বিশেষ কিছু মাথা ঘামানোর যে প্রয়োজন আছে, তা তার মনেই হলো না। রান্নাঘরে গিয়ে যথাসাধ্য আলা দাদকে সে সাহায্য করে। কারণ আজকাল মেজর মার্চেন্ট প্রায় প্রতিদিনই ডিনারে নিমন্ত্রিত হয়ে আসছেন।

মাঝখানে এক সপ্তাহের ছুটিতে মেনওয়ারিঙ বাড়ি এসেছিল। আসবার সময় সাহেব পেশোয়ার থেকে একটা মস্ত বড় খরমুজা নিয়ে এসেছিল। মুন্নুকে সাহেব নিজে তা থেকে খানিকটা খেতে দিয়েছিল। সাহেবদের সম্পর্কে মুন্নুর যে অভিজ্ঞতা গড়ে উঠেছিল, তাতে সে ধরে নিয়েছিল, সাহেবরা বোধ হয় হাসে না! কিন্তু মেনওয়ারিঙ সাহেবকে দেখে তার সে-ভুল ভেঙে গেল। সাহেব না-হেসে তার সঙ্গে কথা বলত না। মুন্নুর বড় ভালো লাগত। সারা মন দিয়ে সাহেবের কাজ ক'রে সে বোঝাতে চেষ্টা করত সাহেবকে তার কতখানি ভালো লেগেছে। কিন্তু সাহেব কি তা বুঝত? মুন্নু মনে মনে ভাবে, অন্য সব সাহেবগুলো মেনওয়ারিঙ সাহেবের মতো নয় কেন? তবে এই সাত-

দিনের মধ্যে গোড়ার দিকে সাহেবকে যতখানি হাসি-খুশী দেখেছিল শেষ তিন-দিন কিন্তু সাহেবকে আর সে-রকম দেখা গেল না। কেমন যেন ভার-ভার, মুন্নু তার কারণ বোঝবার আগেই সাহেব আবার চলে গেল।

মার্চেণ্ট সাহেবকে সে দু'চোখে দেখতে পারতো না। মার্চেণ্টও তাকে দেখলে খিঁচিয়ে উঠত। এসে যদি দেখত, মুন্নু মেমসাহেবের মেয়ের সঙ্গে একসঙ্গে খেলা করছে, অমনি রেগে তেড়ে উঠত। সে এলে মুন্নুর আর গোলঘরে ঢুকবার হুকুম ছিল না। তা'ছাড়া, বেড়াবার সময়, সাহেবটা অকারণে রিক্‌শাওয়ালাদের, বিশেষ ক'রে তাকে খাটিয়ে মারত। সাহেব ঘোড়ায় চড়ে আগে আগে যেত। ঘোড়ার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে তাদের রিক্‌শা টানতে হতো। মুন্নুর বুকে চাড় লাগত। দম একেবারে ফুরিয়ে যেত। সমস্ত শরীরটা কাঁপতে থাকত।

একদিন মেমসাহেবকে নামিয়ে তারা রিক্‌শার আড্ডায় বিশ্রাম করছে।

মুন্নুকে দেখেই আড্ডার একজন কুলি ঠাট্টা ক'রে বলে উঠল: 'এই যে মেমসাহেবের কুলি এসেছেন!'

মুন্নু তাদের সঙ্গে বচসা করতে গিয়ে থেমে যায়।

অন্য আর-একজন উপদেশ দেয়: 'ও মেমসাহেবের কাজ তুই ছেড়ে দে। বাড়িতে চাকরের কাজ করিয়ে নেবে, আবার রাস্তায় রিক্‌শা ঠেলাবে! এক পয়সায় ডবল মজা!'

মোহন তার কথায় সায় দেয়: 'সেই জন্যেই তো ক্ষয়কাশে মরতে বসেছে, দেখছিস না, এই বয়সেই ওর চোখ কি রকম গর্তে ঢুকে গিয়েছে···ফ্যাকাশে মুখ···'

'দেখি, তোর নাড়ী আছে, না নেই,' একজন হেসে বসে উঠল।

'রেখে দে তোদের ঠাট্টা, ভালো লাগে না···দেখি একটা সিগারেট!' মুন্নু হাত বাড়ায়।

সেদিন রাত্রি-ভোর তার কাশির শব্দে আলা দাদ ঘুমোতে পারল না।

মুন্নু মাফ চেয়ে বলে: 'সন্ধ্যাবেলার আড্ডায় একটা সিগারেট খেয়েছিলাম ···সেই জন্যেই···'

পরের দিন দাঁত মাজবার সময়, সে দেখল কাশতে গিয়ে খানিকটা রক্ত

পড়ল। আলা দাদ এবং হয়তো তার নিজের কাছ থেকেও লুকোবার জন্যে সে তাড়াতাড়ি এক মুঠো ছাই নিয়ে এসে তার ওপর চাপা দেয়। সারাদিন কাজের মধ্যে যতই সে ভুলতে চেষ্টা করে, ততই সেই একটুখানি রক্ত তাকে উন্মনা করে তোলে। কল্পনায় নানারকম বিভীষিকা দেখে আতঙ্কিত হয়ে ওঠে। তবে কি মোহন যা বলেছিল তা সত্যি? সত্যিই কি আমি মরতে বসেছি? ক্ষয়কাশ কাকে বলে তা সে জানে না…ঠিক ক'রে নেয়, এই যে বুকে ব্যথা, আর এই রক্ত…হয়তো এই হলো ক্ষয়কাশ।

একবার তার মন বলে ওঠে: 'হ্যাঁ, এই ক্ষয়কাশ…'

আবার সেই সঙ্গে মন প্রতিবাদ ক'রে ওঠে: 'না, তা নয়…বিড়ি আর সিগারেট খেয়ে গলায় ঘা হয়েছে…এই রক্ত সেই গলার ঘা থেকেই এসেছে।'

গত তিন বছরের মধ্যে এমন অনেক সময় হয়েছে, যখন সে ভেবেছে, মরলেই ভালো…কিন্তু আজ যখন সর্বশেষের সুনিশ্চিত বাণী নিয়ে মৃত্যুর-জিজ্ঞাসা বড় বড় অক্ষরে তার সামনে ফুটে উঠল তখন অন্তরের অন্তরতম স্থল থেকে সে বলে উঠল: 'না, না, আমি মরতে চাই না! মরতে চাই না!'

সত্যমিথ্যা কাকে জিজ্ঞাসা করবে? অনেক ভেবেচিন্তে তার হঠাৎ মনে পড়ল রতনের কথা…তাকে সব কথা সে নিজে জানাবে…তার উপদেশ চেয়ে পাঠাবে। সেই অসহায় নিঃসঙ্গ অবস্থায় ক্রমশ সে বেপরোয়া হয়ে উঠেছিল, একটা যা হোক কিছু করতে হবে! যে রতনের কথা সে একেবারে ভুলেই গিয়েছিল, তাকেই চিঠি লিখবে সে…সে পুরনো বন্ধু…আর রতন যদি মরে গিয়ে থাকে, তবে তারই বা মরতে আপত্তি কি থাকতে পারে? আর পালোয়ান যদি বেঁচেই থাকে, চিঠি পেলে নিশ্চয়ই সাহায্য করতে সে আসবে।

সেদিন সকাল থেকে মেমসাহেবকে বড়ই উতলা দেখাচ্ছিল। লাটসাহেবের বল্‌নাচে মেমসাহেব যাবে, তারই আয়োজন চলছিল। মুন্নুকে তাড়াতাড়ি পাঠাল দর্জির বাড়ি, চীনা-মুচী হোওয়াঙের কাছে এবং সেই সঙ্গে মার্চেণ্ট সাহেবের কাছে। ফেরবার পথে পোস্টঅফিসের সামনে দাঁড়িয়ে সে রতনকে সব কথা জানিয়ে চিঠি লিখলো। চিঠির শেষে জানাল, বোম্বে ফিরে যাবার জন্যে সে সত্যিই ব্যাকুল।

মার্চেণ্ট সাহেব আবার মুন্নুকে পাঠাল পলিটিক্যাল ডিপার্টমেণ্টের মিঃ দাসের

কাছে একটা জরুরী চিঠি দিয়ে। যেমন ক'রে হোক, বড়লাটের নাচে প্রবেশাধিকারের জন্যে তাঁকে একটা টিকিট যোগাড় ক'রে দিতেই হবে।

মনু যখন কাজ সেরে ফিরছিল তখন সিমলার পাহাড়ের মাথায় মাথায় বর্ষার কালো মেঘ থরে থরে জমে উঠছিল। বাংলো আর প্রায় একশো গজ দূরে, এমন সময় মাথার ওপর ঘন কালো মেঘে বজ্র ডেকে উঠল। বারান্দায় পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তীরের মতো বর্ষার ধারা নেমে এল।

ঘণ্টার-পর-ঘণ্টা সমানে চলল বর্ষণ···মুহুর্মুহু বজ্রের নির্ঘোষে পর্বতভূমি অনুরণিত হয়ে ওঠে···বিদ্যুৎ ঝিলিকে সিমলার শ্যাম অরণ্যানী সেই বর্ষাঘন-অন্ধকারে বড় অপরূপ লাগে মনুর চোখে।

তার পর ধীরে ধীরে উত্তর দিক থেকে বাতাস এসে মেঘগুলোকে প্রান্তরের দিক টেনে নিয়ে যায়, যেখানে বন্যাপ্লাবিত শতদ্রু পড়ে আছে, যেন গলিত রৌপ্যের সমুদ্র।

দু' তিন-ঘণ্টা বিরামের পর আবার সেই বৃষ্টি আর বিদ্যুৎ আর বজ্র। অমনি চলে তিন দিন ধরে। বন্ধ ঘরে অসুস্থ দেহে ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে মন।

আকাশ একটু পরিষ্কার হলে, মনু রিক্‌শার আস্তায় বেরিয়ে পড়ল মোহনের সঙ্গে গল্প করবার জন্যে! একটু সহানুভূতি একটু স্নেহের স্পর্শের সংগোপন লোভ!

মোহন তখন তার কুঁড়েঘরের দাওয়ায় বসে গল্প-গুজব করছিল। আর দশ বারজন কুলি সেখানে জমায়েত হয়েছে, কেউ কেউ খেতে বসেছে, কেউ বা শুয়ে পড়েছে। মনুকে দেখে দু'জন বলে উঠল: 'আরে এসো, এসো?'

মোহন একটা চট পেতে দিল। মনুর মনে হলো, বুড়ো কুলিরা যেন তার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করছে।

চারদিকে খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপার লক্ষ্য ক'রে মোহনকে সে জিজ্ঞেস করে: 'কি ব্যাপার মোহন ভাই? এত পিঠের ছড়াছড়ি যে?'

মোহনের জবাব দেবার আগেই একজন কুলি বলে উঠল: 'আরে, মেমসাহেবের চাকর হয়েছিস্ বলে কি, দেশের পাল-পার্বণ ভুলে গেলি? আজ যে ঝুলন!'

মোহন মুন্নুকে সান্ত্বনা দেবার জন্যে বলে ওঠে : ওদের কথায় কিছু মনে করিস না ! সব খুইয়ে ওরা মুখ-সর্বস্ব হয়েছে !'

সে-প্রসঙ্গ চাপা দিয়ে আর-একজন কুলি বলে ওঠে : 'যে যাই হোক ভাই ! আমার কথাটা ভুলো না কিন্তু ! আমার বিয়ের দরুন চৌধুরীর কাছ থেকে কিছু ধার ক'রে দিতেই হবে !'

মোহন বলে : 'মিছিমিছি আর টাকা ধার করো না। শেষকালে তো পেটমোটা মহাজনের গোলাম হয়ে থাকতে হবে। আর তোর বিয়ে করবারই বা দরকার কি ? বিয়ে করেই তো বউকে ফেলে এখানে ছুটে আসবি রিক্‌শা টানবার জন্যে ? শরীর যা হয়েছে, তাতে যে-কোনদিন স্রেফ পড়ে মরে যাবি।'

মোহনের কথার প্রতিধ্বনি ক'রে আর একজন কুলি বলে ওঠে : 'যা বলেছিস্‌ ! বলি, তোর শরীরে আছে কি, যে বিয়ে করবি ?'

সকলে হেসে ওঠে।

যাকে নিয়ে হাসি সে মুখভার ক'রে জিজ্ঞেস করে : 'তাহলে করব কি ?'

মোহন বলে : বাড়ি ফিরে যা। আমার কথা শোন, বাড়ি গিয়ে জমিতে চাষ করগে যা !'

'জমি নেই···জমি তো আগেই বাঁধা পড়ে গিয়েছে।'

'তা'হলে চল্‌, সবাই মিলে গিয়ে জমিদারকে হঠিয়ে জমিটা আগে দখল করি। আমি তোদের বোঝাতে, চাই, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে যে জিনিস তোরা তৈরি করবি, সে-জিনিসে তোদের অংশ আছে, সে অংশে তোদের দাবি ক'রে আদায় করতে হবে !'

মোহনের উচ্ছ্বাসে বাধা দিয়ে অন্য আর একজন কুলি বলে ওঠে : 'ও-সব ধার করা বড় বড় কথা রেখে দে তোর ! আমরা এইখানেই আসব, কাজ করব, হুঁকো টানব, তাস খেলব আর ভাড়া পেলে, মরতে মরতেও রিক্‌শা নিয়ে ছুটব।'

মোহন চিৎকার ক'রে ওঠে : 'তোরা তাহলে চাস্‌ যে ওরা তোদের মেরেই ফেলুক ! কে তোদের বাঁচাতে পারে বল্‌ ! তোদের মাথাতে পেরেক দিয়ে ঢুকিয়ে দিলেও তোরা বুঝবি না !'

গায়ের ছেঁড়া কাঁথাটা ভালো ক'রে মাথা থেকে পা পর্যন্ত টেনে নিয়ে ঘুমুবার জন্যে পাশ ফিরে একজন কুলি ঠাট্টা ক'রে বলে ওঠে : 'তা'লে বাবা, আজ নয়, কাল সকাল থেকে তোর কাছ থেকে পড়া নেবো !'

হঠাৎ মুন্নুকে ডেকে মোহন বলে : 'তুই একটু বোস্, আমি আসছি এক্ষুণি !'

বলেই মোহন উঠে পড়ে। সেখানকার আবহাওয়া মুন্নুর ভালো লাগে না।

যে কুলিটা কাঁথা মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়েছিল, সে পাশ ফিরে আবার বলে ওঠে : 'আচ্ছা, মোহন ওস্তাদ, তুই বল তো···'

'চলে গেছে তো ! আচ্ছা পাগলা ! কি যে করে কিছু বুঝে উঠতে পারি না ! বলে বিলেত গিয়েছিল···বিদ্বান···তবে আমাদের সঙ্গে মিশে রিক্‌শা টানে কেন ?'

সে-কথার উত্তর একজন বুড়ো কুলি দেয় : 'মস্ত বড় ঘরের ছেলে···পয়সা জীবনে খুব উড়িয়েছে···তাই এখন তার প্রায়শ্চিত্ত করছে, বুঝলি ? ও আমায় একদিন বলেছিল, মানুষের সঙ্গে মিশতে ওর আর ভালো লাগে না। তাই মানুষ থেকে তফাত থাকে। মানুষের মধ্যে কি ক'রে সাচ্চা মানুষ হওয়া যায়, ও তার ফিকিরে আছে।'

মুন্নু অবাক্ হয়ে শোনে।

অজ্ঞাতে তার মুখ থেকে বেরিয়ে পড়ে : 'কি আশ্চর্য !'

কাঁথা-মুড়ি দেওয়া কুলিটা কাঁথাটা টেনে নিয়ে বলে : 'অদ্ভুত !'

'অদ্ভুত বলেই আমাদের সঙ্গে আছে···নইলে এতক্ষণ তো থাকত সরকারের জেলে। ও যে-সব কাজ করে, সেই সব কাজের কাজীদের ধরবার জন্যেই সরকারের গোয়েন্দারা চারদিকে ঘুরে বেড়ায়। এসব কথা ও তোদের বলে নি কোনদিন ?'

ভয়ে ও বিস্ময়ে অস্ফুট কণ্ঠস্বরে তারা জানায় : 'না !'

'তাহলে নিশ্চয়ই বলবে একদিন—'

এমন সময় একটা প্যাকেট হাতে ক'রে মোহন ফিরে আসে।

প্যাকেটটা মুন্নুর হাতে দিয়ে বলে : 'এই ফলগুলো খাবি। এখানে তোকে দেবার মতো কিছু নেই। বাজারেও যে আছে তা নয়। আমাদের জন্যে বাজারে

কদাকার, তেমনি বিশাল···হাঁড়ির মতোন একটা মুখ দেখলেই ভয় করে। শুধু সমাজে মানসম্ভ্রম পাবে বলে মেমটা কর্নেলকে বিয়ে করেছিল। বহুবার গোলাম ···যে বেয়ারাটার কথা বলছি···সে দেখেছে, কর্নেল সাহেব যখন তার বিরাট বপু নিয়ে মেমসাহেবকে আদর করতে গিয়েছে, মেমসাহেব তখন মুখ ব্যাজার ক'রে মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

'···সকাল বেলা কর্নেল আফিসে বেরিয়ে গেলেই মেমসাহেব মদ খেতে শুরু করত। তার পর মাতাল অবস্থায়, গোলাম যেখানে দাঁড়িয়ে কাজ করত, সেখানে এসে এক দৃষ্টিতে তাকে দেখত···গোলামের রীতিমতো অস্বস্তি হতো, কারণ মেমসাহেবের গায়ে একটা আলাগা পাতলা ড্রেসিং গাউন ছাড়া আর কিছুই থাকত না। কোন কোন দিন গোলামকে বিপজ্জনক সব প্রশ্ন করত, বিয়ে হয়েছে কি না···মেমসাহেবদের তার কি রকম লাগে···এই সব···তার উত্তরে একদিন সে বলেছিল, তাদের গাঁয়ে একটি মেয়েকে সে ভালোবাসে কিন্তু তার মা-বাপ সেই মেয়েটির সঙ্গে তার বিয়ে দিতে চায় না। তবে একদিন সে নিজে যখন নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারবে, গাঁয়ে ফিরে গিয়ে সেই মেয়েটিকেই সে বিয়ে করবে।

'···একদিন গোল-কামরায় ভেতরে গোলাম কাজ করছে···এমন সময় মাতাল অবস্থার মেমসাহেব সেখানে ঢুকে পড়েই গোলামকে প্রায় জড়িয়ে ধরে। বলে, তুই যে মেয়েটাকে ভালোবাসিস, তার চেয়ে আমি হাজার গুণে ভালো! চেয়ে দেখ, আমার গায়ের রঙ···আমার স্বামী একজন কর্নেল···যৌবনে আমিও একজন কবিকে ভালোবাসতাম···তবে তার সঙ্গে বিয়ে হলো না···সে গরীব··· কিন্তু তোকে আমি চাই।'

'···গোলাম জোর ক'রে মেমসাহেবের হাত থেকে নিজেকে মুক্ত ক'রে বলে ওঠে: 'হুজুর, আমি জানতে চাই না, আপনি কর্নেলের বউ কি কার বউ··· কবিকে ভালোবাসতেন কি অন্য কাউকে ভালোবাসতেন···তবে আমি আপনাকে ভালোবাসি না!···গোলাম বুঝেছিল, মেমসাহেবের কাছে ধরা না দিলে, মেম সাহেব নিশ্চয়ই একটা মিথ্যে বদনাম দিয়ে তাকে পুলিসে ধরিয়ে দেবে। তাই গোলাম তৎক্ষণাৎ সেখান থেকে পালিয়ে আসে। মেমসাহেব তার পেছনে ছুটতে ছুটতে বলে: হামকো ছোড়কে মত্ যাও···মত্ যাও গোলাম···

…সেইদিন থেকে গোলাম বুঝেছিল, ওদের বাইরের চটকের আড়ালে ভেতরে ভেতরে ওরা কত অসুখী। আমিও সারা য়ুরোপ বেড়িয়েছি—সেখানে দেখেছি সাধারণ লোকদের ছাড়া, বড় লোকদের জীবনে কিছু নেই…তারা শুধু চায় একটার-পর-একটা উত্তেজনা…উত্তেজনার ফেনায় ভেসে তারা বেঁচে থাকে।'

মোহনের কথা শুনে প্রথম কুলিটা এতক্ষণে যেন বুঝতে পারে। বলে : 'সত্যি, ওদের এই নাচের মানেও বুঝতে পারি না। আরে, খালি একটা আউরতকে ঠেলে ঠেলে এখানে ওখানে নিয়ে ঘুরে বেড়ায়…আরে বাবা, একি নাচ ?'

মোহন বলে : 'এই নাচ, এ-হলো ওদের ভালোবাসা-বাসি খেলা…তবে এখন আর ভালোবাসা নেই…আছে শুধু খেলা। ভালোবাসার মধ্যে আছে শুধু, পরস্পরের গা-ঘেঁষাঘেঁষি ক'রে শরীকে একটু গরম ক'রে নেওয়া…যার ফলে বিছানায় গিয়েই ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। আমরা হলাম নোংরা ময়লা লোক …আমাদের বিছানায় স্ত্রীর সঙ্গে শুতে গেলে, একঘণ্টা ধরে পরের বউ-এর সঙ্গে গা গরম ক'রে নিতে হয় না। এই সব কর্নেল, জেনারেল, রাজা-মহারাজাদের চেয়ে আমারা ঢের ভালো ঢের বড়! তবুও আমরাই ওদের রিক্শা টেনে বেড়াই!'

অন্য আর একজন কুলি বলে ওঠে : 'কিন্তু তুইও তো ওদে রিক্শা টানিস ?'

'হ্যাঁ, ইচ্ছে করেই টানি! নইলে তোদের সঙ্গে মেশবার সুযোগ পেতাম কি ক'রে ?'

হঠাৎ বাগানের ভেতর সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়ে মুন্নু বলে ওঠে : 'দেখ দেখ, কেমন জোড়ায় জোড়ায় বেড়াচ্ছে।'

মোহন বলে ওঠে : 'বেশী দেখো না—যা দেখতে চাও না, এমন অনেক কিছু দেখতে হয়তো পাবে তাহলে।'

মুন্নু উদাসভাবে বলে ওঠে : 'তাতে আর আমার কি। আমি তো চাকর। মেমসাহেব যা খুশী তাই করুক না কেন ?' ক্লান্তিতে মুন্নু হাই তোলে।

মোহন তার নিজের গা থেকে চাদরটা খুলে মুন্নুর গায়ে জড়িয়ে দেয় : 'তোর অবস্থা ভালো বোধ হচ্ছে না…তোর এখন শুয়ে থাকা উচিত!'

'না, না আমি ঠিক আছি।' বলে মনুমু নিজেকে ঠিক ক'রে নেয়, কিন্তু হঠাৎ গলাটা খুস খুস ক'রে ওঠায় কাশতে শুরু করে। কাশতে কাশতে হঠাৎ এক মুখ লোনা রক্ত থুতুর সঙ্গে বেরিয়ে আসে।

মোহনে চিৎকার ক'রে উঠল: 'আমি কতদিন থেকে বলছি…সাবধান করছি…ছি ছি…এই কি প্রথম উঠল!'

মনুমু শুধুশু নেড়ে জানায়: 'না!'

'কেন মেমসাহেবকে বলিস নি যে তুই আর রিক্‌শা টানতে পারবি না, তোর মুখ দিয়ে রক্ত উঠছে?'

মনুমু চুপ ক'রে থাকে। দেখতে দেখতে কুলিদের মধ্যে উৎকণ্ঠা জেগে ওঠে।

বড়লাটের প্রাসাদের দরজায় সশস্ত্র গার্ড সেই গোলমাল শুনে সজাগ হয়ে ওঠে। হাঁকে: 'হু গাস্ দেয়ার?

একজন কুলি জবাব দেয়: 'হঠাৎ একটা ছেলের অসুখ হয়েছে সরকার।'

গার্ড হুকুম দেয়: 'আইডিকং আসবার আগে, এখান থেকে তাকে সরিয়ে ফেল।'

মোহন মনুমুকে নিজের কাঁধে তুলে বলে:

'…আমরা দু'জনে চলে গেলাম…এখনই নিচে নামতে হবে, আমাদের আর তেমন দরকার নেই তোরাই পারবি।'

॥ আঠারো ॥

'মিসেস্ মেনওয়ারিঙ উৎসব শেষে রিক্‌শাতে এসে মনুমুর খবর শুনে বিশেষ দুঃখিত হলেন। বলে নাচে তিনি যা আশা ক'রে এসেছিলেন, তা হয় হয় নি। লোকেরা গা ঘেঁষে উঁচুতে ওঠার ব্যাপারে মহাবিঘ্ন ঘটায় ভারতীয় দল…তারা তাকে এক রকম কোণ-ঠাসা ক'রে রাখে। মাত্র একজন ইংরেজ অশ্বারোহী অফিসার তার সঙ্গে নেচেছিল। ভেবেছিলেন ফেরবার মুখে মেজরকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে আসবেন। ব্রান্ডির বোতলে ডুবে উৎসবের ব্যর্থতার শোক ভুলবেন। কিন্তু মনুমুর খবর শুনে তাঁর আর কিছুই ভালো লাগল না।

মেজর এসে মনুমুকে পরীক্ষা ক'রে যখন জানিয়েগেলেন যে অবস্থা শোচনীয়, মিসেস্ মেনওয়ারিঙ কেঁদে ফেললেন।

হেল্‌থ অফিসারের আদেশক্রমে মুন্নুকে ছোট সিমলার হাসপাতালে আলাদা ক'রে রাখা হলো। পাশাপাশি তিনটে ছোট কুঁড়েঘর···তখন আর দু'জন কুলিও সেখানে চিকিৎসার জন্য মজুত ছিল।

মোহন এসে তাকে দেখেশুনে যেত।

সেখানে এসে আর-একবার তার রক্ত উঠেছিল। কিন্তু তা ছাড়া আর কোন কষ্ট তার ছিল না। তবে এত দুর্বল বোধ হতো যে উঠতে বা হাঁটতে পারত না। সারাদিন বারান্দায় একটা কাঁথা মুড়ি দিয়ে চুপটি ক'রে শুয়ে থাকত।

প্রথম প্রথম মিসেস্ মেনওয়ারিঙ ফল ও ফুল নিয়ে তার সঙ্গে দেখা করতে আসতেন। তার পাশে বসে, তার গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতেন। নানা রকম স্তোকবাক্যে তাকে উৎসাহিত ক'রে তোলবার চেষ্টা করতেন, শিগগির ভালো হয়ে উঠবে···অসুখ এমন কিছুই নয়···শরীরটা শুধু একটু দুর্বল হয়ে পড়েছে···ইত্যাদি।

কিন্তু মনে মনে তিনি অনুভব করতেন, হয়তো তাঁরই অমনোযোগিতার ফলে বেচারা অসুস্থ হয়ে পড়েছে···তাই যতদূর সম্ভব সদয় ব্যবহারে তিনি তাঁর ত্রুটি শোধরাবার চেষ্টা করতেন। কিন্তু সদয় হওয়ার পথেও প্রতিবন্ধক ঘটল।

মেজর সাহেব স্পষ্ট বারণ ক'রে দিলেন যে, এভাবে রোগীর কাছে যাওয়া-আসা করা চলবে না···যদি তা সত্ত্বেও তিনি যান তা'হলে বাধ্য হয়ে তাঁকেও আলাদা বাস করতে হবে···ছোঁয়াচে রোগ সম্বন্ধে আইন মানতে সবাই বাধ্য।

মিসেস্ মেনওয়ারিঙ চেষ্টা ক'রে মুন্নুর কথা মন থেকে মুছে ফেলেন···তাঁর মনের বেদনা নীরবে মনেই থেকে যায়।

মুন্নু ইদানীং মেজর সাহেবের সঙ্গে মিসেস্ মেনওয়ারিঙের ঘনিষ্ঠতায় মনে মনে ক্ষুব্ধ হতো। যখন তার মুখ দিয়ে রক্ত পড়তে লাগল, বুঝল, মৃত্যু তাকে ডাক দিয়েছে, তার সব আক্রোশ গিয়ে পড়ল মেনওয়ারিঙের ওপর। মনে মনে তাঁকে ঘৃণাও করতে লাগল। কিন্তু এখন রোগশয্যায় সকলের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে, জীবন ও মৃত্যুর সংশয়ের দোলায়, তার মনে হঠাৎ কি যেন ঘটে গেল। সে যে একদিন মিসেস্ মেনওয়ারিঙকে ঘৃণা করেছে, সে-ধারণাটুকু তাকে পীড়া দিতে লাগল। আজ সে চায় সকলকে ভালোবাসতে, সকলকে ভালো দেখতে, সকলের কাছে ভালো হতে। একদিন যখন দেহ সুস্থ, সবল ও সক্ষম ছিল, তখন

তার তেজে যাকে সে ছোট দেখেছে, আঘাত করতে চেয়েছে বা করেছে, আজ স্তিমিত-তেজে দেহের ম্লান শক্তিতে তাদের সকলের কাছে আপনা থেকে তার মাথা নত হয়ে পড়ল···সকলকেই সে আজ সমানভাবে স্বীকার ক'রে নিতে চায়।

এক অপূর্ব স্নিগ্ধ কোমলতায় তার মন আজ আচ্ছন্ন হ'য়ে গিয়েছে। বাইরে থেকে মুখ শুকিয়ে আসছে, চোখ যে ক্রমশ কোটরের ভেতর ঢুকে যাচ্ছে···দৃষ্টি ক্রমশই ক্ষীণ হয়ে আসছে। সেই ক্ষীণ দৃষ্টি দিয়ে দূরের পাহাড়ের দিকে শুধু চেয়ে থাকে···নিঃশব্দে অনুভব করে একটু একটু ক'রে যেন বাতিতে তেল কমে আসছে···শিখার আলো তাই ক্রমশ ম্লানতর হয়ে যাচ্ছে।

আর একবার খুব বেশী রক্তপাত হলো। সে ভীত হয়ে উঠল কিন্তু ভোর-বেলা সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গে সে দেখল, নিশ্বাস নিতে আর তেমন কষ্ট হচ্ছে না।

সে নিশ্চয়ই ভালো হয়ে উঠবে। ক্রমশ তার নিশ্বাস আরও সরলভাবে পড়তে লাগল। তার বদ্ধমূল ধারণা হলো সে সেরে উঠবে।

মনে মনে সে ভবিষ্যৎ জীবনের নানা চিত্র আঁকতে থাকে। বোম্বে থেকে রতন তার চিঠির উত্তর দিয়েছে। সেখানকার ট্রেড য়ুনিয়ানের জন্য তার একটা চাকরি হতে পারে। চাকরি করার সঙ্গে সঙ্গে সে সেইসব নিষ্ঠুর মহাজন আর নির্মম পাঠানদের বিরুদ্ধে লড়বে। ক্রমশ শীত কেটে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মশা আর মাছির উৎপাতও কমে এল···তার শরীরও যেন একটু একটু ক'রে সবল হয়ে উঠছে। হয়তো শিগগির সে উঠে দাঁড়াতে পারবে···বোম্বে যাবার জন্যে তৈরি হতে হবে।

হঠাৎ এই সময়ে আর-একদিন আবার হলো রক্তপাত, সে ভেঙে পড়ল··· বুঝি আর সে সেরে উঠবে না। একটু কাশি হলেই, সে ভীত হয়ে পড়ে, প্রাণ-পণ চেষ্টা করে যাতে কাশি না আসে।

মোহন তেমনি আসা-যাওয়া করে। তার শয্যার পাশে বসে, তার মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়। সেইটুকু সময় আবার যেন আশা জেগে ওঠে।

মাঝখানে কয়েক দিন এল বর্ষা। চারদিক ভিজে, অন্ধকার। সে-ভিজে অন্ধ-কারে মন শুধু চলে যায় নিজের ভেতরে। টুকরো স্মৃতির ছবি···এলোমেলো···

যেমন হঠাৎ এসেছিল, তেমনি হঠাৎ আবার বর্ষা চলে গেল, সূর্যালোকে হেসে উঠল পাহাড়।

মুন্নুর শরীরও যেন সে ক'দিনে অনেকখানি সেরে উঠল। আশ্বস্ত হয়ে সে ভাবে, তাহলে, সত্যি সত্যি মরছি না···ভালো হয়ে উঠব তাহলে!

এমন সময় আবার এল বর্ষা! সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে এল ভিজে বাতাসে মৃত্যুর আশংকা।

ম্লান অবসন্ন দেহে, নিষ্প্রভ উদাস দৃষ্টিতে মোহনের মুখের দিকে চেয়ে থাকে মুন্নু···অসহায়ভাবে তার কোল ঘেঁষে গিয়ে ও শোয়···যেন ওর স্পর্শে আছে মৃতসঞ্জীবনী ঔষধ।

মোহন আশ্বাস দেয়ঃ 'ভয় কি ভাই মুন্নু···তুইতো ভীরু নোস্! আমরা সবাই লড়নেওয়ালা।'

মুন্নু জোর ক'রে মোহনের হাত আঁকড়ে ধরে···যেন তার দেহ ভেদ ক'রে তার শিরায় প্রবহমান উষ্ণ রক্তধারার স্পর্শ সে পেতে চায়···দূর-সমুদ্রে অপসৃয়মান তরঙ্গ-ধারার দিকে ব্যাকুল আগ্রহে সে হাত বাড়ায়···

তার পর একদিন, শ্বেতাবগুণ্ঠনে আবৃত এক মায়ারাত্রির শেষে, প্রভাতের প্রথম আলোকে সে শুরু করল তার শেষ-যাত্রা···

জীবনের ক্লান্ত তরঙ্গ ক্ষণকালের জন্য তটভূমিতে আছড়ে প'ড়ে ফিরে গেল আবার মহাসমুদ্রের অতল নীলে।

॥ রিজেন্ট স্কোয়ার, ডবলু. সি. ॥

সেপ্টেম্বর—১৯৩৫